ডঃ অরুণকুমার মিত্র সম্পাদিত

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

রসরাজ অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পৌত্র

শ্রীযুক্ত প্রীতিভূষণ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচী

চিত্রসূচী

আত্মস্মৃতি হ'ল নিজের লেখা আত্মজীবনের বিবরণ। "আত্মজীবনী কি তা হ'লে শুধু একটি মানুষের জীবনের ঘটনার পঞ্জী; নাকি তার ব্যক্তিসত্তার, তার চরিত্রের, তার আত্মার আলেখ্য ?"—প্রশ্ন তুলেছিলেন ইংরেজ লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ জর্জ বরো (১৮০৩-৮১)। এ প্রশ্নের উত্তর যাই হোক্ না কেন, সেই ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মহাপৃথিবীর অগণ্য পাঠক ভিন্ন স্বাদের অসংখ্য আত্মজীবনী পাঠ করে আসছেন।

আত্মজীবনী লিখতে সকলেই পারেন বটে, কিন্তু সকলেই লেখার অধিকারী কি ? ইতিহাসের 'ঘূর্ণাচক্রে' যিনি শুধু ঘুরপাকই খান নি, বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন, ইতিহাসের মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, নিজের কথা অপরকে শোনাবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। আর পাঠকও তাই সেন্ট্ অগাস্টিনের 'কনফেশনস্' থেকে শুরু করে আজ অবধি বিশিষ্ট সব মানুষের লেখা কত রকমের আত্মকথাই না অক্ষুণ্ন আগ্রহে পাঠ করে চলেছেন। দেখেছেন, খ্যাত বা অখ্যাত, বহির্মুখী বা অন্তর্মুখী ; সন্ত বা পাপী ; আত্মনিন্দক বা আত্মসমর্থক ; গোঁড়া বা সংস্কারক, চিন্তাবিদ্ বা কর্মী, শিল্পভাবুক বা বস্তুতান্ত্রিক—সব রকম মানুষই আত্মজীবনী লিখেছেন।

আত্মজীবনের কথা অপরকে শোনাবার প্রবণতা সুপ্রাচীনকাল থেকে দেখা গেলেও autobiography শব্দটি বেশী দিনের নয়। এটি জন্ম নিয়েছিল অমৃতলালের জন্মের মাত্র চুয়াল্লিশ বছর আগে ১৮০৯-এ ইংরেজ কবি ও লেখক রবার্ট সাদের (১৭৭৪-১৮৪৩) কলমে। এখন, আত্মস্মৃতি-রচয়িতার প্রকৃতি কি রকম হবে তা-ও দেখা দরকার। আত্মমগ্ন হওয়া আত্মজীবনীকারের পক্ষে অসঙ্গত এবং তাঁর রচনার পক্ষে ক্ষতিকর। অন্তর্দর্শন ও আত্মসমীক্ষার সংগে নিরাসক্ত কৌতূহল যদি যুক্ত হয় তা হ'লেই সার্থক আত্মজীবনী রচিত হতে পারে। লেখকের অভিজ্ঞতার প্রসার কতটা, দৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুসমূহে এবং সমকালীন ঘটনায় তাঁর আগ্রহ কি পরিমাণ আর তাঁর শিল্পচেতনা কত গভীর, তারই ওপর আত্মজীবনীর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য নির্ভর করে।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অমৃতলালই ছিলেন দীর্ঘতম জীবনের অধিকারী। আর তাঁর সাতাত্তর বছরের সে ক্লান্তিহীন জীবন, অবসান পর্যন্ত, ছিল অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। অভিনয়জীবন থেকে তিনি অবসর নেন নি কখনও। যৌবনে পদার্পণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাবলিক স্টেজ এবং মৃত্যুর চারদিন আগেও অভিনয় করে গিয়েছেন সদ্যোজাত বাংলা ছায়াচিত্রে, তাঁরই লেখা 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসনে বাড়ির কর্তা গোপীনাথ-চরিত্রে রূপদান করে। একটি রক্ষণশীল শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হয়েও অশ্রদ্ধেয় নটজীবন (তৎকালীন দৃষ্টিভঙ্গীতে) বরণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনব্যাপী কর্ম-সাধনায় ও সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বে সমাজের প্রভূত সম্মান উপযুক্তভাবেই লাভ করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ—সব সারস্বত প্রতিষ্ঠানেরই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি। ব্যঙ্গ-রসিকের বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি তাঁর সমকালকে দেখে বিচারপ্রবণ মন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজের সকল স্তরের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও সংস্পর্শ ছিল। বহু অভিজ্ঞতায় মণ্ডিত তাঁর এই প্রাণরসপূর্ণ দীর্ঘ জীবনের ব্যাপক ইতিহাস যদি তিনি লিখতেন তাহলে আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ ও উপাদেয় আত্মস্মৃতি পেতাম। কিন্তু আত্মজীবনের কিছু‌কিছু অংশ তিনি প্রকাশ করলেও আত্ম-উদাসীনতাই তাঁকে পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী রচনা থেকে বিরত রেখেছিল।

প্রস্তুত গ্রন্থে তাঁর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতিমূলক চারটি রচনা সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেক রচনার কেন্দ্রে উত্তম পুরুষটি থাকলেও নিজের চেয়ে অন্যের কথাই তিনি স্মরণ করেছেন বেশী। গ্রন্থের নাম তাই দেওয়া হয়েছে 'স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি'। এই চারটি রচনারই প্রকাশভঙ্গী স্বতন্ত্র। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বর্ণিত হয়েছে সাক্ষাৎ-কারের রীতিতে, মজলিসি কথনভঙ্গীতে; 'পুরাতন পঞ্জিকা'য় পাওয়া গেছে ঐতি-হাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদের লেখনীতে আঁকা স্মৃতিচিত্র, যাতে উত্তমপুরুষের ভূমিকাটি গৌণ, 'ভুবনমোহন নিয়োগী' রচনাটি তাঁর এক মঞ্চসংগ্রামী সুহৃদের বিড়ম্বিত জীবনের করুণ আলেখ্য; আর 'সপ্তমীর রাত' রচনাটি তাঁদের নটজীবনের সূচনাকালের এক কৌতুকপূর্ণ রমণীয় স্মৃতির বিবরণ।

এই সব স্মৃতিকথা আমরা যখন পড়বো, দেখবো বর্ণনায় আপাত অসংলগ্নতার মধ্যেও একটা রম্য সহৃদয়তা ফুটে উঠেছে। অমৃতলাল প্রথমে ছিলেন অভিনেতা; পরে মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক। যখন মঞ্চের প্রয়োজনে নতুন নাটক ঠিকমতো মিলছিল না, তখন অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি নাট্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন (তাঁর পরে গিরিশ-চন্দ্রকেও এই এক কারণে নাট্যকার হতে হয়েছিল)। এই সময় অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক ও মঞ্চাধ্যক্ষ বা স্টেজ ম্যানেজার হিসেবে তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হ'ত যে সেই ব্যস্ততার

মধ্যে যা লিখতেন তা কতটা সাহিত্যগুণযুক্ত ও নাট্যশিল্পসম্মত হত তা ভেবে দেখবার সময়ও পেতেন না। দর্শকদের রুচিমতো নাটক-প্রহসন লিখে তাঁদের আনুকূল্যে রঙ্গালয়কে বাঁচিয়ে রাখাও তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। অনেক সময় লেখবারও সময় পেতেন না, মুখে বলতেন।

'পুরাতন প্রসঙ্গ'ও তাঁর এই রকম মুখে-বলা আত্মস্মৃতি। 'পুরানো সেই দিনের কথা' বলতে বসে দীর্ঘকাল পরে স্মৃতির পর স্মৃতি এসে তাঁর মনে জড়ো হয়েছে। এক কথা বলতে অন্য কথা এসে গিয়েছে, পরে আবার আগের কথায় ফিরে গিয়েছেন। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। আমাদের মনেও তো স্মৃতি কালের অনুক্রমে আসে না। পরের স্মৃতির ওপর আগের স্মৃতির প্রলেপ তো অহরহই পড়ছে। স্মৃতির এই স্বেচ্ছাবিহার সম্পর্কে অমৃতলাল যে মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ওঠে নি তা নয়। 'পুরাতন পঞ্জিকা'র এক জায়গায় তো নিজেই স্বীকার করেছেন—

"একে পুরাতন পঞ্জিকা, তায় বোধ হয়, 'বসুমতী অফিসের' দপ্তরী সাহেবের নানা মিয়ার হাতে বাঁধাই, সুতরাং পুজো থেকে আশ্বিনে ঝড়, ঝড় থেকে সেলারের উৎপাত, কোথায় কালী সিংগীর কথা, কোথায় টেকচাঁদ ঠাকুরের কথা, কোথায় বাই-নাচ, কোথায় জিমন্যাস্টিক, কোথায় নৈবিদ্যি, কোথায় মেঠাই মতিচুর, কোথায় চৈত্রমেলা, কোথায় ন্যাশনাল থিয়েটার কি যে গোলমাল হচ্ছে, কিছুরই ঠিক নেই; তবে নদেরচাঁদের কথায় বলি, আসলে কম না পড়লেই হ'ল" (পৃ ১১৪-১৫)।

এই রকম এলোমেলোভাবে স্মৃতির ছবি তিনি একের পর এক ফুটিয়ে গেছেন। পাঠকের কাজ চলচ্চিত্র-সম্পাদনার মতো পারম্পর্য-অনুযায়ী এই সব চিত্র সাজিয়ে নেওয়া।

'পুরাতন প্রসঙ্গে' বা 'পুরাতন পঞ্জিকা'য় অমৃতলালের কোন স্থির চিন্তা বা সংবন্ধ পরিকল্পনা ছিল না। আত্মকথার সঙ্গে আত্মবিশ্লেষণের—যাকে বলা হয়েছে 'scrutiny of self'—তার অবসরও তাঁর ছিল না। বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন—"দেখুন, সোজা কথায় আপনার নিকট আমার এই পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি; psychological analysis করিতে বসি নাই।' (পৃ ৪৬) ফলে আত্মস্মৃতিতে অন্য স্মৃতি মিশে গিয়ে তাঁর জীবনকথা পরিপূর্ণ জীবনী হয়নি, হয়ে উঠেছে 'a sort of life'। জীবনের কিছু নির্বাচিত প্রসঙ্গই এখানে আমর পাচ্ছি; আর সেই সব প্রসঙ্গ যখন আরও জানবার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি ঠিক তখনই তিনি ছেদ টেনে দেন অকস্মাৎ। এই কারণেই তাঁর আত্মজীবনীর প্রকার ও প্রকৃতির সঙ্গে বরেণ্য সাহিত্যিক গ্রেহাম্ গ্রীন্-এর বক্তব্য অনেকাংশে মিলে যায়। গ্রীন্ লিখেছেন—

"An autobiography is only a sort of life…it is of necessity even more selective : it begins later and ends prematurely". (A Sort of life P.9)

অমৃতলাল ১৩২২-২৩ বঙ্গাব্দে তাঁর জীবনের ইতিবৃত্ত কিছুটা বিবৃত করেন বিপিন-বিহারী গুপ্তের কাছে। সেই অংশটুকু প্রথম মানসী ও মর্মবাণীতে প্রকাশিত হয়ে পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই স্মৃতিকথায় অমৃতলালের পিতৃস্মৃতি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে তাঁর শৈশবশিক্ষার স্মৃতি, কাশীতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গ ও নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচয়, বাঁকিপুরে কবি বলদেব পালিত ও কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্য, বাড়িতে প্যারিকাকার কাছে কাব্যরচনার সূত্রপাত, প্রথম ফার্সটি রচনার ইতিহাস, রসসাহিত্য রচনার ব্যাপারে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের কাছে ঋণ, স্কুলের সতীর্থ অর্ধেন্দুশেখরের কথা, জিমন্যাস্টিক শিক্ষা ও ন্যাশনাল নবগোপালের উৎসাহ,অর্ধেন্দুর নেতৃত্বে বালক বয়সে ক্যারিকেচারের অভ্যাস, ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বক্ষণে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অর্ধেন্দু-নগেন্দ্রের মনোমালিন্যের কারণ, ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম নাটক নীলদর্পণের অভিনেতা ও স্টেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়, সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ অমৃতলালের প্রতিক্রিয়া, ন্যাশনাল থিয়েটারের দলকে লক্ষ্য করে লেখা গিরিশচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক গান ও তার ব্যাখ্যা, বিশ্বকোষের 'রঙ্গালয়' প্রবন্ধে এই গানের ভুল ব্যাখ্যা, পাবলিক স্টেজের প্রথম অবস্থায় নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের উৎসাহ ও আনুকূল্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে কেন unlucky, ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে যাওয়ার ইতিহাস, লিণ্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে অভিনয়, ঢাকায় অভিনয়, বিডন স্ট্রীটে নতুন নাট্যশালা বেঙ্গল থিয়েটার-প্রতিষ্ঠার কথা, বাংলা মঞ্চের প্রথম চার অভিনেত্রীর নাম, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন ও প্রথম রাত্রির অভিনয়ে অগ্নিকাণ্ড, পরদিন ১৮৭৪-এর ১লা জানুয়ারী আলিপুরের বেলভেডিয়ারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় প্রভৃতি উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে।

'পুরাতন পঞ্জিকা' ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দের মাসিক বসুমতীর কয়েকটি সংখ্যায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র মতো এটিও মধ্যপথে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তেইশটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত তাঁর শৈশব-যৌবনের কলকাতার সমাজজীবনের অনেক উজ্জ্বল চিত্র এখানে মেলে। তাঁর নিজের জীবনের কোনো কোনো ঘটনার সরস ও সবিস্তার বর্ণনাও পাওয়া যায়। এখানেও এক স্মৃতির ওপর অন্য স্মৃতির জলছবি পড়েছে ক্রমাগত। এক প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাঁর মন চলে গেছে বারবার। 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র স্মৃতিতে যেটুকু পারম্পর্য ছিল, এখানে তার লেশমাত্র নেই। কোন্ প্রসঙ্গের পর কোন্ প্রসঙ্গ যে আসবে তা যেন ভাবাই যায় না। আসলে তাঁর দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট স্মৃতির ভাণ্ডার এতই বিশাল ও ঋদ্ধ যে সেখান থেকে শৃঙ্খলার সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন করে যথার্থ শিল্পসম্মত আত্মকথা রচনা তাঁর নিজের পক্ষেও কঠিন হয়েছিল। তা ছাড়া নাট্যকার যেমন নির্লিপ্ত দূরত্বে অবস্থান করে নিজের সৃষ্ট চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ দেখেন,

নাট্যকার অমৃতলালও তেমনি 'পঞ্জিকা'-বর্ণিত 'আমি' সম্পর্কে একপ্রকার উদাসীন থেকে অন্যের কথাই আমাদের শুনিয়েছেন বেশী। 'পুরাতন পঞ্জিকা'য় তাই আত্মকথার চেয়ে অন্য কথাই বেশী। তাঁর আত্মজীবনের যেটুকু অংশ পাই, তা শৈশব থেকে বিবাহকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ছাড়া তাঁর স্মৃতি-বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে কত প্রসঙ্গই যে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অমৃতলাল তাঁর স্মৃতিকথা শুরু করেছেন, নিজের বয়স যখন এগারো। কলকাতা বন্দরে তখন পালতোলা জাহাজের আমদানি হ'ত। প্রসঙ্গক্রমে মাতাল সেলারদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ ও দৌরাত্ম্য, তাদের 'অকুতোভয় সাহস,' গঙ্গাস্নানার্থিনীদের প্রাতঃকালীন পরচর্চা ও পরনিন্দার 'মহিম্নস্তব', কুয়োর ঘটিতোলা, বাড়ির মেয়েদের সহজ চিকিৎসা, তাঁদের গন্ধকের দেশলাই তৈরি, সাহেবের পাল্কি-চড়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-শাসনভার গ্রহণ করলে সার সেসিল বিডন কর্তৃক প্রোক্লামেশন পাঠের ঘটনা, প্রোক্লামেশনের অন্তঃসারশূন্য আশ্বাস সম্পর্কে মন্তব্য, প্রোক্লামেশনের দিন কলকাতায় উৎসব ও আলোকসজ্জা; কালীপ্রসন্ন সিংহের স্পষ্টবাদিতা; কালীপ্রসন্নের নিজের বাড়ির দুর্গোৎসবের ঐশ্বর্য, আয়োজন, ও ভুরিভোজনের কাছে শোভাবাজার রাজবাড়ির পরাজয়, কলকাতায় প্রথম বিলিতি জিমন্যাস্টিক ও তা দেখে 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামের আখড়া-স্থাপন, চৈত্রমেলায় বাঙালী বালকের বিলিতি জিমন্যাস্টিক্ প্রদর্শন, স্ত্রী-স্বাধীনতার হুজুগ ও সে বিষয়ে অমৃতলালের বক্তব্য, রাণী রাসমণির তেজ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গোরা সেপাই-পল্টনের বাজনা ও কামানের কুচ, সেকালের পাঠ্য, পাঠশালা, গুরুমশাই, এবং গভর্ণমেন্ট-প্রবর্তিত জনশিক্ষার প্রতি কটাক্ষ, বিয়ের বাজারে 'পাশকরা' ছেলের অগ্নিমূল্য (এটি নাট্য-সংলাপে ব্যক্ত এবং সমগ্র পঞ্জিকার মধ্যে সব চাইতে উপভোগ্য অংশ), কলকাতায় বিবাহে কোথায় প্রথম গ্যাস-ব্যবহার, সেকালের বিয়ের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াপদ্ধতি ও উৎসবের বিস্তৃত পরিচয় পঞ্জিকার পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। যদিও সূত্রপাতে অমৃতলাল লিখেছিলেন, "অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, পঞ্জিকাখানি নীরস হইবে, কেননা ইহাতে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনামাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।"—তবু বর্ণনার আন্তরিক সরসতার জন্য পঞ্জিকাখানি মোটেই 'নীরস' হয়নি।

'ভুবনমোহন নিয়োগী' একটি স্মৃতিকথামূলক শোকনিবন্ধ। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৫এ বৈশাখ বাংলাদেশের পাবলিক স্টেজ-প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান উদ্যোগী ও অমৃতলালের প্রথম জীবনের নাট্যসঙ্গী ও সুহৃদ ভুবনমোহন নিয়োগীর মৃত্যু হয়। ধনীর সন্তান, বিষয়বুদ্ধিহীন ভুবন বাংলা মঞ্চের অনিশ্চিত আদিপর্বে মঞ্চের স্থায়িত্বের জন্য

অকাতর অর্থব্যয় করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের লগ্নে তাঁর বাড়িতেই রিহার্স্যাল হ'ত। আবার ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেলে তাঁদের সব উদ্যম ও স্বপ্ন যখন বিপর্যস্ত হয়ে গেল এবং তাঁদের আরও যন্ত্রণার কারণ হয়ে যখন বিডন স্ট্রীটে ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল আর অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে চলতে লাগলো, তখন এই ভুবনমোহনই তের হাজার (তখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ) টাকা খরচ করে ঐ বেঙ্গলেরই অল্প দূরে করে দিলেন 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। ভুবনমোহনের আমলে একমাত্র এই মঞ্চেই রাজশাসনের অতিরেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। প্রথম কণ্ঠ ছিল অমৃতলালের—তাঁর 'হীরকচূর্ণ' নাটকে (১৮৭৫) উচ্চারিত হল দ্বিধাহীন ধিক্কার। তারপর এই মঞ্চেই অভিনীত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসন রাজশক্তিকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে। যার ফলে উপেন্দ্রনাথ দাসের অভিনীত নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল, এই অজুহাতে অমৃতলাল, উপেন্দ্রনাথ দাস, ভুবনমোহন নিয়োগী প্রমুখের উপর কারাদণ্ডাদেশ হয়। মঞ্চের মানুষ হিসেবে প্রথম রাজরোষের কারণ হয়ে তাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এর অল্পদিন পরেই অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ বিল' বিধিবদ্ধ হয়ে মঞ্চের কণ্ঠরোধ করে। তার পরই বাংলা মঞ্চে এক অস্থির অনিশ্চিত অবস্থা নেমে আসে। উপেন্দ্রনাথ বিলেতে চলে যান; অমৃতলাল পুলিশে চাকরি নিয়ে যান পোর্ট ব্লেয়ারে। গ্রেট ন্যাশনালের দুর্দশা তখন অসীম। অভিনেতাহীন রঙ্গমঞ্চ চালু রাখতে সে সময়ে ভুবনমোহনকে পর্যন্ত অভিনয় করতে হয়েছিল। আর অপটু অভিনয়ের ফল, প্রাপ্য লাঞ্ছনাও পেয়েছিলেন তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিনয়-সমালোচনায়। সেই ভুবনমোহন অমিতব্যয়ের পরিণামস্বরূপ ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে হতে শেষজীবনে একেবারে নিঃস্ব হয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। কোনো সাড়া জাগলো না, এমনই বিস্মৃত মানুষ তিনি তখন। এই বিস্মরণের প্রতিবাদ জানাতেই অমৃতলাল ক্ষোভের সঙ্গে এই অনবদ্য স্মৃতিচিত্রটি রচনা করে ভুবনের তর্পণ করেছেন। ভুবনের কথা বলতে গিয়ে অমৃতলাল তাঁর নিজের সংগ্রাম ও সাধনার, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাও ব্যক্ত করেছেন।

এই শোকনিবন্ধটিই ভুবনের প্রতি অমৃতলালের ভালবাসার একমাত্র অভিজ্ঞান নয়। দুঃখদারিদ্র্য-প্রপীড়িত ভুবনসম্পর্কে তিনি যে বরাবরই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন তার নিদর্শন হিসেবে মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লেখা এর বহুদিন আগের (১৩০৩) একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে ধরছি:

"ধরিত্রী পবিত্রকারিণী করুণাপ্রতিমা মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভারত-সাম্রাজ্য-সঙ্গিনী চরণকমলেষু।

মা,

আপনার অনন্ত স্নেহের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া এই দীন সন্তানকে তাহাতে যে অধিকার দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা উচ্চ দান আমি আর চাহি না! কিন্তু কখন কখন পরের দুঃখে কাতর হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতে হয় : যখন নিজের সাধ্যে কাহারও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে মোচন করিতে সক্ষম না হই, তখন তাহার জন্য অপরের নিকট ভিক্ষা করিতে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত হই না, বিশেষতঃ মার নিকট সন্তানের কোনো অবস্থাতেই যাচ্ঞা করিতে লজ্জা নাই। আপাততঃ যাহার জন্য মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইতেছি তাহার বিবরণ এই—*** শ্রীমান্ ভুবনমোহন নিয়োগী কলিকাতায় প্রথম সুরম্য রঙ্গালয় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপন করেন। যদিও তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি এবং এই সময়ে [তাঁহার] থিয়েটার হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন তথাপি কালবশে তাঁহার সমস্তই গিয়াছে : *** অল্প-বয়সজনিত বুদ্ধিহীনতা এবং দুষ্ট লোকের চক্রে তাঁহার অনেক অর্থ নষ্ট হইয়াছে। *** যখন ভুবনের বিষয় ছিল, তখন যদিও তাহা বিলাসিতায় ব্যয় হইয়াছিল, তথাপি তিনি পৈতৃক দেবদেবী-সেবা. ক্রিয়াকলাপাদি যত্নে নির্ব্বাহ করিতেন. ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সাধ্যমত নিয়মিতরূপে সম্মানিত করিতেন : *** [যাঁহার] ভৃত্য একদিন সাটীনের জামা পরিত, সেই ভুবন এক্ষনে বস্ত্রাভাবে গেরুয়া পরিধান করেন।*** যাঁহার দ্বারে সর্বদা ফেটীন্ প্রস্তুত থাকিত. তাঁহার পুত্রগণ এখন পাদুকাবিহীন পদে পথে হাঁটিয়া যায়; *** দুঃখ জানাইয়া প্রায় কেহই তাঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিত না, এক্ষণে সেই ভুবন স্ত্রীপুত্রকন্যাদি লইয়া একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, দিনের আহারের সংস্থান নাই; ভুবনের দুঃখ দেখিলে, মা, বুক ফাটিয়া যায়; *** আমি স্বয়ং গরীব, তথাপি সাধ্যমত সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি করিয়া দিবার স্থির করিয়াছি. কিন্তু আমাদের ক্ষমতা অধিক নয়, তাই সেই দুঃখী পরিবারের জন্য আজ আমি আপনার রাজশ্রী-শোভিত চরণ-সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে ভিক্ষা করিতেছি; একবার এই দীনগণের প্রতি মুখ তুলিয়া চান, বড় আশায় পরের জন্য আপনার চরণে এই ভিক্ষা করিলাম।*** এ দীন সন্তানের প্রার্থনা পূরণ করুন।

কলিকাতা ষ্টার থিয়েটার
ইতি ২০শে আষাঢ় ১৩০৩ সাল ॥

স্নেহঋণে চরণে বিক্রীত
শ্রীঅমৃতলাল বসু

এই পত্রটিকে অমৃতলালের প্রবন্ধের ভূমিকাস্বরূপ দেখলে বোঝা যায় কী দুঃসহ দারিদ্র্য নিয়ে ভুবনমোহন পরবর্তী একত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং অমৃতলালের প্রবন্ধ পড়লে জানা যায় এই হতভাগ্যের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতি ভুবনমোহন 'মহানিদ্রার কোলে চেতনাহারা' হওয়া পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ভুবনের কথা, নিজের কথা, নাট্যশালার গোড়ার কথা—সবই তাঁর অনুপম চলতি রীতির গদ্যে লেখার পর তাঁর বক্তব্য—

> "একে তো বুড়ো ম'লে কেউ কাঁদেনা, তাতে কর্ম্মহীন, ধনহীন বৃদ্ধের ঊর্ধ্বগতিতে! চোখের জল আর কে ফেলবে! অতীতের স্মৃতি আমায় যে কটা কথা লেখালে, তাই উপহার দিয়ে গেলাম বাঙ্গালার নাট্যশালার সেকালের কথা যাঁরা শুনতে চান তাঁদের।"

'সপ্তমীর রাত' 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা অমৃতলালের একটি পত্র। প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৫এর ২৬এ আশ্বিন সংখ্যায়। পত্রটিতে আঁকা হয়েছে পুরনো একটি রমণীয় স্মৃতির চিত্র। 'যখন বঙ্গের অভিনেতৃবর্গের নতুন রং-করা জীবন-পূজার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত ছিল—একটি আনন্দপূর্ণ মঙ্গলঘট', তখনকার একটি প্রবাসরাত্রির আনন্দোচ্ছল স্মৃতি দীর্ঘকাল পরে (মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে) অমৃতলালকে উন্মনা করেছে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিনয়ের জন্যে বাঁকিপুরে গিয়ে তাঁরা—সেকালের কয়েকজন নটনটী—কিভাবে সপ্তমীর রাতটি কাটিয়েছিলেন তারই প্রাণরসোজ্জ্বল চিত্র এটি। অমৃতলালের নিজের কথায়—'সেকালের থিয়েটি্ক্যাল অ্যালবাম থেকে খুলে নেওয়া একখানি ম্লানপ্রায় চিত্রপট।' যখন বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারেরও জন্ম হয় নি, তারও বেশ আগের স্মৃতি। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে নাট্যশালার তখন 'ভাসা ভাসা' সম্পর্ক। এই চিত্রপটে যাঁদের আঁকা হয়েছে তাঁরা হলেন মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, অবিনাশচন্দ্র কর এবং ভুনি, ভাবী ও ক্ষেত্রমণি। দৃশ্যের আড়ালে এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক যে কত মধুর ছিল এই রচনাটি তার এক দলিল বিশেষ। মহেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল, এই দুই বসু-অভিনেতার মধ্যে 'মা-ছেলে' সম্পর্ক কেন, তার ঐতিহাসিক কারণটি জেনে আমরা একসঙ্গে বিশেষ জ্ঞান ও কৌতুকপূর্ণ আনন্দ অনুভব করি।

আগেই বলেছি অমৃতলালের স্মৃতির সঞ্চয় ছিল অনিঃশেষ। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে যখনই পরিচিতজনের বিষয়ে কিছু লিখতে গেছেন, তখনই নিজের কথাও সেই প্রসঙ্গে একটু না বলে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সেই আত্মকথায়

'অহং' কখনও প্রকট হয়নি ; বরং একটা স্নিগ্ধ নির্লিপ্ততার দূরত্বে থেকে অমৃতলালের 'সেই আমি'ও একটি বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে উঠেছে !

তিনি ব্যঙ্গরসিক নাট্যকার; তিনি 'রসরাজ,'—দেশবাসী তাঁর এই খণ্ড পরিচয়টুকু জেনেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এ তাঁর আংশিক পরিচয়। তিনি শুধুমাত্র বিদ্রূপের রূপকার ছিলেন না। মানুষকে ভালবাসবার বা শ্রদ্ধা করবার বিশেষ ধরনের চিত্তবৃত্তিও তাঁর ছিল। তাই বরেণ্য মানুষের, পতিতা মঞ্চনটীর; 'হীন' অভিনেতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষের—সকলেরই মর্মমহিমা তাঁকে এক ভাবে স্পর্শ করতো। এঁদের কথা স্মরণ করতে গিয়ে অতীত সব সময় তাঁর কাছে জীবন্ত হয়ে উঠতো—অনেক 'ভোলা কথার ঘুম' বার বারই ভাঙতো। '...time past is time forgotten' : নিজের সৃষ্ট কোনো এক নাট্যচরিত্রের এই আপ্তবাক্যে টি. এস. এলিয়ট্ কতটা বিশ্বাসী ছিলেন জানিনা ; কিন্তু অমৃতলাল ? নৈব নৈব চ। বরং ধাবমান কালকে তিনি তাঁর স্মৃতিকক্ষে চিরবন্দী করে রেখেছিলেন, বিস্মৃতির খোলা বাতায়ন দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হতে দেন নি।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত এই স্মৃতিকথাকটি ছাড়া তাঁর এ জাতীয় বহু গদ্য-পদ্য রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, 'অমৃত-মদিরা'য়, 'কৌতুক-যৌতুকে' বা অমৃত-গ্রন্থাবলীর চতুর্থভাগে মুদ্রিত আছে। তাঁর আত্মজীবনের আরও অনেক টুকরো কথা এই সব লেখার মধ্যে বন্ধ ও স্তব্ধ হয়ে আছে।

এক সময় যাঁরা তাঁর নাট্যজীবনের সঙ্গী ও সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁদের অকাল-মৃত্যুতে তিনি অনেক অকৃত্রিম ও ব্যথিত হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। সেই সব শোকের স্মৃতির মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যে রেখাচিত্র পাই, তা অন্যত্র প্রায়ই মেলে না। যেমন, বাল্যসখা অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুতে লিখিত কবিতা থেকে জানতে পারি, অর্ধেন্দুই ছিলেন তাঁর নাট্যগুরু—'মোর হাতে হাতেখড়ি, গোড়ায় দিয়েছ গড়ি,/তাই আজি, নট নামে মোর পরিচয় ॥'

আবার গিরিশচন্দ্রের জীবনাবসানে লেখা কবিতাটি থেকে জানতে পারি, গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর ধর্মজীবনের গুরু। যখন তাঁর সংশয়াচ্ছন্ন এবং পুণ্যহীন 'মরু-হৃদি গুরু শূন্য' ছিল, তখন গিরিশচন্দ্রই 'রামকৃষ্ণ পদপ্রান্তে' স্থান করিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনে প্রশান্তি এনে দিয়েছিলেন।

'থিয়েটারী জাত-ভাইবোনদের' সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত মধুর ছিল তার দৃষ্টান্ত এ বইয়ের 'সপ্তমীর রাত' স্মৃতিচিত্রে পাচ্ছি। যখনই এই সব নট-নটীর মৃত্যু হয়েছে তখনই তিনি 'স্মৃতির আদর' করেছেন। স্টারের গঙ্গামণি দাসীর মৃত্যুতে তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল—'কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে।/ শিষ্যা সখী সহচরী সব পড়ে মনে ॥' এইভাবে স্টারের নটনায়ক অমৃতলাল মিত্রের বা সু-

অভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরীর মৃত্যুতে আঁকা স্মৃতিচিত্রও একাধারে তাঁদের চরিতকথা ও ইতিহাস।

আবার যখন কবি হেমচন্দ্রের শেষ জীবনের নিঃস্ব অবস্থা ও করুণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করেছেন, তখন সদৃশ দুর্ভাগ্যের স্মৃতিতে নিজের অমিতব্যয়ী স্বভাবের পরিচর্যাটিও আমাদের কাছে অনাবৃত করে দিয়েছেন—

'আমিও করেছি কালে অর্থ উপার্জন।
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্যাতি গর্জন॥
কিন্ত হে তোমারি মত,
ব্যয় করি অবিরত,
বর্ষায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটীর।
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আঁখিনীর॥'[১]

দর্শক তাঁকে মঞ্চে দেখেছেন হাস্যরসের অভিনেতারূপে। পাঠক তাঁকে পেয়েছেন 'শ্লেষবাণ-সন্ধান-দারুণ' নাট্যকাররূপে ; কিন্তু লোকলোচনের অন্তরালে রসরাজের ব্যক্তিগত জীবন যে বার বার দুঃখের অভিঘাতে আলোড়িত হয়েছিল সে কথা জানা যায় বন্ধুবর নবীনচন্দ্র সেনের প্রতি লেখা স্মৃতিকথামূলক একটি কবিতায়—

'আমিও লিখেছি বসে' ভ্রাতার শ্মশানে।
'কালাপানি' হিন্দুয়ানি শ্লেষ ব্যঙ্গ গানে।
শেষ দৃশ্যে 'হাসি' লিখি বাড়াতে উল্লাস।
সাধের কন্যার গণি শেষ কণ্ঠশ্বাস॥
একমাত্র সহোদরা রাখিয়া চিতায়।
'বাবু'খানি পরদিন করিয়াছি সায়॥
অনুজার দেহোপরে কাঁদে পড়ে জায়া।
'যাদুকরী' ধরে' গড়ি মায়াবিনী মায়া॥
গুরুপত্নী গিরিশের জায়া ল'য়ে ঘাটে।
'তাজ্জব-ব্যাপার'খানি খাটায়েছি, নাটে॥

অমৃতলাল ইংরেজী রচনাতেও পারদর্শী ছিলেন। এই সব লেখার মধ্যেও তাঁর জীবনস্মৃতির কোনো কোনো প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে। আজ বিশেষ করে একটি রচনার কথাই বলি। তাঁর নটজীবন-সূচনার ঐতিহাসিক নিদর্শনরূপে রচনাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে'র মহলায় অমৃতলালের অভাবিত আবির্ভাব ও অর্ধেন্দুর নাট্যনেতৃত্বে তাঁর সমস্ত পূর্বসংস্কারের বিসর্জন এবং অভিনয়শিল্পসাধনার দুরূহ ব্রতগ্রহণের সংকল্প এই রচনায় রসোজ্জ্বল

রূপ ধারণ করেছে। রচনাটির নাম Looking Backward; প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫-এর ৭ই মার্চের The Servant পত্রিকায়। এখানেই পাই শিল্পী অমৃতলালের আত্মআবিষ্কার ও নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশান্ত উপলব্ধি—

'If during a career covering over a period of more than half a century I could have given a moment's solace to a wearied mind, have brought a single smile on the lips of one brother or sister with a troubled soul, my life as a player, playwright and actor-manager has been worth living.'

*

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশক নেপালচন্দ্র ঘোষকে সাধুবাদ দিই। নবযুগের কাছে পুরাতন যুগকে নতুনভাবে পৌঁছে দেওয়া প্রকাশক হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করছেন। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশনাসমূহ এর প্রমাণ দেয়। বইখানি সম্পাদনার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি বন্ধুবর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। দুই কন্যা, ব্রততী ও বল্লরী এবং ভাগ্নী পিয়ালীও তাদের সাধ্যমত সহায়তা দিয়েছে। এ ছাড়া নানাভাবে সাহায্য করেছেন প্রীতিভাজন অশোক উপাধ্যায়। প্রেসকপি তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর কাছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করে দিয়ে শ্রীমান অরুণচাঁদ দত্ত আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন।

একালের সময়সীমায় নিবদ্ধমন একটি পাঠকও যদি এই স্মৃতিকথা পড়ে অমৃত-উৎসুক হন, তা হলেই সম্পাদকের প্রয়াস সার্থক হবে।

অরুণকুমার মিত্র

অমৃতলালের একটি অটোগ্রাফ

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

আমার এ হস্তাক্ষর, চক্ষুশূলে সুদক্ষর,
লক্ষ্যের সম্মুখে নহে উচিত প্রকাশ।
ত্রিভঙ্গ কি অষ্টাবক্র, কুণ্ডলীকল্পিত চিত্র,
ওকড়ার বনে যেন খাকড়ার চাষ।
রসনায় আছে রস, লেখনী নহেক বশ,
মধুতে মিশায় কষ মসীর আভাস।
আদরের গদাধর, লেখাইল ধরে কর,
স্নেহের নাতির পাশে হার বারো মাস।।

৩০শে বৈশাখ ১৩৩৪ সাল — শ্রীঅমৃতলাল বসু

মৃগাঙ্কমৌলী (পরবর্তীকালে এম. এম. বসু, আই. সি. এস. এবং এক সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী) তখন স্কটিশ্ চার্চ স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। অটোগ্রাফ্ সংগ্রহের বেশ সখ। বৃদ্ধ অমৃতলালের একটি স্বাক্ষর তাঁর দরকার। সহপাঠী-বন্ধু 'গদাধর' অর্থাৎ সুধাংশুকুমার সান্যাল (যিনি পরে 'অমৃতচক্রে'র সম্পাদক হয়েছিলেন এবং যাঁর কর্মজীবন শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপকরূপে ; তিনি মৃগাঙ্কর খাতাখানি অমৃতলালকে দেন এবং অমৃতলাল ওপরের কবিতাটি লিখে স্বাক্ষর করেন। আত্মস্মৃতিপ্রসঙ্গে নিজেকে নিয়ে যিনি অনেক পরিহাস করেছেন, ওপরের কবিতায় নিজের হস্তাক্ষর নিয়ে তাঁর সকৌতুক মন্তব্য লক্ষ্য করবার মতো। সত্যিই যদি একালের পাঠক অমৃতলালের 'ত্রিভঙ্গ কি অষ্টাবক্র' অক্ষর পড়ে উঠতে না পারেন, সেজন্য নীচে ছাপার অক্ষরে কবিতাটি মুদ্রিত হ'ল। —সম্পাদক

শ্রীশ্রীশিবদুর্গা

আমার এ' হস্তাক্ষর, চক্ষুশূলে সুদক্ষর, / লক্ষ্যের সম্মুখে নহে উচিত প্রকাশ। / ত্রিভঙ্গ কি অষ্টাবক্র, / কুণ্ডলীকল্পিত চিত্র, / ওকড়ার বনে যেন খাকড়ার চাষ। / রসনায় আছে রস, লেখনী নহেক বশ। / মধুতে মিশায় কষ মসীর আভাস। / আদরের গদাধর লেখাইল ধরে কর, / স্নেহের নাতির পাশে হার বারো মাস। /

৩০শে বৈশাখ ১৩৩৪ সাল — শ্রীঅমৃতলাল বসু

পুরাতন প্রসঙ্গ

[১৩২২-২৩ বঙ্গাব্দে অমৃতলাল তাঁর জীবনকথার কিছুটা বিপিনবিহারী গুপ্তের কাছে বিবৃত করেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩২৩ থেকে কয়েকটি সংখ্যায় 'পুরাতন প্রসঙ্গ (নূতন কল্প)' নামে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তারপর এটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'পুরাতন প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় পর্যায়)' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।]

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২২

আজ প্রাতে স্বনামধন্য নটরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। ৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার নিকটে কলিকাতায় থিয়েটারের বনিয়াদ পত্তনের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার অনেক কথা মনে হইয়াছিল। একটা কথা ধরুন। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জনসাধারণ্যে পরিচিত। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটকখানি পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রচনা করিয়া দেন। এ বিষয়ের ভাল করিয়া অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া আমারও সন্দেহ হয় যে বোধ হয় উহা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নহে। প্রথমতঃ দেখিবেন—বক্তৃতার ভাষাটা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্যান্য নাটকের ভাষা এতটা সংস্কৃত ঘেঁষা নহে। আবার দেখুন, তাঁহার অন্য কোনও নাটকে—

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দু' চারি আদার কুচি

এই ধরণের কবিতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি ও-রকম কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি যে একেবারেই আর ওপথ মাড়ালেন না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। বিশেষতঃ তখনকার দিনে ও-ধরণের কবিতা অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। আমি জানি, ভাল ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ রকম সহজ সরস কবিতা রচনা করিয়া আনন্দবোধ করিতেন, দশের কাছে সমাদরও পাইতেন; বটতলার ছাপাখানায় সেই সকল কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইত।

ইদানীং অনেক জায়গায় আমি সেই সকল বইয়ের সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আর সেগুলি পাই না। আর একটা কথা,—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে পট-পরিবর্ত্তন নাই; পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যান্য নাটকে কিন্তু ইংরাজী নাটকের পদ্ধতি অনুসারে গর্ভাঙ্কাদি বিভাগ আছে। তাই বলিতেছিলাম যে উক্ত নাটকের রচয়িতা বাস্তবিক পণ্ডিত মহাশয় কি না, সে বিষয়ে আপনারা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

আমি বলিলাম—"মহেন্দ্রবাবু যেখানে শেষ করিয়াছেন: আপনারা সেইখানে আরম্ভ করিয়াছেন: অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে যাহারা পবলিক থিয়েটর প্রথম দাঁড় করাইলেন, আপনি তাঁহাদের অন্যতম। আপনি যদি আমাদের বাঙ্গালী ষ্টেজের গত চুয়াল্লিশ বৎসরের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর থিয়েটরপর্ব্বের ইতিহাসটা বোধ হয় এক রকম দাঁড় করান যাইতে পারে। আপনার জীবদ্দশায় যদি সেই ইতিহাসের মাল-মসলা সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটা মস্ত সাহিত্যিক ক্ষতি হইবে। এতাবৎ যে সকল বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আপনাকে জজের আসন গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আপনি নিজের বক্তব্য বলিয়া যাউন: বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকা বিচার করিবেন। আগে আপনি আপনার বাল্যজীবনের কথা কিছু বলুন।"

মুখ হইতে গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া বসু মহাশয় বলিলেন—"বঙ্গাব্দ ১২৬০-এর ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বসু। আমাদের আদি বাসস্থান কলিকাতা নহে; আমরা ধলুচিতার বসু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমার প্রপিতামহ ধলুচিতা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীর সম্মুখে আমাদের কলিকাতার পুরাতন বাটী ছিল; তখন গ্রে-ষ্ট্রীট রাস্তা ছিল না।

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনরিতে আমার পিতাঠাকুর বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সতীর্থ-বন্ধু শম্ভুনাথ পণ্ডিত পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান কলেজ যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি, ওরিয়েণ্টাল সেমিনরি তেমনি গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিক্ষাপ্রচার করিতে গিয়া যদি কোনও বাঙ্গালীর martyrdom হইয়া থাকে, তাহা গৌরমোহন আঢ্যের। নিম্নতম শ্রেণীতে ইংরাজী ভাষা শিখাইবার জন্য তিনি

ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। আমার মনে আছে একজন শিক্ষকের নাম ছিল স্মিথ, আর একজনের নাম ছিল ব্যালিস্। মাঝের শ্রেণীগুলিতে ভাল ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। উপরের দিকে খাঁটি ইংরাজ ও ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হইত। এক হিসাবে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি হিন্দু কলেজের বিপরীত দিকে চলিয়াছিল। হিন্দু কলেজ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার গৌরব করিত; ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি সামাজিক সংরক্ষণ-নীতির প্রশ্রয় দিয়া প্রাচ্য আদর্শকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসিয়াছিল। বাছাই করিয়া ভাল ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য গৌরমোহন শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন; নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহায্য না লইয়া যে বাঙ্গালী হিন্দুসন্তান উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে বাঙ্গালীর ছেলেকে সংযত প্রাচ্য আদর্শে দীক্ষিত করিয়া উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উন্নতির জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যুকে martyrdom বলিব না ত কি বলিব? অথচ এই করুণ ব্যাপারটির বিষয় কয়জন কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী অবগত আছেন? ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কত গভীর তাহা আপনি শুনিলে বিস্মিত হইবেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আঁতুড় ঘরে পিতা আমার মুখ দেখিলেন কি দিয়া জানেন? ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে পাঠদ্দশায় তিনি যে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেই সোনার মেডেল্‌টি সেই সদ্যোজাত শিশুটির চোখের সামনে ক্ষণেকের জন্য ধরিয়া তাহার কচি মুঠার ভিতরে অতি ধীরে তাহা রক্ষা করিলেন। মহাশয়, আজ আমার মাথায় একগাছি চুলও কালো নাই; প্রকৃতি দেবীর শুভ্র আশীর্ব্বাদ আমার শিরে অজস্র বর্ষিত হইয়াছে; এ জীবনে অনেক পুরস্কার দুই মুঠা ভরিয়া অর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সেই প্রথম পরিচয়ের নিশীথে আমার পিতৃদেবের সেই যে আশীর্ব্বাদ হিরণ্যমণ্ডিত হইয়া আমার অঙ্গে চুম্বন করিয়াছিল, তাহার সহিত বাবার ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে পঠদ্দশার একটি আনন্দস্মৃতি বিজড়িত হইয়া এই অতিক্ষুদ্র ব্যাপারটিকে আঁমার নিকটে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশের নিকট হইতে অনেক পুরস্কার দুই মুঠা

ভরিয়া অর্জ্জন করিয়া আবার অকাতরে বর্জ্জন করিয়াছি ; দেশের আশীর্ব্বাদ নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু সেই যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের বিজয়োল্লাসের মধ্যে বোধ হয় কি এক অভিশাপ ছিল, একটা অহমিকা ছিল, একটা মত্ততা ছিল, ভোগের দিনে ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। আজ বার্দ্ধক্যের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহর গণিতেছি, আর ভাবিতেছি—ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়, অর্জ্জনের চেয়ে বর্জ্জন পুণ্যতর। অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমার সমস্ত অর্জ্জিত পুরস্কারকে, অজস্রবর্ষিত আশীর্ব্বাদ-ধারাকে, কর্ম্মীর বিজয়োল্লাসকে ছাপাইয়া সেই সুবর্ণপদক আজ আমার জীবনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

"আরও শুনিবেন ? মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে গাভীর দুগ্ধ পান করিতাম, তাহা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির পয়সা হইতে ক্রয় করা হইত। বাবা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম করিতে পারি,—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), চন্দ্রনাথ বসু, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল যে বাবার ছাত্র ছিলেন, তাহা আমি ঘটনাচক্রে একদিন তাঁহারই মুখে শুনিলাম। তখন মলহার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার ঘটিত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা কল্পনা হইতেছিল ; রেসিডেণ্ট সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল ; এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখিলেন—'আমরা একশত গাইকবাড়কে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নর্থব্রুককে হারাইতে প্রস্তুত নহি।'[১]—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'হীরকচূর্ণ' নামে একখানি নাটক লিখিলাম ; দুষ্টুমি করিয়া কিছু হাসি ঠাট্টা করিলাম, নাট্যসাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা, অক্রূর দত্তের বাড়ীর দেববাবু আমাকে একদিন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নিকটে লইয়া যান ; তাঁহার সাহায্য আমার তখন অত্যন্ত আবশ্যক। আমার নাম শুনিয়া তাঁহার একটি বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—'ওঃ ইনিই আপনাকে থিয়েটারের ষ্টেজে বিদ্রূপ করিয়াছেন।'* তাকিয়ায় ঈষৎ হেলান দিয়া কৃষ্ণদাস পাল আমায় বলিলেন —'আপনার নাম অমৃতলাল বোস ? বাড়ী কোথায় ?' আমি বিনীতভাবে উত্তর দিলাম—'কম্বুলিয়াটোলায়।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কম্বুলিয়াটোলায়

বোস? কৈলাসচন্দ্র বোস আপনার কেউ হতেন?' আমি বলিলাম—'আমি তাঁহারই পুত্র।' 'তুমি তাঁর ছেলে?' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন —'তুমি তাঁর ছেলে? আমিও যে তাঁর ছেলের মত, আমি যে তাঁর ছাত্র! তুমি ত আমার গুরু-ভাই হলে!' এই বলিয়া তিনি সস্নেহে আমাকে কাছে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; যে কাজের জন্যে আমি তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহা এমনভাবে সুসম্পন্ন করাইয়া দিলেন যে, তেমন কিছুতেই আশা করিতে পারি নাই।

"খুব ছেলেবেলায় মনে পড়ে, বাবা সেক্ষপীয়র আবৃত্তি করিতেন; আমি একবর্ণও বুঝিতাম না, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেই আবৃত্তি শুনিতাম। অনেকে তাঁহার আবৃত্তি শুনিতে আসিতেন; ভবানীচরণ দত্ত রোজ আসিতেন। কবিতা আবৃত্তির দিকে এখনও আমার একটা প্রবল ঝোঁক আছে। অল্পবয়সে অনুকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হওয়ার দরুণ এই প্রবৃত্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, কে জানে?[১] ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস বাবার ছিল কি না আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে অনেক সময়ে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন; 'ভাস্কর' ও 'রসরাজ' অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে আসিত। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে বাবা ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারির শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিয়া ম্যাকেঞ্জি লায়াল্ কোম্পানীর এজেন্সি করিয়া কিছু বেশী পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার পড়াশুনার অভ্যাস খুব ছিল। দিবপ্রহরে আপিসের কাজ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি প্রত্যহ মেট্‌কাফ হলে গিয়া পড়িতে বসিতেন। আমাদের পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য তিনি পূর্ব্বেই একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এই ইস্কুল হইতে ছেলেরা প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ১৮৬৪ সালে। এখানে যেমন সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও আর সে রকম ছিল না। প্রথম শ্রেণীতে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পড়া শেষ হইয়া যাইত। ইদানীং, সর্ব্বজনবিদিত অজিত ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন এই বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসে পড়াইতেন। আপনাদের রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা রামগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এখানে আমি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িয়াছি। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পিতা এখানে অনেকদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার সময়ে আমাদের পাড়ার বিশ্বম্ভর মৈত্র মহাশয় যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরির কয়েক জন ভাল ভাল শিক্ষককে সপ্তাহে দু'এক ঘণ্টা করিয়া এখানে আনাইয়া এখানকার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ; আমার মনে আছে সেমিনরির শিক্ষক থার্লো সাহেব আমাদিগকে মাঝে মাঝে অঙ্ক কষাইতেন। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—হেনরি হাইড্। তিনি প্রত্যহ দমদমা হইতে জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া ইস্কুলে আসিতেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা মাত্র !

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনরি হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।[৪] আমার পরীক্ষা দেবার কথা ১৮৬৬ সালে, কিন্তু তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র ; সুতরাং দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে আমি পরীক্ষা দিতে পাইলাম। আমাদের হেড্ মাষ্টার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ; ইতিহাস পড়াইতেন চন্দ্রনাথ বসু ; অঙ্ক কষাইতেন বেণীমাধব দে ; ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন ফ্রেড্রিক্ পেনি। দুইটি পণ্ডিত ছিলেন, খাঁটি সেকেলে টুলো পণ্ডিত,—একজনের নাম গণেশ, অপরটির নাম সরস্বতী। সরস্বতী পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বাড়ীতে বসিয়া এক খোরা ফলারের সঙ্গে একশত আম অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু ছেলেরা তাঁহাদের নামে তখন ছড়া তৈয়ার করে নাই। কিছু পূর্বে হিন্দু স্কুলের ছেলেরা তাহাদের শিক্ষকদের নামে যে ছড়া করিয়াছিল তাহা আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল—

"গুড্ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং,
তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং;
ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা,
তার নীচে গুপে কানা।"— ইত্যাদি।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তখন যত বাঙ্গালা বই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ আমি পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল ত সব ছেলেই পড়িত। বটতলার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক এক-খানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল। লালবিহারী একদিন দোকান হইতে আমাকে একখানি নাটক

পাঠাইয়া দিল,—তাহার নাম 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক।' ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে। Preparatory class-এর মার্শমান পাঠ করিয়া কখন যে ওখানা পড়িতে পাইব, তাহার জন্য অস্থির হইয়া রহিলাম। পড়িয়া দেখিলাম,—কথোপকথনছলে সমস্ত পিনাল কোড্‌খানা নাটকে পরিণত করিবার চেষ্টা! বুঝিতে পারিলাম ডাক্তার যদুগোপালের 'ধাত্রীশিক্ষা'র ধরণটুকুর অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে লেখকের এই বিষম বিড়ম্বনা। Dialogue-এ কিছু লেখা হইলেই তা নাটক হইল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উকিল-গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এক এক খানি নাটক খুব উৎরাইয়া যাইত। "ফলাবে নাটক" নামক একখানি প্রহসন পাইয়াছিলাম; রচনাটি অতি সুন্দর। আর কিন্তু কোথাও সে বই দেখিতে পাই না। বিবাহের দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়; লালবিহারীর দোকান হইতে নাটক চাহিয়া পাঠাইলাম। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' সেই প্রথম আমার হাতে পড়িল। তখনকার দিনে দীনবন্ধুর নাটকের জন্য আমরা সকলে উদগ্রীব হইয়া থাকিতাম; বঙ্কিমের পুস্তকের জন্য তখনও জন-সাধারণের সে রকম উৎকণ্ঠা হইত না। যখন বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' ধাবাবাহিক প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন হইতে বঙ্কিম সকলের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন; তাহার পূর্ব্বে সকলে খোঁজ করিত,—দীনবন্ধুর কোনও নূতন নাটক বাহির হইল কি না। বিবাহের দিন 'লীলাবতী' আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম, —তাই ত, পত্নীটি আমার কি রকম হবেন! সারদাসুন্দরীর মত হলেই ভাল হয়; আমার ত ঝোঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদাসুন্দরীর মত হবে। যদি না হয়! লীলাবতীও মন্দ নয়, কিন্তু……।' বিবাহ হইয়া গেল, দেখিলাম আমার পত্নীটি সারদাসুন্দরীও নন, লীলাবতীও নন…একটি চেলির পুঁটুলি! (Chronicler মহাশয় এইখানে একটু সাবধান না হইলে আমার বিপদের সম্ভাবনা! আমি এ কথাগুলি কিছু ভয়ে ভয়ে বলি!)

"পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি ডাক্তারির ভাণ করিয়া খেলা করিতাম; কলাগাছ কাটিয়া amputation-এর সখ মিটাইতাম; বেলের আটা পচিয়া পোকা হইলে জোঁক বসান'র অভিনয় করিতাম; বেলের আটা সেবন করাইয়া বাস্তবিকই কোনও কোনও রোগীকে আরাম করিতাম।" আবার ম্যুনিসিপ্যালিটির রাস্তার পরিদর্শক সাহেব সাজিয়া হ্যাট পরিতাম, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়িবার

সময়েই ব্র্যাণ্ডফোর্ড সাহেবের রসায়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। মেডিক্যাল কলেজে আমার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, তারিণী-চরণ বসু, ৺মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ম্যাকনামারা সাহেব যখন রসায়ন পড়াইতেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর এইচ. উড্রো মধ্যে মধ্যে সেই বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন; ঘটনাচক্রে প্রায়ই তিনি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে পড়িত আমাদের শ্যামবাজারের ইস্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—ছেটা মোমাছি কেটা পা (ছটা মৌমাছির কটা পা) ?' তাঁহার নাম H. Woodrow ছিল, ছেলেরা বলিত—হুড্রো। তিনি লম্বা সুর করিয়া বলিতেন,—'আমি হুড্রো নই, এইচ উড্রো'; —শেষ ওকারের সুরটা অনেক দূর টানিয়া লইতেন।

"মোটের উপর দুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম। মধ্যে মধ্যে কাশীতে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া থাকিতাম: তিনি আমাকে তাঁহার নিজের ছেলের মত স্নেহ করিতেন। তখন তাঁহার নিজের সন্তান হয় নাই। শেষে একেবারে অ্যালোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চর্চ্চা করিবার জন্য কাশীতে লোকনাথবাবুর বাটীতে রহিলাম। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাল্যকাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এগার বৎসর বয়সের সময় আমাদের বাটীর সন্নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমার একটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকনাথবাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলেন যে হাড় fracture হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অনুমতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিনিকে লইয়া আসেন। আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় হোমিওপ্যাথির প্রথম surgical case হয়। যেদিন প্রথম বন্ধন মোচন করিয়া একটা পাৎলা bandage বাঁধিয়া দেওয়া হইল, সেদিন সেই ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন। একটা হাসির কথা আমার মনে আছে। খোঁজ হইতেছিল, পাৎলা paste board কোথায় পাওয়া যায়! একজন বলিলেন, 'সেক্ষপীয়রের মলাট ছিঁড়িয়া লইলে হয় না ?' ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—'Or the cover of the Bible may do !' খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বেরিনি সাহেবের শ্রদ্ধা ছিল না। তখন জানিতাম না যে, যে ভাঙ্গা হাত হোমিওপ্যাথিক surgery-তে জোড়া লাগিল, সেই হাত ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথির সেবায় নিযুক্ত

হইবে। লোকনাথবাবু জজ ব্যাক্স আয়রণসাইডের স্ত্রীকে বিষম আমাশয় রোগ হইতে মুক্ত করিয়া কাশীতে হোমিওপ্যাথিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিয়াছিলেন। জজ সাহেব নিজে হোমিওপ্যাথ্ হইলেন। লোকনাথবাবু তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলেন। তাঁহার একটি ছেলে সুরেন্দ্র সম্প্রতি বিলাত হইতে ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছে; আর একটি ছেলে দ্বিজেন্দ্র মেয়ো হাসপাতালের Res'dent surgeon। ডাক্তার লোকনাথবাবুর সাধ্বী স্ত্রী কচি ছেলেগুলিকে লইয়া বিধবা হইলেন; কত কষ্টে যে তাহাদিগকে মানুষ করিলেন, তাহা ভগবান জানেন। আমার জীবনপ্রবাহ বক্রগতিতে এতাবৎ চলিয়া আসিয়াছে; যে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারাটি বারাণসী তীর্থে লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের চরণতল ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার সার্থকতায় আমার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন পরে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম—

"কোথা তাত লোকনাথ, দেবপদে প্রণিপাত,
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে।
কত স্নেহ ভালবাসা, কত সুখ কত আশা
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোর জীবনে॥

*　　*　　*

এমনি নিদাঘ নিশি, ছাদেতে সকলে মিশি
পাশাপাশি পালঙ্কেতে করি জাগরণ।
কত গল্প বহুতর, মিথ্যা দ্বন্দ্ব মনোহর,
গ্রহগতি হেরি, করি তারকাগণন॥
তোমার ইঙ্গিতে রাতে, সেই পাচিকার সাথে,
বন্ধন বলিয়া মন্দ কলহরোপণ,'
পিসীমারে মনসাধে, কৃপণতা অপবাদে
কাঁদায়ে, সেধেছি পরে ধরিয়ে চরণ॥।
ইংরাজ জজের জায়া, ছাড়িতে ছাড়িতে কায়া,
তব চিকিৎসায় পায় প্রাণ পুনরায়।
পুরস্কার দিতে এর, আয়রণ্-সাইডের,
কোমল কৃতজ্ঞ মন পুলকেতে চায়॥
মহাপ্রাণ লোকনাথ নিজে না পাতিয়া হাত,

দীন দুঃখী তরে চায় চিকিৎসা-আলয়,
হানিমান্ জয় জয়, ভাবতে কাশীতে হয়,
হোমিওপ্যাথি হস্পিটাল্ প্রথমে উদয় ॥[৬]

কাশীতে অবস্থানকালে ডিউক অভ এডিনবরার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তখনও আমি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করি নাই। একটি বিশালকায় হস্তীপৃষ্ঠে লর্ড মেয়ো ও ডিউক অভ্ এডিনবরা পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ লর্ড মেয়োর করুণ পরিণাম স্মরণ করিলে এখনও মনে বেদনা বোধ করি।

"বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতৃদেবকে কাশীতে রাখিতে গিয়াছিলেন। লোকনাথ-বাবুর বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই লোকনাথবাবুকে হোমিওপ্যাথি শিখিতে বলেন। লোকনাথবাবু যথাসাধ্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী পার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সে কার্য্যের ভার আমারই উপর পড়িল, ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না; যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারি? স্থির করিলাম,—ঘুমাইব না; সতীর্থ-বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বলিলাম—গল্প বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন,—'গল্প শুনবি? কি রকম গল্প বলবো,—দু মিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত?' ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—'ওরে চুড়ী কিনতে হবে!' এত রাত্রে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন—'পেতেই হবে; কাশীতে এসে চুড়ী না নিয়ে ফিরে যাবো কি করে?' সেই রাত্রিতে চুড়ী কিনিয়া আনা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার গল্প বলিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রে তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে পেঁাছাইয়া দিলাম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।

"কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিত এই সময়ে কাশীতে আমার প্রথম আলাপ হয়। নবীন তখনও কোনও বই লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া বন্ধুবান্ধবকে শুনাইত। লোকনাথবাবু জানিতেন,—নবীন একজন ভাল কবি। তখন কাশীতে 'বুড়ুয়ামঙ্গল'-এর খুব ধুম; হোলির পরে মঙ্গলবারে হইত। নদীর উপরে নাচ, গান, যাত্রা;

কাশী-নরেশের সহিত বিজয়ানাগ্রামের রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। লোকনাথ-বাবু বলিলেন,—'নবীন, বুড়ুয়ামঙ্গল দেখতে যাচ্চ, পদ্যে বর্ণনা করতে হবে।' কালি কলম কাগজ ও একটি বোতল মদ লইয়া নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম। বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে নবীনকে বলিলাম,—'লিখবে ত লেখ, নইলে মদ দোব না।' নবীন এক নিঃশ্বাসে বুড়ুয়ামঙ্গল লিখিয়া ফেলিল। অনেক দিন পরে নবীন যখন **Personal Assistant to the Commissioner of Chittagong** (কমিশনার ছিলেন স্ক্রীন সাহেব) আমি তাহার একটি পত্রের উত্তরে কাশীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম—

"কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ।
কাশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ॥
বুড়ুয়ামঙ্গল মেলা মহা ধুমধাম॥
বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসী ধাম॥
জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান।
দুলে দুলে চলে জলে শত জলযান॥
তীরে দীপ, নীরে দীপ, দীপ তরী পরে।
লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে॥
তরণী তরুণী রূপে উজ্জ্বল বিমল।
যামিনী কামিনী দীপে আমোদে বিহ্বল॥
নাচে রম্ভা মেনকার অনুজা সকল।
তরঙ্গে উছলে জলে লাবণ্য তরল॥
কি স্বর-লহর তোলে ভাসায়ে গগন।
অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন॥
আমি ধরে' বসিলাম তোমারে নৌকায়।
হইবে বর্ণিতে মেলা কম কবিতায়॥
নন্দনে রচিলে বসি মকরকেতন।
হ'ত কি না হ'ত গীত তোমার মতন॥"[৭]

"নবীনচন্দ্র বেশী দিন কাশীতে থাকিতে পারিলেন না, কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন। বাগবাজারের অভয়চন্দ্র মল্লিক কাশীতে আমাদের বাড়ীতে উঠিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির কর্তৃ: লাইন তখন খোলা হইয়াছে ; তিনি সেই রেলের জন্য জমি আগাগোড়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি **Land Acquisition Deputy Collector** ছিলেন। লোকনাথবাবুর সংগে তাঁহার শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক পাতান ছিল ; লোকনাথবাবুকে বরাবর জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব করিতেন। কাশীতে আমার প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কিছুকাল পরে কলিকাতায় তিনি আমার সন্ধান পাইয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়া আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ডেপুটি করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অদৃষ্টে হাকিমি না থাকিলে মল্লিক মহাশয় কি করিতে পারেন ? গভর্মেণ্টের কাছে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী ; তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির বড় সাহেবেরা জমি সংক্রান্ত গোলমাল উঠিলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিত। আমি কিন্তু তখন ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে নূতন থিয়েটরে আখড়াই দিতে যাইতাম।[৮] ভুবন নিয়োগীর বাড়ী যাইতে হইলে অভয়বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া গেলেই শীঘ্র যাওয়া যায় ; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়া ডেপুটি করিয়া দেন. এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়া লুকাইয়া থিয়েটর করিতে যাইতাম।···অভয় বাবুর পৌত্র ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এখন লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

"এই সময়ে সর্ব্বত্রই ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হইল। কাশীতে আমাদের বাসায় চাকর বামুন সকলেই জ্বরে পড়িল। কোনও রকম করিয়া একটু জলসাবু তৈয়ার করিয়া রোগীদের পথ্য ও আমার নিজের আহার সারিয়া লইতে হইত। ১৮৭২ সালের গোড়ায় লোকনাথ বাবুর চিঠি লইয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে গেলাম। বলদেব পালিত মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। বাঁকিপুরেরও তখন অনেকে ডেঙ্গুজ্বরে পীড়িত ; উকিল গুরুপ্রসাদ সেনকে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। দুইদিনে আমার চারটি টাকা রোজগার হইল। ডাক্তার বসন্ত দত্ত আমার মুরুব্বি হইলেন। বলদেব বাবুর বাসায় কিছুদিন অবস্থানের পর একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসন্ত বাবুর সংগে আমি থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া কার্য্যে ব্রতী করিয়া দিলেন ; যাহাতে আমার উন্নতি হয় কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে আসিয়া বাঁকিপুরে ছয় সাত দিন আমাদের

বাসায় ছিলেন। সহর খুব সরগরম হইয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড সভায় কেশববাবু বক্তৃতা করিলেন। আমি বক্তার কাছে বসিয়া সমস্তটা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কলেজের একজন ইংরাজ অধ্যাপক সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক বাগ্মীর বক্তৃতায় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি; কেশব বাবুর বক্তৃতা **grand divine, inspired!** —আর কাহারও সম্বন্ধে আমি এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নই। পহেলা জানুয়ারিতে তিনি যখন কলিকাতা টাউন হলে প্রতি বৎসর বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, দেশী বিদেশী সকল শ্রোতাই বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইত; বক্তৃতার মধ্যে তিনি যখন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী হেলাইয়া There, my God বলিয়া উঠিলেন তখন সেই তর্জ্জনীসঙ্কেতাভিমুখে আমাদের মুখ ফিরাইতে হইত; সহসা মনে হইত যেন ঐখানে তাকাইলেই ঈশ্বরকে আমরাও দেখিতে পাইব। দেখুন, পরমহংস ঠাকুর একদিন একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা তুমি যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও, তোমার চাপরাস্ আছে?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'ঠাকুর, চাপরাস্ বুঝতে পারলুম না; চাপ্‌রাস্ কি? আমার চাপ্‌রাস্ নেই।' 'তা' হ'লে লোকে তোমার কথা শুনবে কেন? দেখ, একটা গাঁয়ে একটা পুকুর ছিল; গাঁয়ের সকলেই সেই পুকুরের জল খেতো; কিন্তু সেই পুকুরের পাড়টা দুষ্টু লোকেরা ময়লা করত, কারও বারণ শুনত না। একদিন গাঁয়ের সকলে মিলে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করলে। কিছুদিন পরে একটা চাপ্‌রাস্ পরা লোক এসে পুকুরের পাড়ের ওপর একটা গাছে হাকিমের আদেশ লট্‌কে দিয়ে গেল। তার পরে আর কেউ পুকুরের পাড় ময়লা করে নি। তার চাপরাস্ ছিল, তাই ত'ার কথা মানলে। তোমার চাপ্‌রাস্ না থাকলে তোমার কথা লোকে মানবে কেন?' আমার মনে হয় কেশব সেনের চাপরাস্ ছিল।

"কেশববাবু তখনকার যুবকদিগের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ত'াহার দেখা-দেখি অনেক ছোক্‌রা চস্‌মা পরিতে আরম্ভ করিল। কেশববাবু চস্‌মা নাকে দিয়া ঘুমাইতেন। একদিন আমি ত'াকে বলিলাম—চস্‌মা চোখে না থাকলে কি আপনি স্বপ্নও দেখতে পান না? তিনি হাসিয়া উঠিলেন। একদিন বসন্তবাবু ও কেশববাবু বাসা হইতে বাহির হইয়া যাইবার কিছু পরে আমি বলদেব-বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় চাকরকে বলিয়া গেলাম 'আজ আর বাসায় ফিরিব না।' সন্ধ্যার পর তাঁরা দুজনে আসিয়া আমাকে ধরিয়া

লইয়া গেলেন। কেশববাবু বলিলেন, 'আজ ফূর্ত্তি করে এত খাবার কিনে এনে চাকবের কাছে শুনি যে তুমি আজ আর বাসায় ফিরবে না! আমরা ভাবলুম তাও কি হয়? এ খাবার খাবে কে?' এখনও যখনই আমার মনে হয় যে আমাকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

"বলদেববাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দে তিনি সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। একটি শ্লোক আমার মনে পড়িতেছে,—

'সমাচ্ছন্নাকাশে জীমূতজালে।
জ্বলে স্বর্ণলেখা তড়িম্মাল্যভালে॥
হৃদে তেমতি শ্রীমতী রাধিকার
প্রিয়প্রাপনাশা হরে অন্ধকার॥'

"এই ছন্দে তিনি ভর্তৃহরি রচনা করিয়া ফেলিলেন। তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সংগলাভ আমার বেশী দিন ঘটিল না।

"১৮৭২ সালের শেষাশেষি বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিলাম।

"এইবারে আমার থিয়েটর-জীবনের কথা আসিয়া পড়িবে। কাশীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংশ্রবে আসিয়াছিলাম, উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁহাদের অন্যতম। নানা কারণে তিনি তখন তাঁহার পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপ-দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় আসিলেন। আজ তাঁহার নাম-টুকু উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আবার আপনি তাঁহার দেখা পাইবেন। আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি,— রাজচন্দ্রসান্ন্যাল। তিনি তখন কুইন্স্ কলেজের লাইব্রেরিয়ান্। প্রিন্সিপ্যাল গ্রিফিৎস্ সাহেবের স্বরচিত বেণুবনের কুঞ্জবীথিকায় সন্ধ্যায় একাকী তাঁহার পাদচারণা আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ সেই বেণুকুঞ্জের মধ্যে উপবেশন করিয়া গ্রিফিৎস সাহেব রামায়ণ ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিতেন। রাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরি হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। ইংরাজী পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সান্ন্যাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী। আজ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় লইলাম।"

২২এ ফাল্গুন, ১৩২২

আজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—"গোড়াতেই আপনাকে আমার ছেলেবেলাকার আরও দু'একটি কথা বলিয়া লই। এখন পর্য্যন্ত আমি এমন কিছু বলি নাই যাহাতে আপনি আমার বাঙ্গালা রচনার—বিশেষতঃ parody রচনার—গোড়ার সূত্র ধরিতে পারেন। আজ প্রথমেই সেই কথা আপনাকে বলিব।

"আমার একজন খুব দূর সম্পর্কীয় কাকা ছিলেন; তাঁহার নাম প্যারীমোহন বসু। তাঁহার দুই খুড়া খৃষ্টান হইয়া যান;—একজনের কন্যাদ্বয় বিধুমুখী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু, যশ অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার বংশের আর একজন কেশব-বাবুর সমাজের ব্রাহ্ম হইলেন। প্যারিকাকার সতীর্থ-সুহৃদ ছিলেন নবকৃষ্ণ ঘোষ; নবকৃষ্ণবাবু জ্যোতিষশাস্ত্র বেশ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি রামশর্ম্মা নামে সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তখনকার খৃষ্টান পাদরীর ইস্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া তাঁহারা পঠদ্দশায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন। একটু বেশী বয়সে প্যারীকাকা বেঙ্গল থিয়েটরের তখনকার নামজাদা নট 'ন্যাদাড়ু' গিরীশ ঘোষের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। আমার পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

"তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাঙ্গালা বই পড়িয়া শুনাইতাম; 'ভাস্কর' কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাঙ্গালা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। তিনি শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেন: 'ভাস্করে' তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা,
শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,

প্যারীকাকা লিখিলেন—

আহা,
বৃষভের ল্যাজে শোভে যেই পুচ্ছরাজি,...

পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

আমি হনু, এ বিপুলে বিশ্বে কে না ডরে
দেখি মোর লাফ !

তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাঁহার সাকরেদ হইয়া উঠিলাম ; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপূরণের জন্য আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্বে কবিতা রচনায় আমার হাতেখড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই শ্যামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তখনকার দিনে অক্ষক্রীড়ার ওস্তাদ তাঁহার মত আর কোনও বাঙ্গালী ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি একখানা বই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন—'অক্ষবল-চরিত।' পণ্ডিত মহাশয় 'ছন্দপ্রকাশ', 'ছন্দবোধ' প্রভৃতি কয়খানি অতি সুন্দর পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটারি। বাবার অনুমতি লইয়া ঐ পুস্তকগুলি স্কুল-পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইল। আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। পরে প্যারীকাকার নিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আদ্যক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটা বানান করা হয়। এখনও আমার সেটা মুখস্থ আছে—

শ্রীশ্রীহরিপদে যে বা করয়ে স্মরণ
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন ॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত ॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ ॥
বন্দি ঈশ্বর চরণ খোঁজে মোক্ষপথ।
সুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত ॥

"এ কবিতাটি লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোনও রকম করিয়া মিল চাই ; এ ত হইল শব্দের গোঁজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—'একটা ভাল করে পদ্য লেখ না।' তখন সবেমাত্র স্যর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—'স্যর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা কবিতা

লেখ না।' আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাইকেলের 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতাটির ছন্দে একটা পদ্য রচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা 'ভাস্করে' প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সহজ সরসতা, native wit ছিল; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।

"আমার যে একটু native wit ছিল, অল্পবয়সেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। আমাদের ছেলেবেলায় কলিকাতার নাট্যসমাজে কালিদাস সান্ন্যাল[৯] খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একাধারে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে এবং Organiser। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে তাঁহার খুব আদর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভুত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু সেদিকে আদৌ তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার রচিত 'নল-দময়ন্তী'[১০] নাটক কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। তিনি ফটোগ্রাফি বড ভালবাসিতেন। তখনকার দিনে বিলাত হইতে রীতিমত তৈয়ারী প্লেট আমদানী হইত না; কলোডিয়মের সাহায্যে আলোকচিত্র তুলিতে হইত। সময়ে সময়ে তাঁহার খুব ভাল সোরা আবশ্যক হইত। আমাদের সোরার কল ছিল। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—'ওহে খুব ভাল সোরা কিছু আমাকে দিতে পার?' আমি বলিলাম, 'তা কেন পারব না?' কিছু পরে আন্দাজ তিন সের সোরা কালিদাদাকে দিলাম। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'খুব ভাল ত? নুন নেই ত?' আমি দু একবার 'না, না' বলিয়া শেষটা বলিলাম—'আজ্ঞে, একটু আছে বৈ কি, নইলে যে শুধু পীটর্ হোতো।' তিনি বলিলেন—অ্যাঁ কি হোতো? আমি উত্তর দিলাম,—'শুধু পীটর্ হোতো; নুন না থাকলে কি সল্ট্-পীটর্ হয়?' কালিদাদা হাসিয়া উঠিলেন। আমাদের উৎকৃষ্ট সোরা ইংরাজ রাসায়নিক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইত।

"প্যারীকাকার মৃত্যুর পরে আমার বাঙ্গালা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখানা প্রহসন-নাটক লিখিয়া ফেলিলাম। আমাদের পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল। একদিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল— 'আপনি আমাদের একটা পালা লিখে দিন।' আমি বলিলাম, 'আমি কি লিখে

দোব ?' তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ; একখণ্ড দাশু রায়ের পাঁচালী আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম ; নামটা বড় ছোট খাট হইল না—'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা ?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত। রচনায় যে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল তাহা নহে ; তবে এইটুকু বলিতে পারি—আমি অনুকরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চুরি করি নাই। কথাটা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কারণ ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যে চোরাই মাল সর্ব্বত্রই নজরে পড়িতেছে।

"রস-সাহিত্য রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথবাবুর বাসায় ছিলাম, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিত ভাবে কাগজ বাহির হইত ; কলিকাতা শহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। শিশিরবাবুর প্রতিভা যে কত দিকে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা আর আপনাকে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তিনি গান বাজনার বিচক্ষণ সমজদার ছিলেন ; কুস্তি করিতে জানিতেন ; কবি ছিলেন, সুরসিক ছিলেন। প্রবল ঝটিকায় অনেকগুলা গ্রাম উৎসন্ন হইয়া গেল ; তিনি সেই সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া সেই সাইক্লোনের গতি নিরূপণ করিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রীতি academic ধরণের পোষাকী ব্যাপার ছিল না। নীলকরের প্রপীড়িত প্রজাদিগের দুর্গতি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ; দেশবাসীর বেদনায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হইয়া উঠিত।

"দেখুন আপনাকে এই সকল স্মৃতিকথা বলিতে বসিয়া ভাবিতেছি যে, মানুষ যখন বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে একটা কোথাও গিয়া ঠেকে, তখন কিসে কি হইল, তাহার হিসাব-নিকাশ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন উঠিয়া উঠে। বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে যে মানুষটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পক্ষে তোলদণ্ড লইয়া সেই বিচিত্র শক্তিতরঙ্গের

voltage ওজন করিতে বসা বাতুলতা মাত্র। কেহ আমাকে প্রশ্ন না করিলে আমার বাল্যজীবনের এতগুলো কথা একত্র সাজাইয়া বলিতে পারিতাম না ; তবুও অনেকটা বোধ হয় এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। যে কথাটা আগে বলা উচিত ছিল, যে ব্যক্তির নাম আগে করিলে ইতিহাস হিসাবে নিখুঁত হইত, সে কথাটি অথবা সে নামটি পরে মনে পড়িতেছে। কি করিব ; যখন যেমন মনে পড়িতেছে, আমার স্মৃতিকথা সেই রকম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

"ছেলেবেলায় আমাদের জিমন্যাষ্টিকের খুব ধুমধাম ছিল। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে একজন ফিরিঙ্গি (তাহার নাম ছিল পীটর) জিমন্যাষ্টিক খেলা দেখাইযা সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ঝোঁক হইল, ঐ রকম খেলোযাড হইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উদ্যোগী হইলেন দুর্গাদাস কর,[১১] নবগোপাল মিত্র[১২] ও শ্যামাচবণ ঘোষ। অল্পদিনেব মধ্যেই ভাল জিমন্যাষ্টিক আখড়া স্থাপিত হইল। আমাদের ওস্তাদ হইলেন পীটর। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিখিল অখিলচন্দ্র চন্দ্র।[১৩] পরে তিনি Ward's Institution-এ (রাজেন্দ্রলাল মিত্রেব প্রতিষ্ঠিত) শিক্ষক হইলেন। শ্যাম ঘোষ ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক-গুলি বই বচনা কবিযা গিয়াছেন। স্বনামধন্য দুর্গাদাস কব শ্যাম ঘোষকে উৎসাহ দিতেন। আব নবগোপাল মিত্র ? আজ আমবা পত্রিকার স্তম্ভে কিংবা বক্তৃতার আসবে তাঁহার নাম ভুলেও মুখে আনি না ; কিন্তু একদিন তিনি কলিকাতার বাঙ্গালী যুবকদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাব ন্যাশনাল পেপার সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিল। এই ন্যাশনাল শব্দটা বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথমে ভাল করিয়া জনসমাজে চালাইয়া যান। শঙ্কব ঘোষের লেনে তাঁহার বাড়ী ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদেব সমাজে 'ন্যাশনাল' শব্দটা বড় unlucky ; কোনও 'ন্যাশনাল' অনুষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দাঁড়াইল না। নবগোপাল বাবুর উদ্যোগে চৈত্র মাসে একটি মেলা বসিত। এই আমাদের প্রথম 'ন্যাশনাল' মেলা। যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। আমার মনে আছে, এই মেলায় মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটি রাসায়নিক বিভাগ খুলিয়াছিলেন। আমরা নবগোপাল বাবুর চেলা হইলাম।

"আমাদের দেখাদেখি চারিদিকে জিমন্যাষ্টিক আখড়া স্থাপিত হইল। স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল দুইবার আমাদের আখড়ায় আসিয়া মেডাল দিলেন। বিদ্যালয়গুলোতে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। শ্যাম ঘোষ হুগলী কলেজে

ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, আমাদের পাড়ার নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমরা একটি আখড়া করিলাম।

ছেলেবেলায় আমাদের এই কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে যখন অধ্যয়ন করিতাম, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ছাড়া আর যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল মনে পড়ে না বরং বোধ হইত তাঁহার মধ্যে রসকস কিছুই ছিল না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা শুনিলাম যে তিনি ও বাবু (পরে মহারাজ স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'মামাত-পিসতুত' ভাই ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চাল-চলনও যেন আভিজাত্যসূচক বলিয়া বোধ হইত। স্কুলের শিক্ষক হাইড্ সাহেব ছেলেদের নামের শেষ অংশটা ডাকিতেন ; যথা,—অমৃতলাল বসু না ডাকিয়া ডাকিতেন —লাল বসু; অর্দ্ধেন্দুর নাম তিনি কখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, মুস্তফি না বলিয়া সাহেব বলিতেন,—ম্যাস্টিফ্। অর্দ্ধেন্দুকে ছেলেরা বড় জ্বালাতন করিত ; আমিও অনেক সময়ে তাহাদের সহিত যোগ দিতাম ; কিন্তু যখন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিত, আমি তাঁহার পক্ষ লইতাম। আমাদের সহিত দুই বৎসর কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে লেখাপড়া করিয়া অর্দ্ধেন্দু পাইকপাড়ার স্কুলে চলিয়া গেলেন।

"ইহার পরে প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার দেখাশুনা হয় নাই ; তাঁহার নাম পর্য্যন্ত আমি বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি ওরিয়েন্টাল্ সেমিনরিতে তখন অধ্যয়ন করি। আমি এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই প্রাইভেট থিয়েটর সম্বন্ধে আলোচনা ছেলেমহলে খুব হইত। কোথায় কোন্ নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা-সমাজের কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া ছেলেরা জল্পনা কল্পনা করিত। এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত। আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও থিয়েটর দেখিতে যাই নাই ; সন্ধ্যার পরে বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ ছিল। শুনিলাম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কি না'-র জবাব ভুলু মুখুয্যে (আহিরী টোলার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) খুব দিয়াছে ; তাহার জবাবের নাম, 'কিছু কিছু বুঝি'।

ছেলেমহলে খুব হৈচৈ পড়িয়া গেল। আমরা শুনিলাম যোড়াসাঁকোর কয়লা-হাটায় উহা অভিনীত হইবে। বন্ধুরা আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন—'চল, থিয়েটর দেখতে হবে।' আমি বলিলাম, 'আমার যাওয়া হবে না ; সন্ধ্যার পরে কখনও বাড়ীর বাহিরে থাকি নাই।' তাঁহাবা বলিলেন,—'তবে না হয় দিনের বেলায় চল, ষ্টেজ দেখে আসবে।' আমি সম্মত হইলাম। সেখানে আমার প্রথম থিযেটরের ষ্টেজ দর্শন হইল। সীন্ বড় বেশী ছিল না ; দেয়ালের গায়ে একখানা 'সীন্' অঙ্কিত দেখিলাম। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কে অভিনয় কবিবে ? শুনিলাম—ধর্ম্মদাস আছেন, আর আছেন—অর্দ্ধেন্দু ! নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। 'অর্দ্ধেন্দু ! কোন্ অর্দ্ধেন্দু ?' কে একজন বলিল—'অর্দ্ধেন্দুশেখব মুস্তফি। চমৎকার প্লে করে।' এ নাম ত আর কাহারও হইতে পাবে না ; ইঁনি নিশ্চয়ই আমার সেই কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের সহপাঠী ! কিন্তু তখন ত সে অত্যন্ত অরসিক ছিল ; এখন চমৎকার অ্যাক্ট করে ! জিজ্ঞাসা করিলাম—'একবার তাব সঙ্গে দেখার সুবিধা হয় না। সে কোথায় ?' দেখা হইল না ; ফিরিয়া আসিলাম।

"কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন অর্দ্ধেন্দুর দেখা পাইলাম। আমাদের বাড়ীব দরজায় বসিয়া আছি, (বাড়ীর সম্মুখে খোলা ড্রেণ ছিল ; সেই ড্রেণের উপর সাঁকো ছিল ; দরজার সামনে বাঁধান সাঁকোর উপরে বসাটাই দরজায় বসা বলা হইত এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া তাহার ভারি আনন্দ হইল ; আমি কি করিতেছি, থিয়েটর দেখিতে ভালবাসি কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া সে বলিল—'তুমি একদিন আমাদের থিয়েটর দেখতে যাবে ? টিকিট এনে দোব।' আপনারা এখন বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু তখন থিয়েটরের টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল ; অনেক খোসামোদ করিয়া তবে টিকিট যোগাড় করা হইত। আমি বলিলাম,—'না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাত্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, আর এ বছরে আমি এন্ট্রান্স একজামিন্ দোব।' আমার যাওয়া হইল না। দেখুন, নিজে থিয়েটর করিবার আগে আমি ঝামাপুকুরে দুই বার মাত্র শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়াছিলাম ; অভিনয় আমার পিসীমার বাড়ীতে হইয়াছিল বলিয়া আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল।

"১৮৬৯ সালে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হইল। তৎপূর্ব্বে আমি ঐ

নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম। কেবলই মনে হইত, আমি ছাড়া জগতে এমন মানুষ নাই যে নিমে দত্তের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। রামচন্দ্র মিত্রের[১৪] বাড়ীতে অভিনয় হইল; চারিদিকে খুব সুখ্যাতি শোনা গেল। আপনাকে এইখানে আমি একটি কথা বলিতে পারি—**that play was the unconscious germ of the public stage.**

"আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে আনাগোনা করি। একদিন অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; সে বলিল—'সধবার একাদশী' দেখতে গেলে না?' আমি বললাম,—'কি করে যাই?' পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা তোমাদের নিমে দত্ত কে সাজে?' অর্দ্ধেন্দুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'গিরীশ ঘোষ।' আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—'গিরীশ ঘোষ? কোন্ গিরীশ ঘোষ?' সে বলিল, 'বোস পাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে; চমৎকার অ্যাক্টর্।' আমি বলিলাম—'ওঃ, নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই? সে ত কেরাণিগিরি করে! সেক্ষপীয়র আওড়াবে কি করে? কলাপাতার প্রকাণ্ড ঠোঙ্গায় মুড়ে সাজা পান নিয়ে তাকে রোজ আপিস যেতে দেখি। দিগম্বর দে'র কাছে **Book-keeping** শিখে সে আপিসে খুব ভাল **Book-keeper** হয়েছে জানি; কিন্তু সেক্ষপীয়রের সে কি বোঝে? ব্রজ (গিরীশবাবুর বড় সম্বন্ধী, চুনীলালের পিতা) কিছু বোঝে; সে বরং চেষ্টা করলে পারতে পারে; কিন্তু···গিরীশ ঘোষ!' হায় রে মূঢ় আত্মাভিমান! ঘরে বসিয়া 'সধবার একদশী' পড়িয়া যে স্বপ্নের জাল চারিদিকে বুনিয়াছিলাম, আজ কোথা হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর একটা দম্‌কা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া আমার সেই স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া দিল? আমি ছাড়া জগতে অন্ততঃ আরও একজন মানুষকে পাওয়া গিয়াছে, যে নিমে দত্তের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দশজনের নিকট হইতে বাহবা লইয়াছে! অর্দ্ধেন্দুশেখর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তা নয় হে, তা নয়। নিমের পার্ট্ সে বেশ প্লে করে; তুমি একদিন চল না, দেখ্‌বে।' আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—'তা হ'তে পারে।'[১৫] অভিনয় দেখিতে গেলাম না।

"শুনুন, সোজা কথায় আপনার নিকটে আমার এই পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি; **psychological analysis** করিতে বসি নাই। দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করিব, এমন সময় বা সামর্থ্য আমার নাই। বলিতে পারেন,—যে তরুণ যুবক কখনও রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া কোনও নাটক পূর্ব্বে

অভিনয় করে নাই, তাহার এমন চিত্তবিকার হয় কেন? এ ঈর্ষ্যার কারণ কি? অল্প দিন পরে যাঁহার নিকটে আমাকে নত মস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, যাঁহার প্রথম মধুর সম্ভাষণে আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত হইতে হইবে, তাঁহার প্রথম সুখ্যাতি পরের মুখে শ্রবণ করিয়া আমার মেজাজ খারাপ হইয়া গেল কেন?

"কিন্তু সে সকল কথা পরে বলিতেছি। নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমাদের সেই জিমন্যাষ্টিক দল খেলাধুলা করিত। সেই সময়ে একটি লোক সেখানে আনাগোনা করিতে লাগিলেন; তাঁহার নাম গিরীশচন্দ্র মিত্র। লোকটি বাস্তবিকই একটা genius। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলের মত ভাল করিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু মহেন্দ্র চাটুয্যের বহু পূর্ব্বে তিনি ক্লারিয়নেট বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; একটা সুন্দর মডেল এঞ্জিন তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন; ঢাকার শুকলালের প্রসিদ্ধ সেতারের অনুকরণে একটি সেতার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার কাছে তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। তিনি কাহারও সাহায্য লইতেন না; কাঠ চেরা হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তিদন্তের বিচিত্র কারুকার্য্য পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্রের আগাগোড়া তিনি নিজে করিতেন; খুব ভাল ছাটকাট সেলাইয়ের কাজে উত্তম দর্জ্জিকে হার মানাইয়া দিতেন। তিনি বলিলেন—লোহার ডাণ্ডার উপর খেলা করার দরকার নাই, মাটিতে নানাপ্রকার ব্যায়াম করা যাউক। নূতন ধরণে ব্যায়াম শিক্ষা চলিতে লাগিল।—মাঝে মাঝে অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যায়াম-নৈপুণ্য দেখাইতাম। সেই দিন আমাদের উৎসব। প্রহসনের ব্যবস্থাও করা হইত। উহা আমাদের উৎসবের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সূত্রে গিরীশচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

"নটবরের—(আমরা তাঁহাকে চিরকাল নাটুদাদা বলিয়া ডাকিতেছি, নটবর বলিতে যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকে)—নটবরের বাড়ীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন; হাস্য-পরিহাসের তুফান উঠিত।[১৬] অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের সভার মধ্যমণি; বিদ্রূপাত্মক কথাবার্ত্তার ও অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন। একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন; আমরা সব রোগী সাজিলাম—ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি;

caricature-এর চূড়ান্ত করা হইত।[১৭] ক্রমশঃ এই রকমেই যেন অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল। আমাদের মনে একটা অভিমান ছিল, যা'তা সাজতে আমরা রাজি হইতাম না; অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে রকম কোনও অভিমান ছিল না। এমনি করিয়া caricature করিতে শিখিলাম; কিন্তু farce রচনা করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় করা কিছু শক্ত ব্যাপার। রচনা করিতাম বটে; কিন্তু এখন ইচ্ছা হইল, একজন পাকা ওস্তাদের কাছ থেকে একটা ফার্স লিখিয়া লইতে হইবে। সখের যাত্রার দলের জন্য গিরীশ ঘোষ পালা রচনা করিয়া দিতেন, গান বাঁধিয়া দিতেন: একবার তাঁহাকে ধরিলে হয় না? এক রবিবারে আমি একাকী গিরীশবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। গিরীশবাবু বলিলেন —'তুমি কে গা! তোমার নাম কি?' উত্তর হইল—'আজ্ঞে, আমার নাম অমৃতলাল বসু; আমি কৈলাসচন্দ্র বসুর ছেলে।' 'ওঃ, বুঝেছি, বোসো; তুমি কি করছ?' 'সম্প্রতি আমি এন্ট্রান্স দিয়েছি; আপনার কাছে এসেছি একটু কাজে; আমরা acrobatic performance করচি; একটি farce যদি আপনি লিখে দেন তা' হলে বড়ই ভাল হয়।' 'তোমাদের কি রকম ফার্স দরকার তা' ত আমি জানি না। ফার্স যদি তোমরা করে থাক আর একদিন সেইখানা নিয়ে আমার কাছে এস।'·· কিছুদিন পরে একখানা বই লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বইখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'এখানা কে করেছে?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে, আমি।' 'তুমি ত মন্দ করনি; তুমিই লেখ না,—আমি দেখে দোব।' সেই দিন থেকে তাঁহার বাড়ীতে আমার যাওয়া আসা আরম্ভ হইল। তাঁহার মুখে সেক্ষপীয়র আবৃত্তি শুনিতাম;—তাঁহার সে grand voice আপনারা শুনিতে পান নাই: 'সধবার একাদশী'ও তিনি আবৃত্তি করিতেন।

"তাহার পরে আমি কাশী চলিয়া গেলাম। কাশীর কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি। কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। এখানে অবস্থানকালে আমাদের এই কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম; বেতন লইতাম না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চুনীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও ধর্ম্মদাস সুর[১৮] তখন এই স্কুলে মাষ্টারি করিত। আমার বাবা, কাকা, মামা, সকলেই স্কুলমাষ্টারি করিয়াছিলেন; আমিও মাষ্টারি করিতাম। অর্দ্ধেন্দু বলিলেন—'তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে; 'লীলাবতী'র

অভিনয় করতে হবে।' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন। এই নগেন্দ্রনাথই অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরিশচন্দ্রের মিলন সংঘটিত করিয়াছিলেন; কথা হইল, এবার আমরা টিকিট বিক্রয় করিব; বিক্রয়লব্ধ পয়সায় আমরা নিজেদের ষ্টেজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব। তখন গড়ের মাঠে লিউইস্ থিয়েটরের বাড়ী ছিল; কানে মাকড়ি-পরা সুলতানা নামধারী একটা লোক ঐ কাঠের বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যতে ঠিক সেই বাড়ীর প্ল্যানে ভুবন নিয়োগীর থিয়েটর-বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলাম, কেবল দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের তফাৎ হইয়াছিল মাত্র। সে কথা পরে বলিব।

"লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু আমায় বলিল—'দেখ, সব পাওয়া গেছে, উড়েটা পাচ্চি না, কি করা যায়?' আমি বলিলাম—'তোমাদের আমি একটি ভাল উড়ে দিতে পারি।' এই বলিয়া শশীকে লইয়া গেলাম। তা'র পরে অনেক দিন শশীর নাম 'বিসাড়ি' হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথবাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কত কাকুতি মিনতি করিলেন; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না।

"আমাদের রিহার্সাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাই-কোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ সৎ লোক; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আমরা কিছু কিছু হাসিঠাট্টা করিতাম। একদিন আমাদের পুরা মজলিস্ বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন,—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বলতে পারি না, লর্ড মেয়োকে নাকি আন্দামান দ্বীপে খুন করেছে।' সেদিন মজলিস বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই শহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধুমধামের আয়োজন সর্ব্বত্রই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। দেশময় বিষাদের কালিমা লক্ষিত হইল।

"লোকনাথবাবুর সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলাম। ১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে এই যে বাঁকিপুর ছাড়িলাম, আর সেখানে ডাক্তারি করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল না।

"কলিকাতায় আসিয়া যে দিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল দর্শন করিতে যাই, অর্দ্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড্ মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই সুন্দর অট্টালিকার কোনও চিহ্ন এখন নাই; পোর্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে সেটি লুপ্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধেন্দু আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরীশ-বাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে টিকিট বিক্রয় করিবার কথা শুনিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে টিকিট বিক্রয় করিয়া পয়সা লওয়া হয়; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন টিকিট বেচা সকলের ইচ্ছা, তিনি থিয়েটরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরীশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্য একখানা ভাল বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না; আগে ভাল বাড়ী, ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর; নইলে লোকে টিকিট কিনবে কেন?' অর্দ্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন—'আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোট খাটো ষ্টেজ করি; একেবারে বড় বাড়ী বড় ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে?' এই কথা লইয়া দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না; আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরীশবাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটর করিতে হইবে। বাড়ীর দোতলায় আমাদের রিহার্সালের বন্দোবস্ত। ভুবন আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, একটি হার্ম্মোনিয়মও কিনিয়া দিয়াছে। তাহার চাকর হুঁকো টিকে তামাক রাখিয়া যাইত, আমরা নিজে নিজে তামাক সাজিতাম।

"রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপর ভুবন নিয়োগীর সেই বাড়ীটি এখন আর নাই; সোপানাবলী কলবাহিনী ভাগীরথীর জলে ধৌত হইয়া যাইত। দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের রিহার্সাল চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল; বলিল—'তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা নাও;[১৯] বেশী নয়, দু এক রাত্রি তুমি প্লে কর; তা'র পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেবো?' সেই দুই এক রাত্রি করিতে করিতে আজ চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়া গেল।"

২৬এ ফাল্গুন, ১৩২২

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনারা ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে নীলদর্পণের রিহার্সাল করিতে লাগিলেন; আপনি সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা লইলেন; আর কে কি ভূমিকা লইলেন? নীলদর্পণের প্রথম অভিনেতৃদলের নাম কলিকাতাব ষ্টেজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।' অমৃতবাবু বলিলেন,—

"অর্দ্ধেন্দু	··	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলক বসু, একজন চাষা রায়ৎ।
নগেন্দ্র	··	নবীনমাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)	···	বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই)।
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	···	গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর	···	রাইচরণ ও তোরাপ (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।)
মহেন্দ্রলাল বসু	···	পদী ময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী)	···	আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	···	লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপালচন্দ্র দাস	···	আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	···	একজন রায়ৎ।
অবিনাশচন্দ্র কর	···	রোগ্ সাহেব। (এই একটি পার্ট সে প্লে করিল; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই)।
গোলোক চট্টোপাধ্যায়	···	খালাসী।
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	···	সরলা। (চমৎকার প্লে করিতেন)।

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল)	...	ক্ষেত্রমণি।
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	...	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।)
আমি	.	সৈরিন্ধ্রী।
ধর্ম্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এঞ্জিনীয়ার)	..	ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইঁহারাই পরে ষ্টার থিয়েটরের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন।
কার্ত্তিকচন্দ্র পাল	..	Dresser।
নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	..	কমিটির সেক্রেটারী।
বেণীমাধব মিত্র	...	কমিটির প্রেসিডেণ্ট। (ইনি যে থিয়েটরের বিষয় বেশী-কিছু বুঝিতেন তাহা নহে। আপিসে চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটরে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

"খুব উৎসাহের সহিত আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল। আমি তখন থিয়েটরে গা ঢালিয়া দিয়াছি। একদিন ঐ সেই নিয়োগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেন এখন আমার ঠিক মনে নাই। বোধ হয় সেদিন তাঁহারা মেটেবুরুজের নবাবের পশুশালা দেখিতে গিয়াছিলেন; আমি একাকী তামাকু সেবন করিতেছিলাম। আগন্তুক-দিগকে দেখিয়া আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—.

'ভুবন নিয়োগীর এই বাড়ীতে থিয়েটারের রিহার্সাল হয় ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'তুমি কি সেই দলের একজন প্লেয়ার ?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম।

'আজ তোমরা এখনও রিহার্সাল আরম্ভ কর নাই কেন ?'

'আজ আমাদের রিহার্সাল বন্ধ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নাই।'

'তাই ত; আমরা এলুম তোমাদের রিহার্সাল দেখতে'—

'আসুন, ভেতরে বসুন, তামাক খান।'

'থাক, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পারচ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারীমোহন রায়।'

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদধূলি লইলাম, অক্ষয় বাবুকে ও প্যারীমোহন বাবুকে নমস্কার করিলাম।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি ?'

'অমৃতলাল বসু'।

'তুমি কি সাজবে ?'

'সৈরিন্ধ্রী।'

'আচ্ছা সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাই হল, তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা একটু আমাদের শোনাবে ?'

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম। আমি জানিতাম চুঁচুড়ায় অক্ষয় সরকারের দল লীলাবতীর রিহার্সাল দিয়াছিলেন; তখন আমাদের সখের দলে 'লীলাবতী' হইয়াছিল। অক্ষয়বাবুর নাম শুনিয়াই আমার মনে প্রতিদ্বন্দ্বী-ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল; এ সময়ে আমাদের হাতের তাস কি দেখান উচিত ? যাহা হউক, আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—'আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি খুব বেশী, আপনি যখন বলচেন তখন আমি আমার পার্ট একটু আপনাকে শোনাতে পারি।'

আমি নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সৈরিন্ধ্রীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

"সেদিন ফিরিয়া যাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—'এখন আমি

বৌবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে থাকি ; তুমি আমার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। দেখুন সেদিন য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে আমি শিশিরবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—'তিনি একজন আস্ত বাঙ্গালী ছিলেন।' এ কথাটা যে কত সত্য তা' আপনারা বোধ হয় আজকাল উপলব্ধি করিতে পারিবেন না ; তিনি দেশের সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নূতন থিয়েটর খোলা হইল, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম ন্যাশনাল* থিয়েটর দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন,—ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙ্গালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না ? এই যে democratic ষ্টেজ, ইহা ত আর ধনী গৃহস্থের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না ; বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবপুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন ? ইহারা ত সাহস করিয়া 'নীলদর্পণ' লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মর্ম্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার সহিত সমবেদনার জন্য লং সাহেবের কারাবাস হইল, সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে।···কিছু দিন পরে শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটরের একজন ডাইরেক্টর হইলেন।

"এখন যে বাড়ীতে শিশিরবাবুর ছেলেরা বাস করিতেছেন, ঐ বাড়ী আমরা শিশিরবাবুর জন্য ভাড়া করিয়া দিই। তিনি আমাদের পল্লীতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কারণ আমাদের নিকটে থাকিতে পারিলে তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না। অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কাগজ অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রিকার কাজে আমি যে কিয়ৎ পরিমাণেও নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলাম তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম। আমার চিত্তবৃত্তি উদ্বোধনের জন্য অমৃতবাজার

* কেহ কেহ ইহার নাম **Calcutta National** করিবার কথা তুলিয়াছেন। অমৃতবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন—**Calcutta** এবং **National** এ দুটো শব্দের সামঞ্জস্য হয় না ; **Calcutta** শব্দটা বাদ দেওয়া হইল।—লেখক।

পত্রিকার নিকটে আমি কত ঋণী তাহা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি নাই। কোনও প্রকারে যে সে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর তাহা তখন মনেই হইত না। বরং শিশিরবাবুর সংস্রবে থাকিয়া একটা মানুষ হইয়া উঠিতে পারিব এই আশা করিতে লাগিলাম।

"শিশিরবাবু আমাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রথম হইতেই আমাদের সঙ্গে কাজ করিতে আনন্দবোধ করিতেন।[২০] নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ আমাদের থিয়েটরের অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। গিরীশবাবুও ডাইরেক্টর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু গিরীশবাবুর অভিমান তিরোহিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা পবলিক থিয়েটর খুলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলাম।

"নবেম্বর মাসে আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের **General master,** কিন্তু সব বিষয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মত **organiser** বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিমাইচরণ সান্ন্যালদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার* বহির্ব্বাটীর নীচেটা ভাড়া করা হইল, চল্লিশ টাকা মাসিক ভাড়া স্থির হইল। মহাশয়, তখন আমরা চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়া যে অংশটুকু পাইয়াছিলাম, এখন তাহার চল্লিশ টাকা মুনিসিপ্যাল টেক্স দিতে হয়। সেই বাড়ীতে আমাদের ষ্টেজ হইবে। আব্দুল মিস্ত্রীকে লইয়া ষ্টেজ তৈয়ার করিতে বসিয়া গেলাম, কাজ বড় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস না থাকিলে সুব্যবস্থা হইবে না; কিন্তু সে ত সমস্ত দিন আমাদের কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে মাষ্টারি করিয়া বেলা চারিটার সময় অব্যাহতি পাইত, তাহারই কথা অনুযায়ী ষ্টেজ গঠিত হইতেছিল। গতিক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—'দেখ, এক কাজ করা যাক; তোমার বদলে আমি স্কুলে পড়াব; মাসকাবারে তোমার পুরো মাইনে তোমার হাতে দোব; তুমি সমস্ত দিন ষ্টেজ নির্ম্মাণে আব্দুলকে খাটাও।' হেড্‌মাষ্টার আমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। আমি ঐ বিদ্যালয়েই তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলাম। স্কুলের ছুটি হইলে পর আমি ধর্ম্মদাসের সঙ্গে যোগ দিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করিতে লাগিলাম। কাজ যখন অনেকটা অগ্রসর

* যোড়াসাঁকো ঘড়ি-ওয়ালা বাড়ীটি।

হইল, আমরা স্থির করিলাম যে ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমাদের প্রথম অভিনয় এই ষ্টেজে করিতে হইবে। ধর্ম্মদাস ষ্টেজ করিয়া দিলেন ; নোটিশ ও টিকিট ছাপান এবং গ্যাস ব্যবস্থার ভার নগেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল।

"শহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা, আমাদের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন ; প্রায়ই কাহারও মুখ হইতে আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাওয়া যাইত না ; বরঞ্চ অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। পয়সা-কড়ি নাই, মুরুব্বি নাই, অথচ এতবড় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক ইহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে।[২১] নগেন্দ্র ষ্ট্যানহোপ প্রেস হইতে থিয়েটরের নোটিশ মুদ্রিত করিয়া আনিল। তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইল,—দুই টাকার, এক টাকার ও আট আনার। প্রথম শ্রেণীর জন্য জানবাজার হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হইল ; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাঁশের খুঁটির উপর তক্তা দিয়া এক রকম বেঞ্চি করা হইল ; তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ির উপর ও রকে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল।

"৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ১৮৭২ খৃঃ অব্দ বাঙ্গালীর পবলিক ষ্টেজের একটি স্মরণীয় দিন। অপরাহ্ণকালেও আমাদের আয়োজন করা অনেক বাকী ছিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া গ্যাস লাগাইয়া দিবার জন্য গোরমোহন ধরকে রাজী করান হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গ্যাস বসান হইল। সন্ধ্যার পর খবর আসিল যে অবিনাশ কর জ্বরে পড়িয়াছে, রোগসাহেব সাজিবে কে ? তাহার কাছে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হইল ; সে বলিল—'যে রকম করিয়াই হউক আমি প্লে করিব।' পাল্কী চড়িয়া সে আসিল।

"একটি জানালায় টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। দলে দলে দর্শক আসিতে লাগিল। এত ভিড় হইবে আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। সকলে টিকিট পাইল না। জাব্বা-জোব্বা-পরা ভদ্রলোকরা চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলক বোস ও উড সাহেব রূপে প্রথম দুই দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া বসিলেন।

"করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্যে সীন উঠিল ; আমি সৈরিন্ধ্রী বেশে ষ্টেজের উপরে উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতি-

চ্যুত, ধর্মচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারীবেশে উপবিষ্ট হইয়াছি ; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক্ স্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিস্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ-বন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার শাস্তি ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল ; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ যা' হ'বার তা'ত হ'ল ; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গঞ্জনা-লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী হইলাম। বাহবা-ধ্বনির তালে তালে 'সীন্' পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"আজ আমি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাকে বলিতেছি না। প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে নিজের মনের মতন করিয়া স্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষ ভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্য-সাধারণ রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদী-ময়রাণীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজস্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে অমৃতবাজার পত্রিকা সৈরিন্ধ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন—'তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।'

"রাত্রি বারটার সময় থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেলে, লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। আবার শনিবারে নীলদর্পণ অভিনয় করা হইল। একদিন একটি ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—'ওহে, গিরীশ ঘোষ তোমাদের নামে একটা গান বেঁধেছে, তোমাদের খুব ঠাট্টা করেছে।' আমরা বলিলাম, 'বটে, কই সে গান দেখি।' আমাদের গালাগালির গানটি পড়িয়া আমাদের এত ভাল লাগিল যে আমি বলিলাম,— 'ওহে, চমৎকার গান ! এস, গাওয়া যাক্।' আমরা সকলে গান ধরিলাম,—

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ ইন্দুকিরণ সিঁদুর মাখা
মতির হার ॥
নগ হ'তে ধারা ধায়,
সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায় ;—
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার ॥
কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষেতে গুরু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে বসে ধ্যান ;—
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার ॥
কিবা বালুময় বেলা,
পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা ;—
মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের
গোড়ায় দিচ্ছে সার ॥
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে,
বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে
দেখে বাহার ॥

গানটির ব্যাখ্যা এই—

লুপ্তবেণী—বেণী মিত্র ; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-সঙ্গম।

তেরোধার—ত্রিধারা।

পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

অর্দ্ধ ইন্দু—অর্দ্ধেন্দু।

কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতি—মতিলাল সুর।

নগ হ'তে ধারা ধায়—বাস্তবিক নগেন্দ্রই Organiser ছিল।

সরস্বতী ক্ষীণকায়—মূর্খ।

বিগ্রহ—একটা মন্দ গালাগাল। আবার অন্যপক্ষে ত্রিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্ত্তি।

ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান—ধর্ম্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন ষ্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল।

বিষ্ণু—ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক; নেপথ্যে গান করিতেন।

অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীবে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা বাটীতে।

চাষা—অভিনেতৃদলেব মধ্যে অনেকগুলি সদ্গোপ ছিলেন।

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ-রচয়িতা।

পালে পালে—পালপদবীধারিগণ।

শশী—শশিভূষণ দাস।

অমৃত—অমৃতলাল বসু।

"গিরীশবাবুব এই গানটী আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে গাইলাম। তাহার ফলে তাঁহাব মনে ভাবান্তর হইল; তিনি বোধ হয়, আমাদের উপর কতকটা প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে 'ইংলিশম্যান'[২২] পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহিব হইল। লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরীশবাবু লিখিয়াছেন। দু'এক ছত্র আমার মনে আছে,—up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি। সৈরিন্ধ্রীর বিশ্রী ওষ্ঠবিকৃতির (Sairindhri with her upper lip curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল। কিন্তু গিরীশবাবুর অভিমান বেশী দিন টিকিল না। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে আমরা 'জামাই বারিক', 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি অভিনয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর-ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শত্রুমিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিল।

"কেবলমাত্র 'নীলদর্পণ' নাটকখানি লইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। শুধু একখানা নাটক কতদিন লোকের ভাল লাগিতে পারে? 'নীলদর্পণ' দুই রাত্রি অভিনীত হইবার পরই আমরা 'জামাই বারিকে'র রিহার্সাল আরম্ভ করিয়া দিলাম। থিয়েটরের প্ল্যাকার্ড আমরা এবার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া লইলাম।

"ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দীনবন্ধু

মিত্রের সমস্ত নাটক অভিনয় করিলাম। এক এক সপ্তাহে এক এক নূতন বই প্লে করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একখানি মাত্র বই লইয়া আমরা থিয়েটর আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা', শিশিরবাবুর 'নয়শো রূপেয়া' ও পণ্ডিত রামনারায়ণের 'নবনাটক' ও মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা'ও ঐ বাড়ীর ষ্টেজে দেখান গেল।[২৩] 'কৃষ্ণকুমারী'তে গিরীশবাবু নামিলেন। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হইল।*

ভীম সিংহ	...	গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
বলেন্দ্র সিং	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধনদাস	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি।
জগৎ সিং	..	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	...	গোপালচন্দ্র দাস।
কৃষ্ণকুমারী	...	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী।
রাণী	...	মহেন্দ্রলাল বসু।
বিলাসবতী	...	বেলবাবু।
মদনিকা	...	আমি

"একটি গান গাহিবার জন্য নট আবশ্যক ছিল। আমরা মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা ধার্য্য করিয়া হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিলাম। বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালায় ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী। তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে পূর্ব্বে অভিনয় করিতেন। তিনি কেবল ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গোড়াতেই একটি গান গাহিয়া যাইবেন। গানের অংশ খর্ব্ব করিয়া অ্যাক্টিংকে বড় করিয়া তুলিব ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশী যাত্রায় গানই প্রধান, এই জন্য যাত্রা 'শুনিতে' হয়; থিয়েটরে অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ 'অ্যাক্টিং' প্রধান, এই জন্য থিয়েটর 'দেখিতে' হয়। নট ও অ্যাক্টর মূলতঃ একই অর্থবোধক। নট নৃত্য করিবেন; এই যে নৃত্য করা, ইহার অর্থ কেবল মাত্র dancing নহে; তিনি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন; এই জন্য ইংরাজীতে dancingকে poetry of motion

* গিরীশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিতে পাই—'গিরীশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের হ্যান্ড্‌বিলে এইরূপ লিখিত হইল—A distinguished amateur.'

বলে। তাঁহার মুখে যদি কথা বসাইয়া দেওয়া যায়, সেই কথা তাঁহার ভাব-ব্যঞ্জনার সহায়তা করিবে মাত্র। অ্যাক্টরও প্রধানতঃ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবেন। দেখুন, সঙ্গীতের সুরই প্রধান ; শব্দগুলি মনের ভাব দশজনকে বুঝাইবার জন্য সহায়ক মাত্র। যাত্রার অনেক উৎকর্ষ আমাদের দেশে হইয়াছিল, কিন্তু এমন দাঁড়াইয়া গেল যে, বক্তৃতার মধ্যে যেই শুনা যাইত 'আহা সখি, সে কেমন ? প্রকাশ করিয়া বল'—অমনি ছেলের পল্টন গান ধরিয়া দিত ! ঐ 'প্রকাশ করিয়া বল' শুনিলেই সকলে অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু সমজদার শ্রোতা অস্থির হইতেন না। কারণ গানের ভিতর দিয়াই ত যাত্রা 'প্রকাশ করিয়া' বলিবে ; গান বন্ধ করিয়া দিলে তাহার সমস্তই অব্যক্ত রহিয়া গেল। থিয়েটর কিন্তু গানকে ছোট করিয়া দিল ; অ্যাক্টিংই ড্রামার স্বধর্ম্ম। তাই আমরা কেবল মাত্র একটি গানের ব্যবস্থা করিলাম।

"অনেক বাঙ্গালী ও ইংরাজ ভদ্রলোক আমাদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। ৺উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় আমরা চার টাকার একটি নূতন শ্রেণী খুলিলাম। বলাইচাঁদ মল্লিক আসিতেন। ডাক্তার হণ্টার (পরে স্যার উইলিয়ম হণ্টার) ও মেজর বেয়ারিং (এখন লর্ড ক্রোমার) আসিতেন ত বটেই ; অনেক সময়ে আমাদিগকে সুপরামর্শও দিতেন। শিশিরবাবুর 'নয়শো রুপেয়া' অভিনয় করিতে গিয়া আমরা কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন আমরা স্বাধীনভাবে কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতাম না ; গ্রন্থরচয়িতার সঙ্কেতানুযায়ী কাজ করিতাম, একস্থানে ছিল 'চুম্বন'। আমার মনে একটু খট্কা লাগিল। ডাক্তার হণ্টারকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা পাবলিক্ ষ্টেজে দেখান উচিত কি না ? তিনি বলিলেন—'তোমাদের সমাজে উচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের ষ্টেজে স্ত্রী পুরুষে অভিনয় করে, সেখানে ওটা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরুষ এখানে নারী সাজিয়াছে ; বোধ হয় এস্থলে উহা ভাল হইবে না। তোমরা বাদ দিয়া যাও।' ডাক্তার হণ্টার তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন। আমরাও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলাম।

"নীলদর্পণ অভিনীত হইবার সময় এক রাত্রিতে পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জাইলস্ সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে তিনি দু' চার জনকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। তাহাতে কেহই দমিয়া গেল না ; বরং সকলেরই

স্ফূর্তি বাড়িয়া গেল। তোরাপবেশে মতিলাল আস্ফালন করিয়া বলিল—'ধরে নিয়ে যায় যাবে, আমি এই লুংগি পরেই যাব।' পুলিস সাহেব যখন শুনিলেন যে এই রকম ধারণা দাঁড়াইয়াছে, তিনি হাসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'দীনবন্ধুবাবুর সংগে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল; তাই আমি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছি। আপনারা আর কিছু মনে করিতেছেন কেন?'

"এতদিন পরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় আমার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; ইহাতে আমি যথেষ্ট গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি। নাটোরেব রাজবংশেব সহিত এই নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রাজা চন্দ্রনাথের মত সহৃদয় বন্ধু আমাদেব আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টেব বাঙ্গালী Attache বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে এবং পবে আর কেহ হয়েন নাই। বড় লাট নর্থব্রুক বাহাদুর বারাকপুরে যাইবার সময়ে মাঝে মাঝে তাহাকে নিজের গাড়ীতে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি অম্লানবদনে আমাদের থিয়েটরের গ্রীণরুমে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পোষাক পরাইয়া দিতেন। হয় ত তাড়াতাড়ি নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে হইবে, রাজা চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অভিনেতার পায়ের মোজা খুলিয়া দিতেন। আজ ভক্তিপূর্ণপ্রাণে তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছি।"

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

অমৃতবাবু বলিলেন—"বিশ্বকোষ অভিধানে 'রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম দেখুন রেবতীর ভূমিকা লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মান্না নহে। তিনকড়ি মুখুয্যেকে আমরা 'ঠাকুর্দ্দা' বলিয়া ডাকিতাম, যদিও তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। আবার দেখুন, গিরীশ-বাবুর গানে আছে—'কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে'; এস্থলে বিশ্বকোষের লেখক টীকা করিয়াছেন—অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল, একজন অভিভাবক।' অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিন্ধ্রীবেশী অমৃতলাল বসু। সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণের উল্লেখ করিয়া 'অমৃত বরষে' লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনও কালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটরের ভাবুকও ছিলেন না। এই রকম ছোটখাট অনেক ভুল উক্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক

একস্থলে বলিতেছেন,—নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালি ভাংগাবাড়ীতে প্রত্যহ দুপ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্যে সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট-দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু মড়াকান্না আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে 'ভাংগা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে।'—এই বর্ণনায় কিছু গলদ আছে। ব্যাপারটা এই :—আমি ত সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, 'তোমার পার্টটা কেমন হল দেখি?' তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—'না হয় নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দাঁড় বিনানর সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশী দেরী হইবে না; আসল ব্যাপারটা হইতেছে ঐ কান্না। এটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল, যেন emotion-এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়ো বাড়ীতে দিবপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম; অর্দ্ধেন্দু বা অন্য কেহ আমার দোসর ছিলেন না। কয়েক দিন পরে আমি অর্দ্ধেন্দুকে বলিলাম, 'একবার আমার কান্নার জায়গাটা শোনো দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।' আমার নাট্যজীবনে অর্দ্ধেন্দু আমার প্রথম গুরু বটে; কিন্তু এই কান্নাসাধনায় আমি গুরুকে লুকাইয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখরের আশীর্ব্বাদে সফলপ্রযত্ন হইলাম। তাঁহার নিকটে আমি যে কত ঋণী তাহা স্বীকার করিতে আমি কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। সঙ্কোচ বোধ করাটাই অত্যন্ত লজ্জাকর

বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দাঁড়াইয়া যাইবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি বাস্তবিক যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। আমার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়ীতে গলা সাধেন নাই বলিয়া তাঁহার কৃতিত্বের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইবে না।

"নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের কথা বলিতেছিলাম। কাশীতে অবস্থানকালে আমি তাঁহার মহত্ব ও সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা চন্দ্রনাথ Attache পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমি তখন কাশীতে ছিলাম। লোকনাথবাবু বলিলেন, রাজাকে অভিনন্দন দিতে হইবে। তাঁহার কথায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উজ্জ্বল রত্ন, রাণী ভবানীর কুলতিলক প্রথম বাঙ্গালী Attacheকে কাশীধামে পাইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি উপযুক্তরূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে না পারে তাহা হইলে অত্যন্ত লজ্জার কথা। লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের উদ্যোগে উদারপ্রকৃতি বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ ও কাশী-নরেশ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; ডাক্তার ল্যাজারুস তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। তত্রত্য কলেজের আইনের অধ্যাপক গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচিত হইল ; গিরীন্দ্রবাবু তখন লোকনাথবাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কয়জনে মিলিয়া একটি বাঙ্গালা রচনা খাড়া করিলাম। আয়োজনের ত্রুটি হইল না। আমার কিন্তু মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। রাজা চন্দ্রনাথকে আমি তখনও চোখে দেখি নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে এই প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে নানা দেশ-বিদেশের রাজা-মহারাজ সমবেত হইবেন, আমাদের এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত রাজটীকা লইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন ত? মনে হইল যেন তাঁহার চেহারার উপর সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মান-ইজ্জৎ নির্ভর করিতেছে। আমার যেন ছটফটানি ধরিল। সন্ধ্যা হইল। দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীপালোকে সভাস্থল ঝলমল করিতে লাগিল। রাজা চন্দ্রনাথ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ করিলেন। আমি বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলাম—হাঁ, রাজা বটে, কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবমুকুট বটে। রাণী ভবানীর বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ আজ বিশ্বনাথের চরণতলে দীপ্ত হইয়া জ্বলিতেছে। বেশের অদ্ভুত পারিপাট্য ছিল, কিন্তু

ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য ছিল না। আনন্দে আমার চোখে জল আসিল। অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। তিনি বিনীতভাবে তৎপ্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিলেন। সভাভঙ্গ হইল।

"কলিকাতায় পাবলিক্ ষ্টেজের প্রথম অবস্থায় তাঁহার আনুকূল্যে ও সৌজন্যে আমরা কৃতার্থ হইয়া গেলাম। তিনি যে কখনও আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এমন কথা আমি বলিতেছি না। বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থ ভিক্ষা করি নাই। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন; যদি ভাল লাগে, দুটি ভাল কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না, সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন;—ইহার অধিক আমরা কিছু আশা করিতাম না। এইখানে আপনাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে; যেন পাঠক পাঠিকার ভুল ধারণা না হয় যে আমরা অভিজাতবর্গের অন্ততঃ moral patronage-এর ভিখারী ছিলাম। ন্যাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজ বাস্তবিকই democratic ছিল; দেশের আপামর সাধারণের আনন্দের সামগ্রী হইবে, ইহাই তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার বিষয় ছিল। আমাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া পুণ্যশ্লোক শিশিরবাবুর মত বোধ হয় মহাত্মা উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও গুণগ্রাহী রাজা চন্দ্রনাথ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভীম সিংহের ভূমিকায় গিরীশবাবুর রিহার্স্যাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে গিরীশবাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন। আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি অবলীলাক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। রাজা চন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা'য় যযাতি সাজিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

"মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা'র উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কথা মনে পড়িল। সে সম্বন্ধে আমার দু একটি কথা বলিবার আছে। দেখুন, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। য়ুরোপীয় ধরণে উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে পারে, তাহা মাইকেল বাঙ্গালীকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গালী নাটককারগণ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নিকটে আমাদের

নাট্যসাহিত্য যে প্রভূত পরিমাণে ঋণী ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। 'নীলদর্পণ' বাঙ্গালী সমাজের সমসাময়িক চিত্র লইয়া বাঙ্গালীকে করুণরসাত্মক নাটকের আদর্শ দেখাইয়া দিল; মাইকেল বিলাতী classic ধরণের ট্র্যাজেডির আদর্শ 'কৃষ্ণকুমারী'তে দেখাইলেন। প্রহসন রচনার পন্থাও মাইকেল দেখাইয়া দেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ বোধ হয় অনেকে তাহা জানেন না। গিরীশবাবুর পদ্যের ছন্দ গিরীশবাবুর নিজের আবিষ্কৃত নহে। ঐ ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা আর কেহ নহেন—স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরীশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণবধ'-এর title page-এ হুতোম প্যাঁচায় ঐ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া দিয়াছিলেন; ছন্দ হিসাবে তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। এ সকল কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

"কিন্তু মজা এই যে, গতিক দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে বড়ই unlucky; কেহ বোধ হয় উহা লইয়া সামলাইতে পারে নাই। দেখুন পাইকপাড়ায় উহা অভিনীত হয় নাই।[২৪] হইবার উদ্যোগ করিতেই রঙ্গমঞ্চের মজলিসি দল ভাঙ্গিয়া যায়। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে ভাঙ্গা দল লইয়া অভিনয় হইয়াছিল।[২৫] অভিনয় হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ভাঙ্গিয়া গেল।[২৬] মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, কি কারণে জানি না, উক্ত নাট্যসভার সহিত নিজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। আরও অনেকে চলিয়া গেলেন। এক রকম করিয়া অভিনয় করা হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের দল ভাঙ্গিয়া গেল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছুদিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।[২৭] 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উপরে নারদের একটু অনুকম্পা আছে। কিসে গোলমাল বাধিল ঠিক এখন বলিতে পারিব না; টাকাকড়ির খরচপত্র লইয়া মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গেল। ভীম সিংহের ভূমিকায় গিরীশবাবু নিজেকে a distinguished amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন আমরা সকলেই amateur, তবে গিরীশবাবু অবশ্যই 'distinguished' ছিলেন। কেহই মাহিনা লইতেন না। আমরা পেশাদার-ই ছিলাম না। ভাল থিয়েটর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্য টাকা আবশ্যক, আমাদের সকলেরই ঝোঁক ছিল যে ষ্টেজের উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ-

সঞ্চয় করিতে হইবে। এই কারণে থিয়েটারের জন্য যখন আমরা প্ল্যাকার্ড ছাপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্ল্যাকার্ডের শিরোদেশে লেখা থাকিত—'For the benefit of the stage'—ষ্টেজের উন্নতির জন্য। এই কয়টি কথা আমিই মৎলব করিয়া প্রথম প্ল্যাকার্ডের উপর বসাইয়া দিয়াছিলাম। গিরীশবাবুর কাছে একজন ন্যাশনাল থিয়েটরকে পেশাদারী থিয়েটর বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,—'ভুনেটা* বাঁচিয়ে দিয়েছে রে,—পেশাদারী নয়!' দেখুন, গিরীশবাবুর সঙ্গে আমাদের একটা তখনকার মনোমালিন্যের কথায় পরমহংসদেবের কথা মনে পড়িয়া গেল! একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কেশববাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামাজিক নানা প্রশ্ন লইয়া তখন সভাসমিতিতে ও পত্রিকার স্তম্ভে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। ঠাকুর জানিতেন উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'দেখ, তোমাদের দুজনকার ঝগড়া যেন রাম-শিবের লড়াই। রাম শিবের গায়ে বাণ মারছেন, শিবও রামের গায়ে বাণ মারছেন, আবার তখনই রাম শিবকে স্তব করছেন, আর শিব রামকে স্তব করছেন, কেন না রামের গুরু শিব, আর শিবের গুরু রাম। দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবার বাধা কিছু নাই, কিন্তু যত গোল বাধিয়ে দেয় রামের বাঁদরগুলো আর শিবের ভুতপ্রেতগুলো। তোমাদেরও ঝগড়া সহজেই মিটমাট হয়ে যায়, কিন্তু যত গোল করছে ঐ বাঁদর আর ভুতপ্রেতগুলো।'...গিরীশবাবুর সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটরের প্রণয়ভঙ্গের জন্য ভুতপ্রেত বানর যে কতকটা দায়ী ছিল না এমন কথা বলা যায় না। সে যাহা হউক, টাকার কথা বলিতেছিলাম। আমরা কেহই বেতনভোগী ছিলাম না। অর্দ্ধেন্দুর কিছু টানাটানি ছিল; তাঁহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। নীলদর্পণের তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্দ্ধেন্দুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম; কোনও রকম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকে[২৮] দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্দ্ধেন্দুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পিতা ৺শ্যামাচরণ মুস্তফি মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশটি টাকা দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গোল মিটিয়া গেল। ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটরের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পান নাই। তাঁহারা পাথুরিয়াঘাটার

---

* আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ভুনি বোস বলিয়া পরিচিত। —লেখক।

ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাবর মাসে মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং থিয়েটারের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। যদি আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইত। সে যাহা হউক, টিকিট-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে আমাদের খরচ চলিয়া গেলেই হইল ; সে টাকা যে আবার বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে এমন কল্পনা আমাদের কাহারও ছিল না। তাই বলিতেছিলাম, কেন যে আমাদের মধ্যে গোলযোগ বাধিয়া থিয়েটর বন্ধ হইয়া গেল, তাহা ঠিক আপনাকে বলিতে পারিব না ; কেন না, যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটরে আমাদের অভিভাবকস্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। থিয়েটরের শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পূর্ব্বে "জ্যাঠা" বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে ফুট্‌লাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলো না আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত,
হেরিয়ে অধিনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায়॥
অস্তগামী দিনমণি
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি ;
হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়॥

নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায় ॥

"গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্রক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুণ গুণ করিতে থাকে তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী অস্ফুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—'কেন তোমরা বন্ধ করবে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদেব ভুলব কেন? যেখানে অভিনয় করবে আমরা আসব বৈকি!' বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা চাঁদাব খাতা খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতাম, তাহা হইলে একটা নাট্যালয় নির্ম্মাণের খরচ তখনই সহি করাইযা লইতে পারিতাম।

"১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মধুযামিনীর সেই করুণ বিদায়গীতি আজিও থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। আমার সেই উদ্দাম যৌবনের বসন্তোৎসবে সেই 'আধ পুলকিত আধ হুতাশে শুকায়' হৃদয় আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তা'র পরে কত বসন্ত আসিল ও গেল; কত হাসি-কান্নার ভিতর দিয়া আমার জীবন-নাট্য লীলায়িত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই রাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্মৃত হই নাই। তখন যৌবন ছিল, মনে সাহস ছিল, 'পুনঃ যেন দেখা হয়' বলিয়া মিনতি করিতে পারিয়াছিলাম; কায়মনোবাক্যে সাধনা করিয়াছিলাম; সিদ্ধিলাভও হইয়াছিল। সেই সাধনা ও সিদ্ধির কথা পরে বলিতেছি।"

২১এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

অমৃতবাবু বলিলেন,—"ন্যাশনাল থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সূত্রপাত পূর্ব্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টেজের মালপত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক বলা হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, ন্যাশনাল থিয়েটরের ষ্টেজ গিরীশবাবুর বাড়ীতে রাখা হইবে।

"অল্প দিনের মধ্যেই সেই ষ্টেজ টাউন হলে বাঁধা হইল। আমাদের সহিত এই নূতন থিয়েটরের কোনও সম্পর্ক রহিল না। তাঁহারা 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিলেন। দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যার্থে এই অভিনয় হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল।

"এই কথাটা একটু ভাল করিয়া বলা আবশ্যক। আমি আমার স্মৃতিকথা বলিয়া যাইতেছি ; ঠিক যে থিয়েটরের ইতিহাস দিতে বসিয়াছি, তাহা নহে। তবে আমার স্মৃতিকথার অনেকটাই আমার নাট্য-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই নাট্য-সাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের বিবরণ হয় ত কিছু বেশী হইয়া পড়িতেছে। আবার নিজের স্মৃতিকথা বলিতে বসিলে হয়ত **First person singular**-এর উপর কিছু বেশী জোর পড়িয়া যায় ; সেই যে ছেলেবেলায় I by itself I কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, আজও তাহার হাত এড়াইতে পারি নাই। তাই মাঝে মাঝে বোধ হয় একটু চেষ্টা করিয়া সেই কেন্দ্রস্থ 'I' এর অন্য বিষয় দেখিবার অবসর করিয়া লইতে হয়।

"এই যে টাউন হলের থিয়েটরের দল, ইহা ত আমাদের সেই ন্যাশনাল থিয়েটরের ভাঙ্গাদল ; আমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরই গিরীশবাবু এই ভগ্নাংশটিকে ন্যাশনাল থিয়েটর নামে রেজিষ্টারি করিয়া লইলেন।

"এই সঙ্গে আমাদের আর একটি দেশীয় অনুষ্ঠানের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। ডাক্তার ম্যাকনামারা নামে তখন কলিকাতায় চক্ষুরোগের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গিরীশচন্দ্র দাস ও অন্যান্য কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ধরিয়া বলিলেন,—যেমন করিয়া হউক একটা দেশীয় হাসপাতালের জন্য কিছু টাকা তুলিয়া দেওয়া চাই। বৃন্দাবন পালের পুত্র রাজেন্দ্র পাল সে সময়ে সখের থিয়েটরের একজন চাঁই ছিলেন। তাঁহারই বাড়ীতে পূর্বে 'লীলাবতী' অভিনীত হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেবের অনুরোধে গিরীশ দাস, রাজেন্দ্র পাল ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক টাউন হলে এই থিয়েটরের ব্যবস্থা করিলেন।

" 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। আমি দুই টাকা দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, গিরীশবাবু নবীনমাধব সাজিয়াছিলেন, মতিবাবু তোরাপ, গোবি (ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর) সৈরিন্ধ্রী, মাধু (শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর) সাজিয়াছিলেন কিনা তাহা আমার এখন মনে পড়িতেছে না।

"এইখানে মাধুর কথা কিছু বলিয়া রাখি। আমরা যখন সান্যালদের

বাড়ীতে অভিনয় করি তখন মাধু আমাদের দলে ছিলেন না, বিদেশে পোষ্ট-মাষ্টারি করিতেন। পোষ্ট আফিসে চাকরি লইবার পূর্ব্বে সখেরদলের অভিনেতৃগণের মধ্যে মাধু প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন; আমার যখন নাট্য-জীবনের আরম্ভ হয় নাই, তখন 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্য ভূমিকায় মাধুর খ্যাতি আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। তাঁহার অভিনয় দেখিবার বাসনা আমার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইল না। 'লীলাবতীতে' তিনি ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সুদূর কাশীতে বসিয়া আমি তাঁহার কৃতিত্বের কথা শুনিলাম; তাঁহার অভিনয়-দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না! সান্যালদের বাড়ীতে আমি যখন সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় তালিম দিতাম, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিতেন—'আহা, যদি মাধু এখানে থাকত, কি চমৎকার সৈরিন্ধ্রী হ'ত!' গিরীশবাবু আমাকে একদিন বলিলেন,— বাস্তবিক যে নিজে কাঁদিতে জানে না, সে পরকে কাঁদাতে জানে না; মাধুর কান্না অন্তরের ভেতর থেকে ফেটে বেরোয়; মাধু কাঁদতে জানে।'

"সে যাহা হউক সে রাত্রির টিকিট-বিক্রয়লব্ধ অর্থ ডাক্তার ম্যাকনামারার হস্তে অর্পিত হইল। এমনি করিয়া মেয়ো হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপনে বাঙ্গালীর থিয়েটর অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হইল।

"আর একটি কথা আপনি নোট করিয়া লইতে পারেন। যে গোবি একদিন মেয়ো হাসপাতালের উদ্দেশ্যে টাকা তুলিবার জন্য সৈরিন্ধ্রীবেশে টাউন হলে অভিনয় করিয়াছিল সে এখন এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল ও কলিকাতার উত্তরাংশে আর একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী-বেশে গোবিকে আমি ঈর্ষাকষায়িত লোচনে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই।

"আমাদের ষ্টেজ ও সীন ছিল না। ভাঙ্গা দল যখন টাউন হলে গেলেন, আমরা পরামর্শ করিলাম "অপেরা হাউস' ভাড়া লইয়া প্লে করিতে হইবে। টাউন হলে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের কিছু পরেই আমরা লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয় করিলাম। দুই রাত্রি অভিনয় হইল। অনেকগুলি প্রহসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"এই প্রহসন-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। আজ শুধু দুটি একটি কথা আপনাকে বলিতে পারি। ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে সব্-ডেপুটী তৈয়ার করিবার জন্য স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany-chemistry, আইন, জরীপকরা, সন্তরণ, জিমন্যাষ্টিক প্রভৃতি নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে সব্-ডেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গভর্মেণ্টের সার্কুলার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার cartoon বাহির হইল; কয়েকজন জিমন্যাষ্টিকের পোষাকপরা বাঙ্গালী যুবক সার গাঁথিয়া দণ্ডায়মান,—তাহাদের কানে চিমটে, কোমরে শিকল। সব্-ডেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্ত্তমান। আমাদের থিয়েটারের জন্য প্রহসনের সুন্দর মাল মসলা পাওয়া গেল। বেশ মজাদার ফার্স রচিত হইয়া গেল।[২৯] ছেলেবেলা হইতেই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা লইয়া আমরা কত হাসি ঠাট্টাই যে করিতাম তাহা বলা যায় না; সাহেবের গলার স্বর, কথা কহিবার ভঙ্গি আমরা সুন্দররূপে অনুকরণ করিয়াছিলাম। তখন অনেক ডিস্পেন্সারিতে মদ্য বিক্রয় হইত; এ সমস্তই আমাদের প্রহসন-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গেল।

"এই প্রহসন-সাহিত্য অনেকটা আমাদের মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু, গোবি, গোপাল দাস, মতি, নগেন, বেলবাবু ও আমি, সকলে মিলিয়া মুখে মুখে একখানা impromptu farce শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রচনা করিয়া ফেলিতাম।

"আমাদের সেই যৌবনের প্রহসন-সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে বসিয়া আজ অর্দ্ধেন্দুর কথা বড় বেশী মনে পড়িতেছে। 'নবনাটকে' অর্দ্ধেন্দুর কর্ত্তা ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মনে পড়ে; বহুরূপী অর্দ্ধেন্দুশেখর এই কর্ত্তা সাজিয়া যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে; আমার দৃঢ় ধারণা, এইটিই অর্দ্ধেন্দুর masterpiece। পূর্ব্বে অক্ষয় মজুমদার এই ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়াছিলেন[৩০] বটে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু যেন 'কর্ত্তা'কে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। অর্দ্ধেন্দুর মুখে শুনিয়াছি যে অক্ষয়বাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিবার সাধ হয়। অক্ষয় মজুমদার তাঁহার আদর্শ ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা' নাটকে গুলিখোর জামাই নটবরের ভূমিকায়

অর্দ্ধেন্দুকে মনে পড়ে। শিশিরবাবুর 'নয়শো রুপেয়া'য় ছাতুলাল বেশে অর্দ্ধেন্দুর নিলাম-ডাকা মনে পড়ে। অনেক কথা মনে পড়ে; একদিন ভাল করিয়া অর্দ্ধেন্দুর acting সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিব; আজ নয়। আজ শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে আমরা 'বিলাতী বাবু', 'মডেল স্কুল' ও 'উপাধি বিতরণ' প্লে করিয়াছিলাম; অখিলবাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়াও সে রঙ্গমঞ্চে দেখান হইয়াছিল।

"সেখানকার নাট্যলীলা আমাদের অল্প দিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল; আমরা কালী সিংহের একটি হল্ ভাড়া লইয়া ষ্টেজের প্লাটফরম বাঁধিতে লাগিলাম।

"এমন সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্দ্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলি, বেলবাবু, বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিংহ নামে একটি সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকার মোহিনীমোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

"তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে ছাড়িত; যেখানে সন্ধ্যা হইত, সেইখানেই জাহাজ নোঙ্গর করা হইত, জাহাজে আহারাদির অসুবিধা হইয়াছিল বটে; কিন্তু ঢাকায় যে রাঁধুনি-বামুন পাওয়া যাইবে না, তাহা আমরা পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই। শেষে দলের মধ্যে যাঁহারা বেচারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের উপর রন্ধনশালার ভার অর্পিত হইল। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক কালীবাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন; ইনি পরে ঈডেন হিন্দু হোষ্টেলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন।

"ঢাকার আতিথ্য-সংকার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। মোহিনীবাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। সেই বাগানবাড়ীটি ঠিক বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত। বুড়ীগঙ্গা তখন কূলে কূলে প্রবাহিত। বড় বড় ষ্টীমার ঢাকা সহরের কিনারায় গিয়া লাগিত। রবিবার দিনে প্রাতে কলিকাতা হইতে ষ্টীমার ছাড়িলে পরদিন বৈকালে উহা ঢাকায় গিয়া পৌঁছিত।

"ঢাকা সহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমরা

সেই ষ্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম ; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী-বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল ; সহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাম্পীন, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন, একবাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।[১১]

"ঢাকায় অবস্থান-কালে সেখানকার বড় বড় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত তত্রত্য স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের যে প্রীতির সম্পর্ক দেখিয়াছিলাম তাহা শুনিলে আপনি অবাক হইয়া যাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবকে বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া গল্প করিতে দেখিয়াছি।

"প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করিলাম। অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত সহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটরের অন্য কোন অভিনেতাকে এমন করিয়া আর কেহ lionise করিয়াছে কিনা জানি না।

"বেঙ্গল টাইমস্ পত্রিকায় আমাদের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাহির হইল। আমি একটি ছোট-খাটো ফার্স রচনা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর মুদ্রিত বেঙ্গল টাইমস্ কাগজে পেণ্টুলান, কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তদ্দবারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া কেম্প সাহেবকে বিদ্রূপ করিলাম। মজা এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট বাম্পীন ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের হাস্যতরঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

"আমরা 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটর' নাম লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলাম। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনীবাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবু) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসর লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্নিকটে লক্ষ্মীবাড়ীতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবনবাবুর বাড়ীতে থিয়েটর করিলেন।

"এইখানে আপনাকে একটা বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। আপনার মুখে শুনিতেছিলাম যে, এই দলটিকে 'বিশ্বকোষে'র লেখক 'ধর্ম্মদাস-

বাবুর দল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ন্যাশনাল থিয়েটরের কোনও ব্যক্তি যে যাত্রার দলের অধিকারীর মত একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছিলেন, তাহা নহে। যে-দলে মহেন্দ্র বসু, গোপাল দাস, মতিলাল সুর, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়িবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন, সে দলকে ধর্ম্মদাসবাবুর দল বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে কেন? বরঞ্চ তাহাকে রাজেন্দ্র পালের দল বলিলে সুশোভন হইত।

"প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অনেকেই এক একজন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কেহ কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদিগকে লইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। উভয় দলের যে ঠিক মিলন হইল, এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পরে দিঘাপাতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজা প্রমদানাথ রায়) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন, আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েক-জন গেলেন না।

"এদিকে ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৺শরৎচন্দ্র ঘোষ) ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটি নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটর নাম দিয়া একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।' মাইকেল ও শরৎ-বাবুর ভগ্নীপতি **Mr. O. C. Dutt** (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস ('হরি বৈষ্ণব' নামে ইনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়ু গিরীশ), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটুবাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টর ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়া), প্রিয়নাথ বসু (ছাতুবাবুর ভাগিনেয়), অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারি জন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।

"১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' লইয়া বেঙ্গল থিয়েটর অভিনয় আরম্ভ করে।[৩১] এবারে এ ষ্টেজেও মাইকেলের নাটক জমিল না। তাঁহার রচিত 'মায়াকানন' লইয়া যে তাঁহারা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

"এমন সময় মোহান্ত এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হইল ; পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই লোকের মুখে ঐ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। বেঙ্গল থিয়েটর সময় বুঝিয়া 'উঃ মোহান্তের এই কি কাজ !' নামে একখানা নাটক ষ্টেজে খাড়া করিলেন। সমস্ত দেশের লোক যেন সেদিন বেঙ্গল থিয়েটরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। থিয়েটরের কপাল ফিরিয়া গেল।[৩৩]

"তাহার পর প্রতি শনিবার রাত্রে 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনীত হইতে লাগিল। ধর্ম্মদাসবাবু, নগেনবাবু, ভুবন নিয়োগী ও আমি একদিন বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটরের দ্বারদেশে গিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া টিকিট কিনিতে পারিলাম না।[৩৪]

"অর্দ্ধেন্দু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, নানা দেশবিদেশে মিশনরির মত ঘুরিতেছিলেন। একথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে চাই যে, থিয়েটরের যদি কেহ কখনও মিশনরি হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ভিন্ন আর কাহারও নাম করা যায় না। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন ষ্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম, অর্দ্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

"ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করিয়া আসিলাম। এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী : নগেন নবীন সাজিলেন ; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।

"এদিকে মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া আমরা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর নাম দিয়া লিউইস্ থিয়েটরের অনুকরণে একখানি কাঠের বাড়ী তৈরী করিলাম। দেখুন, আমরা তখন ছন্নছাড়া হইয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। লিউইস্ থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষেরা পুরাতন সুলতানার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া অন্যত্র নূতন থিয়েটর স্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মদাস, নগেন ও আমি সুলতানার বাড়ীর মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্ম্মদাস ঐ মডেলের অনুকরণে নূতন থিয়েটরের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কখনও কোথাও engineering শেখে নাই। আমি দিবারাত তাহার সঙ্গে থাকিতাম। আমরা 'পিট্'-এর টিকিট কিনিয়া লিউইস্ থিয়েটরের অভিনয় দেখিতে গেলাম। অতদূরে বসিয়াও ধর্ম্মদাস curtain-এ কয় পর্দ্দা কাপড় লাগে তাহা ঠিক করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে বাজারে কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড়ের

বহর দেখিয়া সমস্ত নিজে জোগাড় করিয়া লইল। এই জন্যই আমি বলি যে, ধর্ম্মদাস বাঙ্গালীকে ষ্টেজ নির্ম্মাণ করিতে শিখাইয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু ও গিরীশবাবু বাঙ্গালীকে অভিনয় করিতে শিখাইয়াছেন। এই ষ্টেজ নির্ম্মাণ করাইতে ভুবন নিয়োগীর ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

"সে যাহা হউক, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটর রহিয়াছে, ঐখানে আমাদের নূতন থিয়েটরের ষ্টেজ নির্ম্মিত হইল; কিন্তু কি নাটক অভিনীত হইবে তাহা স্থির হইল না। বেঙ্গলে তখন 'মায়াকানন' লইয়া নাড়াচাড়া করা হইতেছে; জমাট বাঁধিতেছে না। বাজারে এমন নূতন কোনও বই নাই যাহা ষ্টেজের উপর চলনসই হইতে পারে। মহা বিভ্রাটে পড়া গেল। নগেন আমাকে বলিলেন —'তুমি না হয় একটা লিখে ফেল; ঐ মায়াকানন ভেঙ্গে-টেঙ্গে একটা যা হয় কিছু তৈয়ার করে দাও।' আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy taleই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর আমাদের গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটর খোলা হইল। মিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) আমাদিগকে বলিলেন, –'তোমাদের এই নূতন থিয়েটরের দেয়ালের গায়ে লিখে দিচ্ছি যে, স্ত্রীলোক-অভিনেত্রী বাদ দিয়ে তোমাদের এ থিয়েটর ১৭।১৮ দিনের বেশী চলবে না।' তিনি যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল।[৩৭] কিন্তু এই নূতন ষ্টেজে আমরা নিছক পুরুষ মানুষ লইয়া পূর্ব্বের মত অবতীর্ণ হইলাম।

"সে রাত্রে আমাদের থিয়েটর-ভবন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি সেদিন 'কাম্যকাননে'র নায়করূপে অবতরণ করিয়াছি। ষ্টেজের উপরে ভীমা কালী-মূর্ত্তি! নৃমুণ্ডমালিনীর সর্ব্বাঙ্গে লাল আলোক-রশ্মি ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সম্মুখে চিনির নৈবেদ্য জ্বলিয়া উঠিল। আমি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতেছিলাম—'মা কি অগ্নিমূর্ত্তিতে আমার পূজা গ্রহণ করিলেন?'···অমনি চারিদিক হইতে আগুন! আগুন! ধ্বনি উত্থিত হইল; দুপ্ দাপ্ করিয়া দর্শকগণ লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। Auditoriumএর দিকে চাহিয়া দেখি আমাদের কাঠের বাড়ীর সম্মুখের দেয়াল দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ষ্টেজের উপরে আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। মাথা ঘুরিয়া গেল। সহসা দেখিলাম,—দুইহাতে সেই

চঞ্চল লোকের ভিড় ঠেলিয়া ব্যায়ামবীর অখিল সেই অনলশিখার সম্মুখীন হইয়া ঘুসি ও লাথি মারিয়া মড়্ মড়্ করিয়া তক্তা ভাঙিগতেছে। আমার চমক ভাঙিগয়া গেল। যে য়ুরোপীয় কনস্টেবল দর্শকবৃন্দের রক্ষার জন্য সে রাত্রিতে তথায় উপস্থিত ছিল, অন্বেষণ করিয়া তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। জনকতক বাঙগালী যুবক অখিলকে সাহায্য করিল। কাঠের বাড়ীর এক অংশ ভাঙিগয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইল।

"বাহিরে দর্শকবৃন্দ একত্র হইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে কেহ-কেহ বলিলেন, আমাদের শত্রুরা এই কাজ করিয়াছে। বাহিরের লোকেরা 'টিকিটের পয়সা ফিরিয়ে দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মনোমোহন বসু মহাশয় তাহাদিগকে ভাল কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার কথা তাহারা উড়াইয়া দিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে একটা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন মিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন—'তুমি যা হয় একটা কিছু বল; ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা কর।' আমার তখন সেই heroর বেশ পরা ছিল। ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে জোড় হস্তে দাঁড়াইলাম। তাঁহারা চুপ করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমার একটি নিবেদন আছে; অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন কি?' তাঁহারা বলিলেন,—'শুনিব।' আমি স্টেজের উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম। বিনীতভাবে বলিলাম—'আপনারা আমাকে দুটা কথা বলিবার অনুমতি দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আজ আমাদের বড় সাধে আগুন লাগিয়াছে; আমাদের দুঃখের গভীরতা আপনারা হৃদয়ঙগম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র সাধ্য-সাধনা করিয়া আমরা এই স্টেজ গড়িয়া-তুলিয়াছিলাম, কত আনন্দে ও উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া কেহ এ কাণ্ড ঘটায় নাই। বেশ দেখা যাইতেছে যে দেয়ালের গায়ে গ্যাস-বাক্সে চিমনি বসান হয় নাই; তাই উত্তাপের আধিক্য বশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আপনারা জানিবেন, এমন শত্রুতা মানুষে করিতে পারে না। (চারিদিক হইতে 'না, না' শব্দ ধ্বনিত হইল)। এখন টিকিটবিক্রয়লব্ধ পয়সা কেমন করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায়? আপনারা সকলেই নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ

করিয়াছেন, অতএব আপনাদের নিকটে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একদিন আপনারা বিনা পয়সায় আমাদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।'[৩৬]...তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল,—'কাম্যকানন' আর কখনও অভিনয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সে কাজ ভালই হইয়াছে।

"পরদিন,—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে—বেলভেডিয়ারে Fancy fair উপলক্ষে আমরা অভিনয় করিলাম।"

প্রসঙ্গকথা

১. যে ঘটনাকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণদাস পালের এই মন্তব্য, সে ঘটনাটি এই : বরোদারাজ মলহর রাও গাইকোয়াড়কে *জব্দ* করবার জন্যে তাঁর রাজ্যের রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ার 'বহুদিনাবধি চেষ্টা' করছিলেন (বামাবোধিনী পত্রিকা : পৌষ, ১২৮১)। মলহর রাও কর্নেল ফেয়ারের আচরণের বিষয় গভর্নমেন্টের কর্ণগোচর করলে তাঁর বিরুদ্ধে রেসিডেন্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণের জন্য লর্ড নর্থব্রুক 'লম্বা চোড়া কমিশন' (সাধারণী, ১৩ই বৈশাখ, ১২৮২) বসালেন। কমিশনের কাজ চলেছিল ২৭. ২. ১৮৭৫ থেকে ১৮.৩.১৮৭৫ পর্যন্ত। কমিশন বসার ঠিক আগের দিন হিন্দু পেট্রিয়ট রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মন্তব্য করে : **'The people have the highest confidence in the Viceroy, and it is of the utmost importance that; that confidence should be maintained intact. Far better that a few lakhs should be wasted than that the good name of our Government should be in any way tarnished. (22.2.1875)** সাক্ষীদের জেরা করে যদিও একরকম প্রমাণিত হয়েছিল যে, বিষপ্রয়োগের অভিযোগ কর্নেল ফেয়ার ও বম্বের পুলিশ কমিশনার সুটারের ষড়যন্ত্রের ফল, তবু শেষপর্যন্ত গাইকোয়াড় রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত হন। সমসাময়িক এই ঘটনাই অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ" নাটকের (প্রথম অভিনয় ২৫.১২.১৮৭৫) উপজীব্য। হিন্দু পেট্রিয়টের রাজভক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে নাটকে কর্নেল ফেয়ার বলেছে, "নেটিভ পেপারের মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কতকটা ভাল,—যথার্থ লয়েল" (৪র্থ অ. ১ম গ.)।

২. 'ষ্টেজে' বলতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের স্টেজে। বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে নির্মিত এই থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৩-এর ৩১এ ডিসেম্বর। এখানে অভিনীত অমৃতলালের প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণে"র ৪র্থ অঙ্ক, ২য়

গর্ভাঙ্কে মদন ও আয়ান নামে দুজন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি হিন্দু পেট্রিয়ট-সম্পাদককে যে-বিদ্রূপ করেছিল, অমৃতলালের স্মৃতিকথায় তারই ইঙ্গিত।

৩. শেক্সপীয়র-পাঠ ও আবৃত্তি আমৃত্যু অব্যাহত রেখেছিলেন অমৃতলাল। যখন তিনি স্টার থিয়েটারের অতিব্যস্ত নট নাট্যকার ও অধ্যক্ষ তখনও অবসর সময়ে থিয়েটারে তিনি তাঁর নিজের ঘরটিতে বসে শেক্সপীয়র-পাঠ ও চর্চায় অভিনিবিষ্ট থাকতেন। তাঁর সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হেনরি উইলিয়ম বার্ন মোরেনো একটি পত্রে (৩১.৩.১৯২৯) এ কথা স্মরণ করে তাঁকে লিখেছিলেন: **"My dear and valued friend of many days,...I remember when you and I sometimes spent an evening or so over Shakespeare in the side room of the Star Theatre..."**

৪. ১৮৬৮ নয়, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলাল এনট্রান্স পাশ করেন। 'পুরাতন পঞ্জিকা' ও **Oriental Seminary Centenary Volume**-এও অমৃতলাল পাশের বছর ১৮৬৮ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ক্যালকাটা গেজেটে (৫.১.১৮৭০) দেখা যায় তিনি জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশন্‌ থেকে ১৮৬৯-এই এনট্রান্স পাশ করেন।

৫. অমৃতলালের শৈশবের এই 'ডাক্তারির ভান' ও ক্রিয়াকলাপ অনেক দিন পরে তাঁর একটি ছোটগল্পের নায়ক পতিত ডাক্তারের মধ্যে ক্রিয়াশীল দেখা যায়—'পতিত ছেলেবেলায় ডাক্তারী ডাক্তারী খেলা করিত...।...একবার সে একটা পাকা বেল কাটাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল; বেল পচিয়া তাহাতে যে পোকা ধরিল, তাহাই তাহার খেলাঘরের জোঁক হইল।' ('পতিত ডাক্তার'—কৌতুক-যৌতুক, পৃ ১৯-২০)।

৬. অনেক স্মৃতিবিজড়িত এই দীর্ঘ কবিতাটি 'অমৃত-মদিরা' কাব্যগ্রন্থে (পৃ ৭৯-৮৪) রয়েছে। কবিতাটির নাম 'লোকনাথ মৈত্র'।

৭. কবিতাটি দীর্ঘ। নাম 'নবীনচন্দ্র সেন' ('অমৃত-মদিরা' পৃ ৭০-৭৫)। কবিতাটিতে অমৃতলাল নবীনচন্দ্রের স্বভাবের আভাস দিয়েছেন, তাঁর কাব্যসম্পর্কে উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে নিজের নাট্যরচনার পটভূমিতে যে পারিবারিক দুঃখের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৮. বাগবাজারের রসিক নিয়োগীর পৌত্র ভুবনমোহন নিয়োগী ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠাকালে রঙ্গালয়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন। গঙ্গাতীরে তাঁর বাসভবনের দোতলার হলঘরে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে'র রিহার্সাল হ'ত। অল্পদিনের মধ্যেই ন্যাশনাল দল দুভাগে ভাগ হয়ে যান এবং নিজেদের রঙ্গগৃহ

না থাকায় দু দলই এখানে-ওখানে অভিনয় করতে থাকেন। সদ্যনির্মিত বেঙ্গল থিয়েটারে তখন জমজমাট অভিনয় চলছে। ভুবনমোহন ন্যাশনাল দলকে অভিনয়ের সুযোগ করে দেবার জন্যই যেন স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণে উৎসাহিত হলেন এবং অকাতরে অর্থব্যয় করে গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার নির্মাণ করে দিলেন। ১৮৭৬-এর ডিসেম্বরে যখন **Dramatic Performances Control Bill** 'আইনে বিধিবন্ধ' হয়, তখন অমৃতলালের মতো অনেক অভিনেতাই মঞ্চের সংস্রব ত্যাগ করেন। গ্রেট্ ন্যাশনালও উপযুক্ত অভিনেতার অভাবে পাল-ছেঁড়া নৌকোয় পরিণত হয়। রঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এ সময়ে বাধ্য হয়েই ভুবনমোহনকে অভিনয় করতে হয়েছে। ৩রা মার্চ, ১৮৭৭ 'সরোজিনী' নাটকে বিজয় সিংহের ভূমিকায় তাঁর অপটু অভিনয় সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ খুবই অকরুণ মন্তব্য করেছিলেন। পরহিতব্রতী ধনাঢ্য ভুবনমোহনের শেষজীবন অতিশয় অর্থকষ্টে অতিবাহিত হয়। অমৃতলাল তাঁর 'ভুবনমোহন নিয়োগী' নামক প্রবন্ধে ভুবনমোহনের উপযুক্ত স্মৃতিতর্পণ করেছেন।

৯. অমৃতলালের শৈশবকালে কলকাতার নাট্যসমাজে কালিদাস সান্ন্যাল প্রসিদ্ধ ছিলেন স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে (সেপ্টেম্বর ১৮৫৯) তিনি দেবযানীর সখী পূর্ণিকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'নাচিয়ে' বলে সত্যিই তাঁর খ্যাতি ছিল। 'শর্মিষ্ঠা'র আগে এই নাট্যশালায় অভিনীত 'রত্নাবলী' নাটকে তিনি নটী হয়ে নেচেছিলেন (১৮৫৮)। 'শর্মিষ্ঠা'র রিহার্সাল যখন চলছিল, তখন নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ গৌরদাস বসাককে ২৪.৩.১৮৫৯ তারিখে একটি চিঠিতে 'শর্মিষ্ঠা'র ভূমিকা-লিপি জানিয়েছিলেন। কালিদাস সান্ন্যাল সম্পর্কে লেখেন, '*Purnika*···**Kally Dass Sandel (formerly our dancing-girl)**'। স্ত্রী-ভূমিকায় পারদর্শী ছিলেন বলেই কালিদাস সান্ন্যালের কাছে অমৃতলাল প্রথম যান সৈরিন্ধ্রীর 'মড়াকান্না' শিখতে।

১০. 'নল-দময়ন্তী নাটকে'র প্রকাশকাল ১৮৬৮। এর অনেকদিন আগে থেকেই নাটকটি অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৬৪তে বাগবাজার মদনমোহনতলায় এটি অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়।

১১. ১৮৭৩-এ এঁর 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' প্রকাশিত হয়। পৌরাণিক নাটকে ইনি যে-ভক্তিরসের সঞ্চার করেন, ড. সুকুমার সেনের মতে, সে পথ অনুসরণ করেছিলেন মনোমোহন বসু (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম সং, পৃ ৬৪)। অমৃতলালের প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' এঁর বাড়িতেই রচিত হয়—"লিখেছি 'হীরকচূর্ণ' পূর্ণপাত্র করে। বয়স বাইশ যবে বসি 'কর'-ঘরে॥" ('অমৃত-মদিরা', পৃ ২৩৭)।

১২. ন্যাশনাল থিয়েটার-প্রতিষ্ঠাপর্বেও নবগোপাল মিত্র নানাভাবে সেই তরুণদলের উৎসাহবর্ধন করেছিলেন। ১৮৭৩-এর ২৯এ সেপ্টেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে যে উৎসব-সভা হয়, তাতে তিনিই সভাপতিত্ব করেন।

১৩. ব্যায়ামবীর অখিলচন্দ্র থিয়েটার-মঞ্চেও তাঁর ব্যায়াম দেখিয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেলে অমৃতলাল-অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ কয়েকজন নিজেদের দলের নাম 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' দিয়ে ১৮৭৩-এর ৫ই এপ্রিল লিন্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সঙ্গে অন্য যে সব বিষয় অভিনয় করেছিলেন সেগুলির মধ্যে 'অখিলের ব্যায়াম-ক্রীড়া'ও ছিল।

১৪. অমৃতলালের মতো গিরিশচন্দ্রও 'নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী' প্রবন্ধে নামটি রামচন্দ্র মিত্র বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—রামপ্রসাদ মিত্র। (পু. প্র., শি. প°. পৃ ১৬৮)।

১৫. গিরিশচন্দ্রের নিমে দত্তর ভূমিকা সম্পর্কে অমৃতলাল তাঁর বাল্যবয়সের 'মূঢ় আত্মাভিমানে'র প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে (৮.২.১৯১২) রচিত তাঁর শোককবিতায় গিরিশচন্দ্রকে 'নটগুরু' আখ্যা দিয়ে—

"মদে মত্ত পদ টলে   নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।"

('স্মৃতির সম্মান' ঃ নাট্যমন্দির, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১৯)

১৬. এই হাস্যপরিহাসের স্মৃতি অমৃতলালকে উন্মনা করেছিল অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুতে (১৫.৯.১৯০৮)। অর্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে অমৃতলাল লিখেছিলেন—

'বৈঠকে কি নাট্যমঞ্চে   কত রাত গেছে বঞ্চে,
মুস্তফি ! তোমার সাথে কৌতুক-কলায়।
কথায় কথায় বসে,   ভিজায়ে হাসির রসে
রচেছি রহস্য কত কৈশোর খেলায়॥'

[মিনার্ভা-মঞ্চে অর্ধেন্দু-স্মৃতিসভায় পঠিত ও অমৃত-গ্রন্থাবলীতে (৪র্থ) সংকলিত]

১৭. অমৃতলাল যে নাট্যরচনায় ও অভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন সে তাঁর 'নাট্যগুরু' ও 'বাল্যসখা' অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফিরই জন্যে। পরবর্তীকালে মানুষের ভান ও ভণ্ডামিকে আঘাত করতে এক-একটি প্রহসনে তাদের 'ক্যারিকেচার' তৈরি করেছিলেন। এর বীজ তাঁর মনের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল শৈশবে অর্ধেন্দুরই সাহচর্যে, এই সব আখড়ায়।

১৮. মঞ্চ পরিচালনায় ও দৃশ্যপট অঙ্কনে ধর্মদাস সুর অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চ তাঁরই সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—"··সমস্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ই তাঁহার নিকট আংশিক বা সম্পূর্ণ ঋণী। আমার 'শঙ্করাচার্য' নাটকের দৃশ্যগুলি যে তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত এবং মিনার্ভায় অভিনীত 'চন্দ্রশেখরে'র দৃশ্যপট যে তাঁহার রঙ্গালয়ের শেষ কার্য তাহা তিনি [আত্মজীবনীতে] প্রকাশ করিতে পারেন নাই" ('নাট্যশিল্পী ধর্মদাস')। অমৃতলালও পুরাতন প্রসঙ্গ উত্থাপনকালে বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন, 'ধর্মদাস বাঙ্গালীকে স্টেজ নির্ম্মাণ করিতে শিখাইয়াছিলেন।' ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ ধর্মদাস সুরের মৃত্যু হয়।।

১৯. 'Looking Backward' প্রবন্ধে অমৃতলাল লিখেছেন, অর্ধেন্দুশেখরই তাঁকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা নিতে বাধ্য করেন—"···he exclaimed out—'Eureka, I have found my Sairindhri!······here is your part." (The Servant : 7. 3. 1925).

২০. ন্যাশনাল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এত নিবিড় ছিল বলেই ১৮৭৩-এর জানুআরিতে যখন ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম বিরোধ দেখা দিল, তখন সে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে যে সালিশী কমিটি গঠিত হয়. তাতে নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসু ছিলেন।

২১. অর্থাভাব সত্ত্বেও কিভাবে তাঁরা অসাধ্য-সাধন করে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিলেন, 'অমৃত-মদিরা' কবিতায় (পৃ. ২৪২) অমৃতলাল তা ব্যক্ত করেছিলেন—

> 'রাজার সাহায্য নাই নাই নিজধন।
> মূলধন মনোবল শরীর পাতন॥
> ··· ··· ···
> এইরূপে যুবা-কটি সহায়বিহীন।
> মাটি হয়ে খাটিয়াছি কত নিশিদিন॥
> ··· ··· ···
> তবে বঙ্গে নাট্যশালা হয়েছে স্থাপন।
> অলি-গলি দেখ এবে যার বিজ্ঞাপন॥···'

২২. আসলে পত্রিকাটি ছিল 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'ইংলিশম্যান' নয়। A Spectator-লিখিত সমালোচনাপূর্ণ পত্রের প্রকৃত ভাষা ছিল : Up goes the drop-scene next, and out comes the rickety stage with its repulsive hangings.' সৈরিন্ধ্রীর ওষ্ঠবিকৃতি-প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল···'it was a curious sight to see her drawling with the upper lip curved.'

২৩. 'ঐ বাড়ীর' অর্থাৎ সান্যালবাড়ির স্টেজে 'প্রণয়পরীক্ষা' অভিনীত হয়েছিল কি ? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' প্রদত্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয়-তালিকায় 'প্রণয়পরীক্ষা' নেই। গ্রেট্ ন্যাশনালে ১৮৭৪-এর ১৭ই জানুআরি 'প্রণয়পরীক্ষা' অভিনীত হয়।

২৪. 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয়ের পর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নি।

২৫. শোভাবাজার প্রাইভেট্ থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটিতে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হয় ১৮৬৭-র ৮ই ফেব্রুআরি।

২৬. 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের আগে এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয়ের পরে দল ভাঙে।

২৭. ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হয় ২২এ ফেব্রুআরি, ১৮৭৩। ৮ই মার্চ 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং অন্যান্য প্রহসন অভিনয়ের পর স্যান্যাল বাড়িতে অভিনয় বন্ধ হয়, দলও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যান।

২৮. অমৃতলালের বাল্যবন্ধু। ন্যাশনাল থিয়েটার-প্রতিষ্ঠায় যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের উদ্‌যোগ কম ছিল না। ইনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ' নাটকে যে ট্রেনটি মঞ্চে প্রবেশ করতো, সেটি এঁরই নির্মিত। হাতিবাগানে স্টার থিয়েটারের সুন্দর অভিজাত স্থাপত্য এঁরই পরিকল্পিত।

২৯. এই ফার্সটি 'নব বিদ্যালয়' নামে ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৩-এর ১৫ই জানুআরি প্রথম অভিনীত হয়। তৃতীয় অভিনয়ের সময় (৮. ৩. ১৮৭৩) ফার্সটির নাম হয় 'মডেল স্কুল'। 'নব বিদ্যালয়' দেখবার পর ৬ই মাঘ ১২৭৯ 'মধ্যস্থ' পত্রিকা লিখেছিলেন—'ছোট কর্তার প্রতিষ্ঠিত গণিত, জরিপ, রসায়ন, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষাদানার্থ হুগলিতে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তাহারই ব্যঙ্গার্থক অনুকরণ। ইহা অতীব হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল।...দোষে-গুণে জড়িত তামাসা মন্দ হয় নাই।'

৩০. জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'নব-নাটক' ন'বার অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ৫. ১. ১৮৬৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায়—'সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ' (পৃ. ১০৪)। এই অভিনয় দেখেই অর্ধেন্দুশেখরের 'অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল।'

৩১. এই কিস্তিমাতের কথাটি অতিরঞ্জিত নয়। বাস্তবিকই তাঁরা "কিস্তিমাৎ" করেছিলেন। ঢাকার পূর্ববঙ্গ-রঙ্গভূমিতে ২৬-এ এপ্রিল, ১৮৭৩ 'নীলদর্পণে'র অভিনয় হয়েছিল। ২২-এ মে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অভিনয়-বিবরণ

থেকে জানা যায়, 'অভিনয় যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল বলা যায় না। ··আমরা সমস্ত দেশবাসী অভিনয় সন্দর্শন করিয়া যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।' ঢাকার 'জন দশেক' কয়েক মাস পরে (৪. ৯. ১৮৭৩) একটি পত্রে অমৃতবাজার পত্রিকা'য় 'নীলদর্পণে'র অভিনয়-প্রসঙ্গে লেখেন—'তাঁহাদিগের প্রথম দিবসের অভিনয় দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত হইলাম, এবং বলিতে লাগিলাম যে, পৃথিবীতে এইরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় থাকতে জঘন্য রামাভিষেকের অভিনয় [ঢাকাবাসীদের দ্বারা অভিনীত] দেখতে কার প্রবৃত্তি জন্মে ?'

৩২. 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় ১৮৭৩-এর ১৬ই আগস্ট। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী-সহযোগে অভিনয়ের অভিনবত্ব অনেকেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'সমাজ পরিত্যক্ত ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জনসমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কিনা' তার জন্যে অনেকেই চিন্তিত হয়েছিলেন।

৩৩. 'ভুবনমোহন নিয়োগী' প্রবন্ধেও অমৃতলাল লিখেছিলেন—'বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না ; শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন,··· 'কে একজন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধহয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' বলে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল···।'

৩৪. অভিনেত্রী বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা'য় আরও একটু তথ্য দিয়েছেন। সেখান থেকে জানা যায় যে, জানাশোনা ছিল বলে ভুবনমোহন ও ধর্মদাস বেঙ্গলের গ্রীনরুমে চলে যান। এতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের বচসা হয়। ধনবান ভুবনমোহন এ অপমান নীরবে সহ্য করতে পারলেন না। ধর্মদাসের সহায়তায় কয়েক মাসের মধ্যেই বেঙ্গল থিয়েটারের কাছাকাছি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে তুললেন।

৩৫. ১৭।১৮ দিন না হলেও প্রতিষ্ঠার পর ন'মাসের মধ্যেই গ্রেট্ ন্যাশনালে অভিনেত্রী নিযুক্ত হয়। ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী, যাদুমণি ও রাজকুমারী নামে সংগৃহীত পাঁচটি অভিনেত্রী নিয়ে ১৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ অভিনীত হয় 'সতী কি কলঙ্কিনী'।

৩৬. এই 'বিনা পয়সায় অভিনয়' তাঁরা সুসংস্কৃত রঙ্গালয়ে দেখিয়েছিলেন ১৮ই মার্চ ১৮৭৪ 'Free Night' ঘোষণা করে। অভিনয় হয়েছিল 'নবীন তপস্বিনী'।

পুরাতন পঞ্জিকা

১

ইংবাজগঠিত বাংগালী যে কোন কার্য্য করেন, সবই পরোপকারের জন্য। সাহিত্যের অভাবপূরণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য-ই বাংগালী লেখক লেখনী পরিচালন করেন, কেহ কথাটা হজম করিয়া রাখেন, কেহ কথাটা প্রকাশ করেন; বিশেষ সাময়িক ও সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ।

বাংগালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাবপূরণের প্রয়াস বাল্যকাল হইতেই আমার মানসে বিকসিত হয়, কিন্তু স্বভাবে দীর্ঘসূত্রীর ভাব ও আত্মবিশ্বাসের অভাব এত দিন আমায় সাহিত্যের সে অভাব পূরণ করিতে দেয় নাই।

বাল্যকালে প্রতি চৈত্রশেষে বাড়ীতে পাঁজি কেনা হলে-ই দেখতেম উপরে লেখা আছে '**নূতন পঞ্জিকা**'। এক দিন পিতামহকে[১] জিজ্ঞাসা করলেম, 'দাদা, এ ত নূতন পঞ্জিকা, পুরাতন পঞ্জিকা কোথায়?' তিনি অংগুলিনির্দ্দেশে ঘরের একটা তাক দেখিয়ে দিলেন। একটা রবিবারে দাদা[২] গংগাস্নানে গেলে দুপুরবেলা সেই তাকে উপরি উপরি সাজান পাঁজি পেড়ে ধুলো ঝেড়ে এক একখানি ক'রে দেখলেম, প্রত্যেক পাঁজির উপরেই লেখা আছে নূতন পঞ্জিকা; অপরাহ্ণে নিদ্রোত্থিত পিতামহকে জিজ্ঞেস করলেম; 'দাদা, পাঁজিগুলি ত পেড়ে প'ড়ে দেখলেম, সব-ই দেখি ত নূতন পঞ্জিকা।' দাদা বললেন, "ঐগুলো-ই এখন পুরোনো হয়ে গেছে।' আমি বললেম, এ ত পুরোনো পাঁজি, কিন্তু আদত 'পুরাতন পঞ্জিকা' কোথায়?" আমি তখন 'বোধোদয়' পর্য্যন্ত পড়েছি, কিন্তু দাদার বিদ্যা কাশীরাম দাস; সুতরাং আমার প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা ক'রে দিতে পারলেন না। সেই অবধি গোঁপ উঠলে যে সব বড় বড় কায করব মনে ক'রে কল্পনার ফলকে নোট ক'রে রেখেছিলাম, তার সংগে পুরাতন পঞ্জিকা প্রণয়নটাও এড্ ক'রে দিলুম।

অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, পঞ্জিকাখানি নীরস হইবে; কেন না, ইহাতে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনামাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। যে ফলিত জ্যোতিষের অজ্ঞতা ও উপন্যাস-রচনার অক্ষমতা এত দিন আমাকে ইতিহাস বা জীবনচরিত-লেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করতে দেয়নি, সেই হীনতা

এখন আমার সরস পঞ্জিকা প্রণয়নের বিঘ্ন। বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি আরনল্ডের রোমের ইতিবৃত্তে বর্ণিত চিতোরের রাণাগণের আদিপুরুষ বাপ্পারাওয়ের সহিত বঙ্গের শেষ but নাবালক সেরাজউদ্দৌলা, নবাব আলিবর্দ্দী'র যুদ্ধঘটনা অবলম্বন করিয়া একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তখন আমার যৌবন-যুক্ত জীবনের বাসন্তী হাওয়া ইতিহাসকে ভাসাইয়া প্রণয়কাননের পথ বাহিয়া পৌরাণিকে পরিণত হওয়ার গতি প্রাপ্ত হইতেছে বুঝিয়া লিখিত পত্রাবলী নাট্যসাহিত্যের পিতৃপুরুষের তিলতর্পণে প্রয়োগ করিয়া ফেলিলাম।[৩] তার পর হইতে ইতিহাস ও জীবনচরিত প'ড়ে প'ড়ে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, ঐ দুইখানি প্রতিমার হস্তপদ-বদনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাতে ডাকের সাজ ন পরালে কখনই তা লোকপূজ্য হ'তে পারে না।

এই পুরাতন পঞ্জিকার আর একটা দোষ থেকে যাবে, তা আমি আগে থাকতেই ব'লে রাখছি। সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালী পঞ্জিকা পূজা করেন, পঞ্জিকাশ্রবণ পুণ্যকর্ম্ম ব'লে মনে করেন, সুতরাং এখনকার নূতন পঞ্জিকাগুলিতে 'কেমিক্যাল সোনার গহনা,' 'দাস ব্রাদার্শে'র চটি জুতা,' 'প্রমেহ-প্রলেপ,' 'শত-সতী-গতিকারি-পতি-প্রস্তুত-পটু-বটিকা' প্রভৃতি পবিত্র কথা বিজ্ঞাপিত না হ'লে পুণ্য পঞ্জিকা সম্পূর্ণ হয় না; চরিত্রহীন নট আমি, অত পবিত্র কথা আমার মুখে শোভা পাবে না।

* * * * *

ষাট বৎসর পূর্ব্বে সালে বর্ষসংখ্যা গণনার প্রথাটা সাধারণের মধ্যে অনেকটা প্রচলিত ছিল ব'লে সন ১২৭১ সাল বল্লেম, নইলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ বলাই শিক্ষিতসমাজসম্মত হ'ত; সেই ৭১ সালের কলকেতা আর এখনকার কলকেতায় অনেক তফাৎ। তখনকার কলকেতা অনেকটা বাঙ্গালী কলকেতা ছিল। চিৎপুর রোডের নাম ছিল তখন বড় রাস্তা, শ্যামবাজার অঞ্চলের লোক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটকে বলতো নূতন রাস্তা, আর সারকুলার রোডটাকে চৌরঙ্গীর চেয়ে কম চওড়া ব'লে মনে হ'ত না। আর চৌরঙ্গী পার হয়ে বড় গির্জ্জেটা পেরুলেই গোলপাতার ঘর আর খাপরার চাল বুঝিয়ে দিত যে, সহরের শেষ হয়ে উপকণ্ঠ আরম্ভ হ'ল। কোথায় ছিল তখন হ্যারিসন রোড, গ্রে ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট, সেনট্রাল এভিনিউ! আজকাল যেখানে প্রকাণ্ড দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্যামবাজারের বড় পার্ক আর তার এ পাশে ও পাশে মোটররথীদের গর্ব্বোন্নত হর্ম্ম্য, তখন সেখানে

বনবাদাড়ের মাঝে দীনদুঃখীর চালা বা কাছি পাকাবার কারখানা—এই সব ছিল। যতদূর স্মরণ হয়, তাতে মনে হয় যে, শ্যামবাজারের মোহনলাল মিত্রের বাড়ীর সামনে থেকে গড়পারের মোড় পর্য্যন্ত তো মহারাট্টা ডিচ্ দেখেছি। লালদীঘির ধার তখন সবে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের পরিবর্ত্তে ড্যালহৌসী স্কোয়ার নাম গ্রহণ করেছে। ষ্ট্রাণ্ড রোডের ধার দিয়েই তখন গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, প্রমাণ মা আনন্দময়ীর তলার পশ্চিমে নিমতলা ঘাটের পুরাতন চাঁদনী। য়ুরোপীয়েরা যখন বাঙ্গালায় প্রথম আসেন, তখন এ দেশের লোকরাই ছিলেন মানুষ, ওঁরা ছিলেন গেঁড়ি-গুগুলি ; তাই মা গঙ্গার মহিমা না বুঝতে পেরে কলিকাতার প্রান্তপ্রবাহিণীকে হুগলী নাম দিয়েছেন, আবার সেই হুগলীর কতকাংশ জঞ্জাল ফেলে ভরাট ক'রে রাস্তা তৈরী করেছেন ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক। আমরা চিরকাল-ই বাস্তুপ্রিয়, সেই জন্য জমি পেলেই বাড়ী তৈরী করি, আপনারা বাস করি, আবার পাঁচ জনকে ডেকে-ডুকে এনে বসবাস করাই ; আর ইংরাজরা চিরদিনই ভবঘুরে, তাই সুবিধে পেলেই বাস্তু ভেঙ্গে রাস্তা তৈয়ার করেন। যার যেমন প্রবৃত্তি। এক সময় একটি সরায়ের সামনে এক জন সেনা-নায়ক আর এক জন ডাক্তার ব'সে গল্প কচ্ছিলেন, সেই সময় একটি লোক তাঁদের সামনে দিয়ে চ'লে গেল। তাকে দেখে নায়ক বল্লেন, 'বাঃ, কি বলিষ্ঠ দেহ, সুগঠিত পেশল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একে যদি আমি আমার সৈন্যদলে পাই।'

ডাক্তার বল্লেন, 'হ'তে পারে, জীবন্ত দেহ তোমার কাযে লাগতে পারে, কিন্তু ও ম'লে যদি কেউ ওর শবটি আমায় যোগাড় ক'রে দেয়, তা হ'লে একবার মনের সাধে ব্যবচ্ছেদ ক'রে আমার শরীর-তত্ত্ব-বিদ্যা শিক্ষা করার সার্থকতা করি।'

হিঁদুর ছেলে গঙ্গা দেখলেই তার মা গঙ্গা ব'লে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুব দিতে ইচ্ছে করে, ঐ মধুর পবিত্র সলিল নিজে পান ক'রে পরিতৃপ্তির আনন্দে অঞ্জলি অঞ্জলি জল তুলে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্ত্যর্থ উদ্দেশে তর্পণ কর্ত্তে ইচ্ছে করে, আর ভাবে, যখন এক দিন মরতেই হবে, তখন ঐ জলে অর্দ্ধাঙ্গ ডুবিয়ে শেষ শ্বাস পরিত্যাগ-ই এ জীবনে চরম সুখ। আর সাহেবের ছেলে আবার সেই গঙ্গা দেখেই ভাবে যে, এই স্রোতে ডিঙ্গা ভাসিয়ে মাল আমদানী করারও যেমন সুবিধা, আর এর একটা তীর বেঁধে দিয়ে মাসুল রোজগারেরও তেমনই সুবিধা। কলকেতা যখন বাঙ্গালীর সহর ছিল, তখন বাগবাজার থেকে বাবুঘাট পর্য্যন্ত স্নানের ঘাটেরই বাড়াবাড়ি ছিল। স্নানের ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়া, ঘাটের

ওপর চাঁদনী তৈয়ার করা তখনকার বড়লোকদের একটা বাই ছিল, কর্ত্তব্য ছিল, ধর্ম্ম ছিল। সেকালে কলকেতায় রাজা বল্লেই শোভাবাজারের রাজাদের-ই বোঝাত—সমস্ত সুতানুটীটা-ই তাঁদের জমিদারী। কুমারটুলী থেকে আরম্ভ ক'রে বাগবাজারের শেষ পর্য্যন্ত ঐ রাজাদের-ই অনেকগুলি ঘাট ছিল। এ ছাড়া রাণী রাসমণির বাবুঘাট (এখন সাহেবঘাট,—তবু কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান নিত্যস্নান ক'রে পূর্ব্বনামের মাহাত্ম্য বজায় রেখেছেন), বাগবাজারের রসিক নিয়োগীর ঘাট,—আহা, কি সুন্দর ঘাট-ই সে ছিল. এখনও পইঠে ক'টি পোর্ট কমিশনার বাহাদুররা কৃপা ক'রে বজায় রেখেছেন ; কিন্তু কোথায় গেছে সেই সুন্দর অট্টালিকা, নীচে প্রশস্ত চাঁদনী, পাশে গঙ্গাযাত্রীর ঘর, দোতালায় প্রকাণ্ড বৈঠকখানা. যেখানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রথম প্রকাশ্য নাট্যালয় 'ন্যাশনাল থিয়েটর' স্থাপনের উদ্যোগে 'নীলদর্পণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'পুরুবিক্রম', 'ভারত-মাতা' প্রভৃতির রিহার্শাল হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বন্দরে তখন পালতোলা জাহাজের বেশী আমদানী, ষ্টীমারের সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল ; বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালিয়ান, স্পেনিস, মার্কিণ প্রভৃতি নানা জাতীয় সেলার তখন কলিকাতায় আমদানী হ'ত। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয়, অল্পদিন পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হয়েছিল, কিন্তু সেলার হোমটি ছিল আগে ঠিক লালবাজারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, যেখানে ইদানীং পুলিসের হাজত-ঘর ছিল। আর লালবাজারের পূর্ব্বদিকে যে বহুবাজার ষ্ট্রীট্ গিয়েছে, ওকে সাহেবরা বলত তখন ফ্ল্যাগ ষ্ট্রীট ; কারণ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের খানিকটা আর ঐ ফ্ল্যাগ ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দুধার-ই প্রায় ছিল কেবল মদের দোকান। ইংরাজ শুঁড়ী, ফরাসী শুঁড়ী, মার্কিণ শুঁড়ী, ইটালিয়ান শুঁড়ী, স্প্যানিস শুঁড়ী সব দোকান সাজিয়ে মদ বেচত, সাইনবোর্ড অনেকগুলিই প্রকৃত সাইনবোর্ড-ই ছিল, যথা :—হোয়াইট হর্শ, ব্লু বটল, রেড লায়ন—এই রকম ; আর ফি-দোকানের সামনে তাদের নিজের নিজের দেশের ফ্ল্যাগ লাঠির আগায় উড়ত। বাঙ্গালীর কথা ছেড়ে দিন, ফিরিঙ্গীও তথৈবচ, মাতাল সেলারের দৌরাত্ম্যে বড় বড় জাঁদরেল সাহেবরা-ও ঐ রাস্তা দিয়ে যখন-তখন যেতে আসতে শঙ্কিত হতেন। এখনও বেশ মনে পড়ে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঐ লালবাজারের কোণে সেলার হোমের একতালা ছাতের আলসের উপর সেলাররা বাঁদরের মত পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকত ; উঠছে, বসছে, দৌড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, টেলিগ্রাফের থাম্বা বেয়ে উঁচুতে উঠছে,

মোড়ের উপর আপনা আপনি ঘুসি লড়ালড়ি কচ্ছে, সন্ধ্যের ওক্তে আফিসফেরত বাবুদের চাপকানের পকেটে হাত পুরছে, ছাতা-চাদর কেড়ে নিচ্ছে, একটা দুর্দ্দান্ত সেলারকে ৪।৫টা গোরা সার্জ্জেনে ধ'রে গারদে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব দুর্দ্দান্ত শাসনের জন্যই কলকাতায় গোরা পাহারাওলার সৃষ্টি ; আজও যে তাঁরা কেন আছেন এবং তাঁদের সস্ত্রীক বসবাসের জন্য বাড়ী তৈরীর খরচা কেন যে আমাদের দিতে হচ্ছে, তা বুঝতে পারি না।

এই সেলাররা এক সময় কলিকাতার একটি বিদ্ঘুটে উৎপাত ও বিচিত্র দৃশ্য ছিল ;[8] ভাল মন্দ দুই গুণ-ই তাদের ছিল। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কলকাতায় উলুর চালা, গোলপাতার ঘর প্রায় উঠে গেলে-ও একেবারে নিঃশেষ হয়নি, তা ছাড়া খোলার ঘর ও মাঠগুদাম ঢের বেশী ছিল। হাটখোলায় যে সব ধনী মহাজন এখন জমিদার হয়ে বড় বড় কোঠা তুলেছেন, তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে অনেকেরই তখন দোতালা খোলার ঘর অর্থাৎ মাঠগুদাম কি না নীচে মালের গুদাম ও উপরে বাসের ঘর—এই ছিল, সুতরাং অগ্নিকাণ্ড তখন কলিকাতার ভিতর খুব বেশী-ই ঘটত, বিশেষ—ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। স্টীম দমকল, মোটর দমকল ত তখন ছিল না, ভবানীপুরে, লালবাজারে এই রকম মাঝে মাঝে টংয়ের উপর একজন লোক ব'সে থাকত, ধোঁয়া দেখলে সে খবর দিত আর হাত দমকল আগুন নিবাতে দৌড়ুত, সেই সময় সেলাররা বড় কায করত। তখন জলের কল হয়নি, বাড়ী বাড়ী পাতকুয়া ছিল—পুকুরও অনেক ছিল, আর চিৎপুর রোডে ওরিয়েণ্টেল সেমিনেরীর একটু উত্তর পর্য্যন্ত ইট দিয়ে লহর গাঁথা ছিল। লাট সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে এখন-ও সেই লহরের শেষ চিহ্ন দেখা যায়। চাঁদপাল ঘাট থেকে পম্প করা জল ঐ লহরের ভিতর দিয়ে গরাণহাটা পর্য্যন্ত এসে পোঁছুত ; সেই জল আগুন নেবাবার সময় কাযে লাগত আর ভিস্তীরা তাই থেকে জল তুলে ইংরেজটোলায় দু'বেলা, আর বাঙ্গালীরা "বাপ্ রে গেলুম রে ধুলোয় মলুম রে" ক'রে উঠলে কখন-ও কখন-ও এ পাড়ার কোন কোন রাস্তায় ছিটুত। ঐ আগুন লাগার সময় দমকলের সঙ্গে সেলাররা এসে অকুতোভয়ে আগুনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে লোকের ধন-প্রাণ রক্ষার সাহায্য করত, তবে মদের দামটা বলে-ই হোক আর না বলে-ই হোক আদায় ক'রে নিতে ছাড়ত না। সেলাররা টাকা জমাতে জানত না, পেলেই খরচ ; টিয়ে পাখী কিনচে, বাঁদর কিনচে, পায়ে জুতো নেই, একখানা সিল্কের স্কার্ফ কিনে-ই

গলায় জড়ালে ; গাড়ী ভাড়া করছে, গাড়ীর ভিতরে, পিছনে, ছাতে, কোচবক্সে ঘোড়ার পিঠে পর্য্যন্ত চ'ড়ে বসছে,—আর মদ ত হরদম, এই জন্যই বোধ হয় সেলারীকান্ড, কাপ্তেনবাবু প্রভৃতি কথার সৃষ্টি। আবার বাঙ্গালী বড়মানুষরা বা স্কুল-বয়রাও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় যে যার পক্ষ বলবান্ করবার জন্য সেলার ভাড়া করেও আনতেন, তারা যেমন মারতে পারত, তার চেয়ে মার খেয়ে বেশী বরদাস্ত করতে পারত।

কিন্তু যাদের পূর্ব্বপুরুষরা মানুষ-খেগো বাঘ তাড়িয়ে সাপ সরিয়ে এই দেশে বাস করছিলেন, সেই বাঙ্গালীর মধ্যে-ও কতকগুলি লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের কাছে এই ব্যাঘ্রপ্রকৃতি সেলাররাও টুঁ-ফাঁ করতে পারত না, করতে গেলে মুষ্ট্যাঘাতে পপাত ধরণীতলে। এক শ্রেণী ছিলেন জনকতক বলিষ্ঠ ভদ্রসন্তান, তাঁদের কাকে-ও কাকে-ও আমি নিজেও জানতুম। আর এক ছিলেন, রাধাবাজারের শুঁড়ী বাবুরা। রাধাবাজারে যেখানে এখন সব সারি সারি ঘড়ির দোকান দেখেন, ঐখানে ছিল সব গায়ে গায়ে বিলাতী মদের দোকান ; গেলাস বিক্রী, বোতল বিক্রীও ছিল, কিন্তু তাঁদের বড় কারবার ছিল হোলসেল্। কলিকাতার ও মফঃস্বলের ছোট দোকানদাররা তাঁদের-ই কাছ থেকে পাইকারী মাল কিনে নিতেন। হোটেল, মেস, ক্লাব, কেল্লাতে-ও তাঁদের সরবরাহ করবার কন্‌ট্রাক্ট ছিল। গ্লাস বিক্রীর বেশী খদ্দের ছিল ঐ সেলাররা, তারা দোকানে মদ খেতো, গাইতো, নাচতো, শুয়ে পড়তো, মারামারি করতো, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলেই সা-মশাইদের পায়ের কেল্লার জুতোর ঠোকর আর লোহার হাতের ঘুসি। হায়রে, আজকের ফুটবল চ্যাম্পিয়ান বাবু ! দেখতে যদি তুমি আজ অবিনাশ সেন, সেলার যদু, অখিলচন্দ্রকে—অতি ভাল মানুষ, সাত চড়ে রা নেই, দরকার হ'লে তোমার জুতো মাথায় করবে। কিন্তু তোমার উপর গোরা কি সেলার যদি উৎপাত করে ত দু'শো লোকের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঘুসিয়ে তার মাথা ভেঙ্গে দেবে। শিমলা শুঁড়ীপাড়ায় কি জোয়ান-ই সব ছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের সংস্রবে আমার বন্ধু রমানাথ আস্ত ঝুনো নারিকেল হাতে নিয়ে নিজের মাথায় ভেঙ্গে ফেলতে পারতো—লোহার চেয়ে শক্ত তার মাথাটা ; কেল্লার গোরা, লালবাজারের সেলার, এদের দেখলে কেঁচো হয়ে থাকত, অর্ম্মস্ এ্যাক্ট ত আছেই, দেড়গজা লাঠি পর্য্যন্ত হাতে নিয়ে বেরুতে পুলিস কমিশনারের মানা ; কিন্তু এই সব বাঙ্গালী আজ বেঁচে থাকলে আইন করতে হ'ত যে, বাঙ্গালী

যখন রাস্তায় বেরুবে, তখন হাত দুখানা ও মাথাটা যেন বাড়ীতে রেখে আসে।

আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ছিল, হিন্দু মুসলমান—দুই-ই—বিশেষ ভদ্রঘরের নয়—যাদের লোকে বলত গোরার দালাল। তাদের ধুতি চাদর কামিজের বাহারের বিশেষ পারিপাট্য ছিল, ঘাড়-কামান চুলে কেতাদোরস্ত টেরি, মদ খেয়ে হজম করবার খুব ক্ষমতা, ছাতিতে ও কব্জিতে গোরা-দমন শক্তি। এরা কেল্লার গোরা লালবাজারের সেলার নিয়ে চাঁদনীতে বাজার ক'রে দিত, মদের দোকানের হিসাব মিটিয়ে দিত, মনুমেণ্টে নিয়ে গিয়ে চড়াত, সোসাইটি কি না মিউজিয়ম, জুলটুনী দেখাত, সাতপুকুরে বেড়াতে নিয়ে যেত, দমদমা ঘুরিয়ে আনত, আর চমৎকার হাস্যরসোদ্দীপক ইংরাজী বলত ; নমুনা চান ? "ইউ ডগ্ ড্যাম গোটে হেল মাষ্টার টমি, ডোন্ গো উয়োম্যান হাউস, সো মেনি মনি সঙ্গে, দেন নো যাদু মন্তর, টেক্ অল, গিভ ইউ ফক্কা ; কিপ্ টু রুপি, রিমেণ্ডাব অল গিভ মাই জিম্মে ;—আনডারষ্ট্যাণ্ড জ্যাক্—" এই রকম আর কি ! এরা একজন দালাল কেল্লার ৫।৭টা গোরা বা সেলারকে কানে ধ'রে উঠাতে বসাতে পারত, মাঝে মাঝে ঘুসিটে-ঘাসাটা খেত বটে ; কিন্তু সুদসমেত শোধ দিত।

১২৭১ সালের আশ্বিন মাস পড়েছে ; তখন এক রকম ভাদ্রের গোড়া থেকেই কলকাতায় পুজোর বাজার ব'সে যেত, রেল তখন এতদূর ছড়িয়ে পড়েনি, বঙ্গের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সব দিক থেকেই বাঙ্গালী পুজোর বাজার করতে কলকাতায় আসত। পাইকার, গৃহস্থ, জমিদারের গোমস্তা, পুজোবাড়ীর লোক, সব আসত এখানে সওদা করতে। যদি এক জন আসত বাজার করতে, তার সঙ্গে ১০ জন আসত কলকাতা দেখতে, গঙ্গাস্নান করতে, কালীঘাটে পুজো দিতে। সেই সময় কলকাতার রাস্তায় বেরুলে-ই মফঃস্বলের লোকের ভিড় সবার চোখের উপর পড়ত। বাজারের প্রথম কেন্দ্র ছিল বড়বাজার, দ্বিতীয় চাঁদনী। তখন বড়বাজারে ঢুকলে মনে হ'ত না যে, কাশীর লক্ষ্মীচৌতারায় এসে পৌঁছেছি ; হয় হিঁদু, নয় মুসলমান, কিন্তু সবই বাঙ্গালীর দোকান। বাঙ্গালী কাপড়-ওয়ালা, বাঙ্গালী জুতাওয়ালা, বাঙ্গালী ছুরি- কাঁচি বিক্রী করছে; হাতাবেড়ী, চাটু-কড়া, ঘড়া-গাড়ু, থালা-বাটী, মাদুর-পাটী, গালচেদুলচে, সতরঞ্চি, পিঁড়ে-আসন, ঘি-চিনি, মিছরি-মোণ্ডা, ফল-পাকড়, সব-ই বাঙ্গালীতে বেচেছে। খোট্টার দোকান যে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু খুব অল্প ; তারা হিন্দুস্থানী প্যাটেনের জামা, পা-জামা, ফতুয়া, টুপী, রুমাল, আতর, গোলাপ, চাটনী, মোরব্বা,

বেনারসী কাপড় এই সব-ই অধিক কেচত, আর হিন্দুস্থানীদের বিশেষ কারবার ছিল হালুইকরের। লেডি ক্যানিং মিষ্টান্নের আবিষ্কারকর্ত্তা কম্বুলেটোলার পরাণে ময়রার হাতের তৈরী কচুরী গজার মতন ঐ দুটি জিনিস এ জন্মে আর কোথাও খাবার আশা নেই। কিন্তু ঐ রকম নামজাদা দুই এক জন বাঙ্গালী ময়রার বিশেষ বিশেষ জিনিষ ছাড়া কচুরী সিঙ্গাড়া প্রভৃতি ভাজি আর ছানা ছাড়া অন্যরকম মিঠাই সামগ্রী হিন্দুস্থানীরা যেমন প্রস্তুত করে, এমন আমরা পারি না। ক্ষীরে আমরা বেশী মজবুদ, ওরা রাবড়ীতে, দইয়ে আমরা পরস্পর টক্করাটক্করি দিতে পারি ; মোরব্বায় বীরভুম আর আচারে বসাক তাঁতিরা হিন্দুস্থানীব কাছে হার মানে না। আব আজ, হাযবে বড়বাজার না বড়ীবাজার ! আর শুধু বড়বাজাব কেন, বাঙ্গালী আজ আপনার ঘরে আপনি কাঙ্গালী। লঙ্গা শির আজ নতশির, খালি কলমবীর আর বাক্যবীর। যে দিকে চাও, পাগড়ী পাগড়ী আর ভাটিয়ার টুপি। কোথায় গেল সেই স' বাজারের যুগীপটি ছাতাপটি কাঁসারিপটি কাপুড়েপটি—একেবারে সব উপে গেছে ! মান রেখেছেন যা দু'একজন বাঙ্গালী "এন্ড কোং" ; তা-ও প্রায় দণ্ডে দণ্ডে দেখি সাইনবোর্ড বদলাচ্চে।

পুজোর গন্ধ ভাদ্রমাস থেকে-ই বড়বাজার থেকে ফুটে বেরিয়ে যেমন দোকানে দোকানে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমন-ই কুমারটুলীকে-ও ভরপুর মজগুল করে রেখেছে। চিৎপুর রোডের মোড় থেকে-ই কুমোরটুলীর ভিতর দু-ধারে-ই প্রতিমার সাজের দোকান খুলে গেছে। মা'র মটুক আঁচলা চৌদানী কানবালা শতেশ্বরী হার বাজু বালা তাবিজ পঁইছে নথ সব জ্বল্‌ জ্বল করছে। তার পর প্রতিমা। কারিগররা সাজা তামাক ঢেলে রেখে প্রতিমা-গঠনে ব্যস্ত, কোথাও একমেটে, কোথাও দোমেটে, কেউ কাঠামোয় খড় জড়াচ্ছে, কেউ খড়ে মাটি লেপছে, কেউ ছাঁচে মুণ্ড গড়ছে, গামলা সরা পেতে পেতে সব রং গুলতে ব'সে গেছে, গো-বাগানের গলিতে এত প্রতিমার ঠেলাঠেলি যে, পা বাড়াবার পথ পাওয়া যায় না। ভাবুন সহৃদয় পাঠক ! যে দেশে একদিন এত প্রতিমাপূজা হইত, সেই দেশ বর্ব্বরতার কি কুসংস্কারে-ই না আচ্ছন্ন ছিল !

বাঁচা গেছে, আর সে প্রতিমার ঠেলাঠেলি নেই, পুজার সেই কুরুচ্যানন্দ আর নেই। এখন কলকাতায় যাঁরা পুজো করেন—হয় পূর্ব্বপুরুষের উইলের দায়ে আর না হয় অষ্টমী পুজোর দিন সাহেবদের শ্যাম্পেন খাইয়ে সং

দেখাতে—আর নয়, পূজো করে নতুন পয়সা করা কলওয়ালারা, বাবুরা যাদের ইতর জাতি বলেন, তারা।

সেকালে কলকাতায় তিনবার তোপ পড়ত ; একবার ভোরে, একবার মধ্যাহ্নে আর একবার রাত্রি ৯টায় ; ৯টার তোপ পড়লে মেয়েরা বলতেন, এই ছঘড়ির তোপ পড়ল, আর হিন্দুস্থানী দরওয়ানরা, 'ব্যোমকালী কল্‌কত্তাওয়ালী' ব'লে জয়োল্লাস ক'রে উঠত। অকৃতজ্ঞ বলে, অবিবেচক আমাদিগের রাজনীতিক নেতারা কেবল বলেন, গভর্ণমেণ্ট ব্যয়-সঙ্কোচ করে না, ব্যয়সঙ্কোচ করে না, কিন্তু একবার চশমা খুলে চেয়ে দেখেন না যে, সদাশয় মিতব্যয়ী গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কলিকাতার ভোরের তোপ, পরে রেতের তোপ ও অবশেষে মধ্যাহ্নের তোপটি পর্য্যন্ত তুলে দিয়ে ভারতমাতার স্কন্ধ হ'তে কি গুরুতর ব্যয়ভার-ই না নাবিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু ১২৭১ সালে ভোট-ও ছিল না, ইলেকসন-ও ছিল না ; কাউন্সিল-ও ছিল না, রিফরম-ও ছিল না, পলিটিক্স-ও ছিল না, লিডার-ও ছিলনা ; তখন অপারেশন করতেন ডাক্তাররা, কো-অপারেশন থাকত কাপি-বইয়ে, অন্ন পরশন কত্তেন সোনার বাউটি হাতে মেয়েরা নিজে, আর গবর্ণমেণ্টেরও তখন এত সুবুদ্ধি হয়নি, তাই ঐ ৭১য়ের শারদীয়া চতুর্থ রাত্রি শেষ হতেই ভোরের তোপ গুড়ুম ক'রে পড়ল। আমি রাস্তার ধারে ঘরে ঘুমুতে ঘুমুতে সবে নতুন শান্তিপুরে গুল-বাহার উড়ুনিখানি দ্বারা মাথায় একটি পগ্‌গ বেঁধে তাতে কলসের স্বরূপ অপরাহ্ণে প্রাপ্ত আচীন চীনাম্যানের টিকিটমারা ফিতেওয়ালা চকচকে জুতো জোড়াটির একখানি পাটি গুঁজতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কেল্লার তোপ আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিলে। "দিতে পারিস নি ঘাড়টা ধ'রে সেইখানে ঘসড়ে"—গঙ্গার স্নানার্থী কাচিৎ কুলগৃহিণীকণ্ঠোচ্চারিত মহিম্নঃস্তবের এই প্রথম চরণ নিদ্রাভঙ্গের পরেই আমার বাল-কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তারপর বীজমন্ত্রের ন্যায় সমবেত অস্পষ্ট স্বর অস্ফুট উচ্চারণ গুজ্ গুজ্ গুজ্ গুজ্ ;—"আ মরণ, থাকচেন্, থাক্‌চেন্—পেছিয়ে পড়চেন।" "ও গতরখাগী মেজবৌ ছুঁড়ীর কথা আর বলিস নে বোন্।" "যাবে না, যাবে না, মরবে না, অত দম্প বিধেতাপুরুষ সইবে কেন?" গুজ্ গুজ্ গুজ্ গুজ্ঃ—"আমায় আবার নেম ভঙ্গের দিন ভাত রাঁধবার ফরমাস ক'রে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।" সঙ্গে সঙ্গে খল খল হাস্য। এইরূপ পুণ্যাকাঙ্ক্ষিণীদিগের মুখ হইতে স্তবলহরী উদ্গারিত হ'তে হ'তে কানে ঢুকল একটা অশ্লীল কথা, 'শিব ধন্য কাশী,

শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী।" পার্শ্বের শয্যায় পিতামহ শয়ন করেছিলেন, ডেকে বল্লেম, "দাদা, শিব ধন্য কাশী ফিরচে, তা হ'লে আর ফরসা হ'তে দেরী নেই, আজ যাবার সময় টেরপাইনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" এই প্রাচীন বয়স্ক "শিব ধন্য কাশী" ছিলেন, শ্যামবাজারবাসী একজন ভদ্র কায়স্থ; ইঁহার অবশ্য একটা কিছু নাম ছিল, আমার পূর্ণ যৌবনকাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার পুত্রের সহিতও আমাব পরিচয় ছিল, কিন্তু তাঁর মুখেও "শিব ধন্য কাশী" ভিন্ন তাঁহার পিতাব অন্য নাম ব্যক্ত হইতে শুনি নাই। স্মৃতি যত অল্প বয়স পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাইতে পারে, তখন হইতে, আর তাঁর তিরোধানের সংবাদ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতাম যে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, ঝড়-বৃষ্টি যাই হোক, রাত্রি ৪টা বাজিলেই প্রত্যহ শুনিব যে, সেই লোক গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন "শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী শিব ধন্য কাশী," আর ঘন্টাখানেক পরে ফিরিতেছেন "শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী।" কাশীপতি বিশ্বনাথ যদি "শিব ধন্য কাশী"র অন্তিমকালে কাশী মিত্রের ঘাটে আসিয়া তাঁহাব কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম না দিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কাশী-ও মিথ্যা, মণিকর্ণিকা-ও মিথ্যা আর তিনি-ও মিথ্যা।

কু—উ—উ—উ—ও ও ওর—ঘ—টি—তো—ও—ও—লা—আ—আ—আ—আ। "ও দাদা, ঘটিতোলা বেরিয়েছে, তবে এখনও ফরসা হোল না কেন?" এই কুয়ার ঘটিতোলাটি তখন কলিকাতার প্রত্যেক গৃহস্থের একজন অতি পরিচিত ও প্রার্থিত অতিথি ছিল। যখন পতিত-পাবনী সুরধুনী পলতার বালুকাকুণ্ডে স্নান করত অমলা হইয়া কল-নল-বাহিনীরূপে কলিকাতাবাসীর গৃহে গৃহে প্রবেশলাভ করেন নাই, তখন সকল বাড়ীতেই এক, দুই বা ততোধিক কূপ ছিল। কূপজলেই গৃহস্থালীর সকল কার্য্য-ই নির্ব্বাহিত হইত; স্নান করাবার জন্য মা বাড়ীতে আসতেন না, তবে কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে দিব্যি ক'রে গা ধুইয়ে দিতেন; আর উড়ে ভারীরা পানের জল বাড়ীতে এনে বিক্রী ক'রে যেত। বাবুরা বিক্রী শুনে ভয় পাবেন না, "কত ক'রে গ্যালন রে বাপু!" এক ভারে দু কলসী জল গঙ্গার তীর থেকে কম্বুলেটোলার মোড় পর্য্যন্ত সাধারণতঃ এক পয়সা, কখনও কখনও দুই পয়সা বড় জোর তিন পয়সা, আর নয়। আজকাল পূজাপার্ব্বণে দরজার পাশে যে পূর্ণকলস বসান, সেই মাপের কলসীর অন্ততঃ ৫।৬ কলসী জল উড়ে ভারীর এক এক কলসীতে ধরত। সকল

গৃহস্থবাড়ীতে-ই সংগতি বুঝে ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তনের এক একটি জলের ঘর ছিল। বড় বড় মাটীর জালা সব সেই ঘরে বসান থাকত, তাইতে খাবার জল জমা হ'ত; বাইরে রান্নাঘরের কাছে একটা মাঝারি বা ছোট জালা থাকত, তাহা নিত্যকার ব্যবহারের জন্য। পানীয় জল সঞ্চয় করবার প্রশস্ত সময় ছিল, মাঘ মাস। ঐ সময় গঙ্গার জল অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদু হয়; এখানকার গঙ্গার জল প্রায় চৈত্র মাসের শেষ হইতে-ই আষাঢ়ের বর্ষা নামিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লবণাক্ত হ'ত, তারপর আবার শ্রাবণের ঢল নামিলে বড় মলিন হ'ত, সেইজন্য ঐ মাঘ মাসে জল সংগ্রহ। কিন্তু সকল ঋতুতেই দশমী তিথিতে গঙ্গাজল কোন রূপে লবণাক্ত থাকে না। সেই জন্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমীর দিন গৃহস্থরা খালি জালা আবার পূর্ণ করিয়া নিতেন। কেরাণীর যেমন মেল ডে, যাজক ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী পূজার বার, ভারীর-ও পক্ষে তেমন-ই দশমী তিথি ছিল; ভারীর মেজাজ সে দিন জোর ভারী। তিন পয়সা পর্য্যন্ত ভারের দর উঠে পড়ত। এই জল বৎসরাবধি থাকলেও কোনরূপ নষ্ট হ'ত না,—একটা পোকাও দেখা দিত না, ফিল্টার করা কলের জল ৪৮ ঘণ্টা কুঁজোয় থাকলে জীবাণু ভূমিলতায় পরিণতা হয়। বাড়ীর মেয়েরা এবং ঝিয়েরা, একটা রাসায়নিক Germecide জানত, তার নাম ফট্‌কিরি, একটু গুঁড়িয়ে জলের ভিতর ফেলে দিলে অথবা বেণের দোকান থেকে এক পয়সার নির্ম্মালি ফল কিনে এনে ঘসে জলের ভিতর দিলে জলের সব কাদা কেটে তলায় জমে যেত; সে কাদাটুকু-ও কেউ ফেলতেন না, পেট ফাঁপলে বা প্রস্রাব বন্ধ হ'লে জালার তলার পাঁক একটু তলপেটে লাগিয়ে দিলে অল্পক্ষণেই উপশম হ'ত; এখনও বাড়ীতে যদি কারুর ও-রকম অবস্থা হয়, তা হ'লে যতক্ষণ না ডাক্তারখানা থেকে ইন্‌জেক্‌শন এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ ঐ রিজেক্‌সনটুকু ব্যবহার ক'রে দেখবেন দেখি।

দুঃখের জ্বালায় দেশের বাস্তু কুঁড়ে থেকে ছটকে বেরিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধানে কেউ কল্‌কাতায় এলে নিঃসম্বলে জীবিকা অর্জ্জনের প্রথম সুন্দর সোপান ছিল ঐ কুয়ার ঘটিতোলার কায। কোমরে একখানি আট হাতি ধুতি, কাঁধে একখানি আড়াই হাত গামছা, এই হ'ল ক্যাপিটাল। ভোর না হ'তেই পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে বেলা ১০৷১১টা পর্য্যন্ত "কুয়োর ঘটি তোলা" ডেকে বেড়াত। দড়ী ছিঁড়ে জলতোলা ঘটি, মেয়েদের আঁচলে রিংএ বাঁধা চাবি-গোছা, ছেলেদের পিতলের খেলনা, এই রকম একটা না একটা

জিনিষ, আজ আমার বাড়ী, কাল তোমার বাড়ী, পরশু ওঁর বাড়ী প্রায়-ই না প্রায় পাতকুয়ার ভিতর প'ড়ে যেত, আর বাড়ীর লোকেরা কুয়োর ঘটিতোলার ডাক শুনবার জন্য কান খাড়া ক'রে থাকতেন। ঘটিতোলা বাড়ী ঢুকে-ই পরণের কাপড়খানি রেখে কাঁধের গামছাখানি কোমরে জড়িয়ে বাঁ হাতের চেটোখানি কোষ ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াত, মেয়েরা হাতে এক পলা তেল ঢেলে দিতেন, ঘটিতোলা ডানহাতের আঙ্গুলে ক'রে দুই নাকে আর কানের ভিতর দিয়ে বাঁহাতের চেটোটা ব্রহ্মতেলোয় বুলিয়ে নিয়ে পাড় বেয়ে বেয়ে পাতকুয়ার নীচে গিয়ে মারত এক ডুব, আর আমরা ছেলেরা কুয়ার পাড়ের চারি ধারে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, মিনিটখানেক না যেতে যেতে সেই ঘটিতোলা ঘটি বা চাবির গোছা হাতে ক'রে ভুস ক'রে ভেসে উঠত, আমরা একেবারে হাঁফ ছেড়ে আহ্লাদে আটখানা, মজুরী ছিল ঘটি পিছু এক পয়সা, চাবির গোছা দু'পয়সা। বর্ষায় জল কাণায় কাণায় হ'লে বা পাতকুয়ার ভিতর বেশী পাঁক জমে থাকলে তিন পয়সা, চার পয়সা বা আরও কিছু বেশী দিতে হোত; বিশেষ দরকারী চাবি, সোনার আংটী, চরণচুটকি এই রকম সব দামী জিনিস উদ্ধার করতে পারলে বার আনা থেকে এক টাকা পর্য্যন্ত বকসিসের বন্দোবস্ত হোত। কুলজ্ঞ ঠাকুররা নির্ব্বংশ হয়েছেন নইলে বর্ত্তমান অনেক রায় চৌধুরী রায় বাহাদুরের ঘটিতোলা পূর্ব্বপুরুষ বা'র হয়ে পড়ত; কত নীচু থেকে কত উঁচুতে উঠা গেছে, একটা গর্বের পরিচয়, মনুষ্যত্বের কথা; কিন্তু এখন রাস্তায় রাস্তায় উকীল মোক্তার খরচা জমা দিলেই ডিফারমেশনের শমন। আমাদের পাড়ার ঘটিতোলা গুরুচরণ এই মনুষ্যত্বের—এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিল কি না, এই পাঁজির পাতা উল্টাতে উল্টাতে যদি আবার তার সাক্ষাৎ পাই, তবে অনুসন্ধান নেব।

আমাদের গুরুচরণ বললেম; ঘটিটা আসটা পাতকুয়ার ভিতর প'ড়ে গেলে সে বাড়ী ঢুকত, পাঁচমিনিটে কায সেরে চ'লে যেত, কথায় কথায় কি রকমে তার নামটা কানে ঢুকেছিল এইমাত্র পরিচয়, বাড়ীর সামনে দিয়ে নিত্য আওয়াজ দিয়ে যায়, তবু সে আমাদের ঘটিতোলা গুরুচরণ। তখন আমরা বাঙ্গালীরা ছোট ছিলুম, বড় হইনি, ভারত-প্রাণ হইনি, পল্লী-প্রাণ ছিলুম, তাই পাড়ার মুদী ছিল আমাদের মুদী, পাড়ার মুড়িওয়ালা আমাদের মুড়িওয়ালা, পাড়ার কাঠওয়ালা সোনাউল্লা[৫] আমাদের সোনাউল্লা, পাড়ার পাল্কীবেহারা উড়ে আমাদের ভাগবৎ সর্দ্দার; নিত্য যে দাড়ীওয়ালা লোকটি চানাচুর হেঁকে যেত, সে আমাদের চানাচুরওয়ালা,

জয় রাধাকৃষ্ণ ব'লে বাটি হাতে যে স্ত্রীলোকগুলি ভিক্ষা করতে বাড়ী আসতেন, তাঁরা আমাদের বৈষ্ণবী, বসন্তকাটা মুখ একটি দীর্ঘাকৃতি অন্ধ লাঠিহাতে বেলা ৮টার সময় আমাদের দোরের সামনে দিয়ে "হে দীননাথ, হে মধুসূদন" ব'লে ভিক্ষা করতে করতে চ'লে যেত, দুদিন তাকে না দেখলে জিজ্ঞাসা করতেম, "দাদা, দীননাথের কি ব্যামো হয়েছে, দুদিন তাকে দেখিনি কেন?" এইরূপ পল্লীর ভিতর বা বাড়ীতে প্রায় নিত্য যাদের দেখতেম, কি ইতর কি ভদ্র, তারা ছিল আমাদের আপনার লোক। হা রে ক্ষুদ্র মন! 'লঙ্কাতে রাবণ ম'ল, বেউলা কেঁদে ব্যাকুল হ'ল' ভারত-ভক্তির এ বীজমন্ত্র আমি কি ঠাকুরদা কেহ-ই শিক্ষা করিনি।

২

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো—" প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম বচনগুলি আউড়ে "সুপ্রভাত" "সুপ্রভাত" ব'লে বিছানা ছেড়ে উঠে দাদা দরজা খুলে দেখে বল্‌লেন, "ইস্‌, আকাশে মেঘ করেছে, জলও একটু একটু পড়ছে, টিকে-ও ফুরিয়ে গেছে, শোলা-ও নেই, মুস্কিল করলে, বাদলায় এরা বেরোবে কি না, বুঝতে পারছি না।" আমি দাদার পৌত্র,[৬] কিন্তু গুড়ুকখোর হিসেবে দাদা আমার বাবার বাবা ঠাকুরদাদা ছিলেন। তখন বিলিতী দেশলাই ওঠেনি, কোক কয়লার নাম-ও তখন কেউ শোনেনি; সুঁদরি কাঠের জ্বালে রান্না হ'ত। সোঁদরবন থেকে নৌকায় সুঁদরির গুঁড়ি চালান হয়ে বেলেঘাটায় এসে তা লাগত, সেইখানে-ই ছিল সুঁদরি কাঠের বড় আড়ত; পাড়ায় পাড়ায় খুচরা কাঠের দোকান ছিল; সেই মুসলমান দোকানদাররা আর পাকা গৃহস্থরা আড়ত থেকে গাড়ী-দরে সুঁদরির গুঁড়ি কিনে এনে তার সরু মোটা চেলা করিয়ে দোকানদাররা বেচত, আর গৃহস্থরা মজুত রেখে খরচ করত। সেই গুঁড়ি চেলা করত উড়েরা; বড় বড় কুড়ুল দু'মুড়োয় দু'জন দাঁড়িয়ে গুঁড়ির উপর পর্য্যায়ক্রমে কোপ মারত; আজকালকার দিন হ'লে সেই কাঠচেলানকে আমরা একটা আর্ট বললে-ও বলতে পারতুম। তখন উড়িষ্যাবাসীদের কলকেতায় প্রধান কায ছিল গুটি চার পাঁচ;—বাঁকে ক'রে জল তোলা, কাঠ চেলান, স্নানের ঘাটে ছেলেমেয়েদের ছাপা পরান, সাহেবদের খিজমদগারী। ছাতা ধ'রে আফিস পৌঁছানটা তখন উঠে

গেছে, কিন্তু পাল্কী বওয়ার চলনটা খুব-ই ছিল, কারণ, কালীঘাটাদি দূরস্থানে যাওয়া ভিন্ন মেয়েদের গাড়ী চড়াটা তখন বিশেষ মর্য্যাদার কথা ছিল না ; অনেক বাবুও নিজের পাল্কী চ'ড়ে কুঠী যেতেন, সাহেবরা-ও অনেকে পাল্কী চড়তেন ; কোন কোন তাজা সাহেব জাহাজ থেকে চাঁদপাল ঘাটে নেমে-ই পালকীর ছাতের উপর চ'ড়ে বসতেন, দু'শ লোক বুঝিয়েও তাঁদের ভিতরে ঢোকাতে পারত না। আর আজ কলকাতা সহর যুড়ে ব'সে গেছে উড়ে। এ'রাই এখন ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা, কারখানায় কারখানায় বিশ্বকর্ম্মা। সে ঝুঁটি খোঁপা নাই, শালপাতার ধোঁয়াপত্র নাই, তালপাতার ছাতা নাই, এখন "দেখে ঘাড়ছাঁটা টেরিকাটা বিবরে লুকায় বাবু," তামাক চলে রূপো বাঁধান হুঁকায়, ঝাঝরি বেলন হাতে ট্রাম চ'ড়ে যান লুচি ভাজতে।

সুঁদরি কাঠে রান্না হ'ত বলে তার-ই আগুন মালসাভরা প্রায় বাড়ী বাড়ী থাকত, তাইতে পুরুষদের তামাক খাওয়ার সুবিধা হ'ত ; শীতকালে মেয়েরা সকাল-সন্ধ্যায় মালসার চার ধারে ব'সে আগুন পোয়াতেন, ছেলেরা গুলিআলু বা কাঁঠালবীচি পেলে সেই আগুনে পুড়িয়ে খেত, আর প্রদীপ জ্বালবার দরকার হ'লে মেয়েরা গন্ধকের দেশালাই সেই আগুনে ঠেকিয়ে আলো ক'রে নিত। গন্ধকের দেশালাই গৃহস্থের মেয়েরা নিজেরা-ই প্রস্তুত করতেন ; কালীপূজার আজিপুঁজি করবার জন্য পাকাঠী কেনা হ'ত, পাকাঠী ভেঙ্গে দুচির ক'রে আঙ্গুল আন্টেক কাঠির দু'দিক ঐ আগুনের মালসায় বসান একখানা খুরীতে গলান গন্ধকের উপর ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিতেন ; বাসাড়ে লোক দেশালাই কিনতেন ফেরীওয়ালার কাছে ; পরিস্কার কাপড় পরিস্কার মেরজাই জরি-বসান বাহারে টুপি প'রে দেশালাইওয়ালারা বেলা ৯টা সাড়ে ৯টার সময় "লে—দেশ্লাই" ব'লে রাস্তা দিয়ে হেঁকে যেত। দেশালাইওয়ালা তখন সহরের একটি বিশিষ্ট চিত্র-ই ছিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে কাঁসারী-পাড়ার সংএ যে প্রাচীন ভদ্রলোকটি দেশালাইওয়ালা সাজতেন, তাঁর গায়ের পোষাক ও হীরেমতি সোনার গয়নার দাম অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার টাকার হবে। বেশি রাত্তিরে টাত্তিরে তামাক খাবার ইচ্ছা হ'লে অথবা মালসায় আগুন না থাকলে লোককে চকমকির সাহায্য নিতে হ'ত। শুধু আমার দাদা নয়, প্রায় সকলেরই ঠাকুরদাদা বা জ্যেঠা মহাশয়ের এক একটি চকমকির আধার ঘরে থাকত ; মাটীর গোল বা বাদামে ধরণে গড়া, ভিতরে গুটি তিনেক খোবর, এক খোবরে খানিক

তামাক, অন্য খোবরে খানকতক টিকে, মাঝখানে চকমকির পাতর, কতকটা জাঁতির ধরণে গড়া একখানি ইস্পাতের পাত আর খানিকটা মুখ পুড়িয়ে রাখা শোলা। দাদার কি হাত দোরস্ত-ই ছিল, বাঁহাতে শোলাটি ধ'রে তার উপরে দু' আঙ্গুলে ধরা পাতরখানির উপর ডান হাত দিয়ে ইস্পাতের এক ঠোকর, আর ফিনকিটি শোলার উপর পড়েই ধ'রে উঠল, তারপর তাই থেকেই টিকে ধরিয়ে নেওয়া। এই মেহনত ক'রে তামাক সেজে হুঁকোয় হুঁকোয় তামাক চালাচালি ক'রে একত্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নবশাক সকলে মিলে আনন্দ ক'রে এক সঙ্গে ধূমপান; আর এখন চুরোট বিড়ি সিগারেট, একালসেঁড়েমির ফার্ষ্ট রেট; মুখামৃতসিক্ত ধূমশলাকা শ্যালককুলতিলকের মুখে-ও তুলে দেওয়া যায় না।

"টিকে লেও!"—বাঁচা গেল, দাদার একটা ভাবনা ঘুচে গেল, টিকেওয়ালা বেরিয়েছে; কিন্তু, বৃষ্টি একটু বাড়ল, বাতাসটা তার চেয়েও একটু বেশী, তবু মাখমওয়ালা দু'পাত মাখম বাড়ীতে দিয়ে গেল; এখন যেমন চা চলেছে, তখনকার ভদ্রলোকের একটা চাল ছিল, ভিজে ছোলা, আদা ও মাখম-মিছরি খাওয়া। ক্রমে "সরাগুড় তিলকুটো সন্দেশ মুকুন্দমোয়া" ডেকে গেল, "বাত ভাল করি, দাঁতের পকা বার করি" বলতে বলতে বেদেনীও বাজারের দিকে গেল, "হে দীননাথ, হে মধুসূদন, এই অন্ধকে কিছু দাও" ব'লে আমাদের পরিচিত দীননাথ দাতার মনে দয়া জাগিয়ে দিয়ে চল্লো, "মাজনমিশি মাথাঘসা"র চুবড়ি কাঁকে মুসলমান বুড়ি-ও চেঁচিয়ে গেল, যখন বেলা প্রায় সাড়ে ৮টা, "রিপুকর্ম্ম" "চাই ঘোল" ডেকে যাচ্ছে, বলদেরা বলদের পিঠে ছালা চাপিয়ে এর একটু আগে-ই চ'লে গেছে, তখন বাড়ীতে কথা উঠল, একি ঝড় হবে নাকি? সে দিন প্রথম ছুটী সুরু, আফিস স্কুল বন্ধ; সুতরাং রান্নার ততটা তাগাদা ছিল না, একটু দেরিতে-ই উনান ধরান হয়েছিল। ভাতের তোলো নেবেছে, ডাল ফুটচে, দোপাকা উনানের আর এক মুখে চর্চ্চড়ির কড়াখানি চুড়বুড় করছে, বেলা প্রায় ১০টা, সেই সময় ঝড়ের এমন একটা দমকা এল যে, আমাদের উঠানের নারিকেল গাছটা যেন জাহাজের মাস্তুলের মত দুলতে লাগল, ঘরগুলো সব কেঁপে উঠল। তখন সকলের-ই মুখে "দুর্গা দুর্গা! মা, এ কি করলে! পরশু যে তোমার পুজো মা, এ কি করলে!" আর—এ কি করলে! মা তখন রণরঙ্গে মেতে উঠেছেন, দশভুজের আস্ফালনে একেবারে বিশ্ব তোলপাড় ক'রে দিচ্ছেন। দমকার উপর দমকা। গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ একটা ভয়ানক আওয়াজ! সেই

আওয়াজ আর একবার শুনেছিলুম তিন বছর পরে কার্ত্তিকের ঝড়ের রাতে ;[৭] আর সেই দানব-সঙ্গীতের সা রে গা মা ভাঁজা শুনেছিলুম প্রায় মাস তিনেক ধ'রে যখন আমি যৌবনকালে বছর খানেক ছিলুম পোর্ট ব্লেয়ারে (বেড়ী পরবার সৌভাগ্য হয়নি)। রাস্তায় জনমানব নেই, যাঁরা সে দিন পুজোর বাজার করবেন মনে করেছিলেন, তাঁরা ঘরে ব'সে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। যাঁরা বড় বড় নৌকা ক'রে বড় বড় গঙ্গা জলের জালা, পুজোর প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যসম্ভার, কেহ কেহ বা স্ত্রীপুত্র পরিবার পর্য্যন্ত সেই নৌকায় তুলে দিয়ে দুতিন দিন পূর্ব্বে দেশের উদ্দেশে রওনা ক'রে দিয়েছেন, এই অভূতপূর্ব্ব ঝড়ের সময় তাঁদের মনের ভাবকে ভাবনা বললে কিছুই বুঝায় না। রাস্তায় চালের খোলা উড়ছে, চাল উড়ে যাচ্ছে, পাঁচীল বারান্দা কোথাও কোথাও হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে, ডাক্তারখানার প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝড়ে উড়ে এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় গিয়ে পড়ছে, আর কোথায় যে কার কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা নিজের নিজের ঘরে খিল দিয়ে ব'সে কে কি ক'রে বলবে ?

এই রকম কাণ্ড চললে বেলা চারটে অবধি, তারপর বাজীকর বললেন, ফুস মন্তর যা ঝড় উড়ে যা। অমনি সব স্থির, কোথায় বা বৃষ্টি, কোথায় বা বাতাস, পশ্চিম আকাশে ঢ'লে পড়া সূর্য্য দেখা দিলেন। এর আগে ঘণ্টা পাঁচেক ধ'রে যে হুড়োমুড়ি চ'লে গেল, তার কিছুই নেই। চারটের পর চারদিকের দেওয়াল-পড়া ইট কাঁকর ছড়ান ছাতে উঠে গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখি যে, যেন একেবারে মাস্তুলের বন। দু'দশখানা মাস্তুলওয়ালা জাহাজ তখন শালুকের ডকে মেরামত হ'তে আসত মাত্র, নইলে কালীপন ঘাট, বড় জোর কয়লা ঘাট, তার উত্তরে কি বড় জাহাজ, কি ছোট স্টীমার বড় একটা দেখা যেত না ; আহিরীটোলার ঘাটে বাঙ্গালীর একখানা পেরো জাহাজ দিন কতক হয়েছিল, সেটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ ব'লে বাড়ীর লোক ছেলেপুলেদের দেখাতে নিয়ে যেত, এই অবস্থায় বাগবাজার কুমারটুলীর সব ঘাটে বড় বড় জাহাজের গাদি লেগে গেছে দেখে লোক একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ব্যাপারখানা হয়েছিল এই, ঝড়ের তাড়সে গোটাকতক সমুদ্রের ঢেউ বড় গাঙ্গে ঢুকে প'ড়ে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সরকারী হিসাবে ঐ সাবডিভিসনে বিশ হাজারের উপর লোক ঐ ঝড়ে বন্যায় ভেসে যায়, গরু বাছুর ছাগল প্রভৃতি যে কত গিয়েছিল, তার সুমার হয়নি ;

ঘর-দোরের কোথাও কোন চিহ্নও ছিল না, সেই ঢেউ কলকাতার কাছে এসে মোটা মোটা শিকলি ছিঁড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ ষ্টীমার স্লুপ গাধা-বোট ভড় পানসী ভাউলে সব ডুবিয়ে ভাসিয়ে ছাড়িয়ে ফেলে দেয়। পরদিন বৈকালে বাবার সংগে গাড়ী ক'রে গিয়ে দেখি যে ইডেন গার্ডেনের কাছে রাস্তার উপর এক প্রকাণ্ড জাহাজ, আরও ঐ দিকে রাস্তার উপর একখানা জাহাজ দেখেছিলুম, কোন্খানটায়, তা ঠিক মনে নেই। ডাংগার লোকের ত ক্ষতি-কষ্ট খুবই হয়েছিল, কিন্তু জলে যারা ছিল—দাঁড়ী মাঝী চড়নদার সেলার অফিসার—এ বেচারীদের যে কষ্ট, যে ক্ষতি, তার আর সীমা ছিল না। আবার শুনেছি, এক জনের সর্ব্বনাশে আর এক জনের পৌষ মাস হয়ে গিয়েছে। কাঠপাড়া থেকে টাকা-গয়নাভরা সিন্দুক বরুণঠাকুর আপনি মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাটপাড়ায় সরকারদের কুঁড়েয় তুলে দিয়ে এসেছেন, এই রকম অনেক যায়গায়।

তিন বৎসর পরে কার্ত্তিকে ঝড় রাত্রিকালে হওয়ায় কলকাতায় মানুষ অনেকগুলি মারা গিয়েছিল, আশ্বিনে ঝড়ে বড় তা হয়নি। একে পুজোর বাজার, তার উপর ঝড়, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দারুণ বেড়ে উঠল। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, ভাল পুরানো বালাম চাল তিন টাকা মণের উপর-ও উঠেছিল, পাকা রুইমাছ ছ'আনা, সাত আনা সের পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিল; এই হারে খাদ্য, পরিধেয় তখনকার হিসেবে দামে আগুন হয়ে সাধারণ লোককে বড়ই কষ্টে ফেলেছিল। গৃহস্থিতে আট দশ জন সমন্বিত পরিবার যেখানে মাসিক ৪০টাকা আয়ে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-প'রে দু'জন উপরি দু'দিন এলে তাদেরও অন্ন দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে চলত, তাদের একটু কষ্টে পড়তে হয়েছিল। বেশী লভ্যমান হয়েছিলেন গাধাবোটের মালিকরা, ঘরামীরা আর রাজমজুররা। যে গাধাবোটের ঘাট ছিল দৈনিক ২॥০ টাকা কি ৩ টাকা, তাই দাঁড়িয়েছিল ৮০/৯০ টাকা, এক বৎসর পর্য্যন্ত ৪০/৬০ টাকার নীচে নামেনি।

৩

ছিঁচকাঁদুনে বদনাম থাকলে-ও বাংগালী যেমন চট্ ক'রে নিজের চোখের জল মুছে অভ্যস্ত কাযে নিযুক্ত হতে বা অন্যের আনন্দে যেমন সহজে যোগ দিতে পারে, অন্য কোন জাতি তা পারে কি না সন্দেহ। বাংগালার গৃহিণী

সদ্যোমৃত পুত্রের শোক চাপা দিয়ে শ্বশুর-স্বামীর জন্য রাঁধতে ব'সে যান, একান্নবর্ত্তী পরিবারের কিশোরী বিধবা বাড়ীতে বিবাহ হ'লে অন্যের বাসরে ব'সে নবদম্পতির আনন্দ, বর্দ্ধন করতে পারে, শ্মশানঘাটের ফেরৎ বাবু ঠিক আপিস এটেণ্ড করে, তা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড় বাবুরা জানেন। এ দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, আনন্দময়ীর আগমনে কেউ নিরানন্দ থাকে না, তার কারণ যে, ব্যক্তিগত দুঃখের বোঝা হাটে নামিয়ে কেহ-ই জাতীয় আনন্দোৎসবে নিরানন্দের সৃষ্টি করতে চায় না। সাধারণতঃ পঞ্চমী-ষষ্ঠীর দিন-ই সহরের বাইরে থেকে বেশী সংখ্যায় ঢাকী ঢুলী এসে কলকেতায় জড় হয়, চতুর্থীর দিন আসে বটে, কিন্তু তত অধিক নয় ; এবারে মহাপঞ্চমীর প্রলয়ের দিন কেউ আর বাড়ী থেকে বেরোতে পারেনি, সুতরাং ঢাকী ঢুলী-ও কলকেতায় বেশী দেখা দেয়নি কিন্তু ষষ্ঠীর সকাল থেকে-ই বড় বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাদ্যকরের আড্ডা ব'সে গেল ; যাদের নায়ক বাড়ী বাঁধা আছে, তারা সরাসর যে যার জায়গায় পৌঁছে, ঢাক ঢোল কাড়া-নাগড়া জগঝম্প ট্যামটেমী তাসা টিকাড়া দামামা কাঁসি বাঁশী সানাই বাজিয়ে গিজদা-গিজোড় গিজদা-গিজোড় আওয়াজে আগমন-সংবাদ ঘোষিত ক'রে দিলে। আবার রাস্তায় সকালে শাঁখাওয়ালা সিঁদুরওয়ালা মধুওয়ালা বার হ'ল ; আবার "ধনে সরষে লেবে গো" বেরুলো, মধ্যাহ্নে আনরপুরে দইওয়ালারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধামা মাথায় "চাই শুকো দই" হাঁকতে লাগল। তারা এক পয়সায় এক মালসী দুই মালসী দই দিত, মালসী উপুড় ক'রে দেখাত যে দই ভুমে পড়ে না। এক পয়সার এক মালসীতে দুজনের বেশ দুপাত ভাত মেখে খাওয়া চলত, আবার মালসীর তলায় একটু অম্বলের জন্য-ও থাকত, এখন এক পয়সার দই কিনতে গেলে ছেলেপুলে হ'লে "যা যা" ব'লে তাড়িয়ে দেয়, বয়স্ক লোক হ'লে মুখপানে চেয়ে একটু মুচকে হাসে। বেলা ৩টায় বেরুল মুসলমান ফিরিওয়ালা, "বিলিতি চুড়ি চাই, কাচের খেলনা চাই সাবান চাই" ব'লে ; জয়ের পুতুল বেণে পুতুল বিক্রয়কারিণীরা বাড়ীর ভিতর ঢুকে-ই দেশী মাটীর পুতুল গছিয়ে যেত, চাচারা বেচত বিলিতী চীনে মাটীর পুতুল, আর সাবান তখন সচরাচর গৃহস্থলোক বাড়ীতে কারুর পাঁচড়া হ'লেই কিনত। তবে পুজোর সময় একটু হাতে মুখে মাখবার জন্য বিয়ের বয়সী মেয়ে ও ছোট ছোট বৌরা একটু একটু আব্দার ধরত। তবে বেলোয়ারী চুড়ী পরার রেওয়াজটা খুব জাঁকিয়ে উঠেছিল। পুরুষমানুষের, বিশেষ

ছেলেদের পুজোর সময় যেমন নূতন জুতো কিনে পায়ে দিতে-ই হবে, পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিন তেমনই মেয়েদের বেলোয়ারী চুড়ী চাই-ই চাই, তা যাঁর হাত সোনার বাউটী বাউড়ী খাড়ু প'ইছে মরদানা নারকেল ফুল মুড়কী মাদুলী দিয়ে মোড়া, তাঁর-ও। বাবা কাকা দাদারা ভাই ভাইপো ছেলে সংগে ক'রে নতুন জুতো কিনতে বেরুলেন। ঠিক বিডন গার্ডেনের সামনে চিৎপুর রোডের পশ্চিম ধারে সারি সারি লম্বা হিন্দুস্থানী মুচিদের জুতোর দোকান ছিল, তারা বুরুষ-করা বার্ণিস-করা ফিতেওয়ালা সিংগেল স্প্রিং ডবল স্প্রিং জুতো তৈরী ক'রে দোকানের সামনের লহরের উপর শুকাতে দিত। বড় পায়ের ব্যবহারসই ভাল জুতো ৯ আনা হ'তে ১।০ সিকে ১॥০ টাকার মধ্যে সচরাচর বেশ কেনা যেত, তবে পুজোর সময় দুচার আনা দর অবশ্য বেড়ে যেত। তখনকার একশো দেড়শো টাকা মাস মাইনের চাকরেরা-ও ঐ জুতো ব্যবহার কত্তেন। তবে তখনকার একশো দেড়শো টাকা আয়ে লোকের যা সঙ্কুলান হ'ত, এখন ৫।৬শো টাকা আয়ে তা হয় কি না সন্দেহ। মেছোবাজার থেকে শুঁড় উল্টান রংগিন পাতর-বসান জরির জুতো পরা তখন-ও ছেলেরা ছাড়েনি, তবে "তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি" কেটে গেলে জরির জুতো পরতে অনেক ছেলের-ই লজ্জা করত, তাই তাদের লালবাজারের মোড়ে বা চাঁদনীতে নিয়ে গিয়ে একরংগা বা দোরংগা চামড়ার রপাট (রবার) লাগান বোতাম-বসান জুতো ১০।১২ আনা খরচ ক'রে দিতে হত; একটু স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা কসাইটোলার (বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট) চীনের বাড়ীর চকচকে বার্ণিস করা ফিতে বাঁধা টিকিটমারা জুতো ১৸০ থেকে ২॥০ টাকার ভিতর-ই কিনে দিত। স'বাজার, নতুন বাজার, বৌবাজার, বড়বাজার এই সব জায়গায় কাপুড়ে পটিতে যেমন বছর বছর ভিড় হয়, তেমনই ভিড় চলছে। ৫৭ সালের মিউটিনির পর ঢাকার তাঁতিরা সিপাইপেড়ে সাড়ী-ধুতির ফেশান বার করে, ৬৪তে সে সব একেবারে লোপ পায় নি, ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তখন-ও সিপাইপেড়ের আদর আছে, একটু বড় হলেই ঢাকাই বা শান্তিপুরে ফুলপাড়, তখন ঢাকাই কালাপাড় ফালাপাড়ের সৃষ্টি-ই হয়নি, কালাপাড় পরতে গেলে-ই সিমলা বা ফরাসডাংগা অথবা অন্যান্য আড়ংগের নানারকম পাড়, গুলবাহার উড়ানি, ডুরে উড়ানি, শান্তিপুরে জরিপাড় উড়ানি কল্কে উড়ানি। মেয়েদের জন্য কস্তাপেড়ে শাড়ী, নীলাম্বরী, জলমএয়স্ত্রী ডুরে, বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়ী, ঢাকাই গুলবাহার, শান্তিপুরে কল্কাদার এই সব বাছতে বাছতে দোকানদার খদ্দের দুজনের-ই মাথা

ঘুরে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর গায়ে দেবার যোগ্য তৈয়ারী জামা তখন ছিটের বা রঙ্গিন মেরুণোর এক চাঁদনী বা বড়বাজারেই কিছু কিছু পাওয়া যেত, কামিজের রেওয়াজ বড় ছিল না, পাঞ্জাবীর নাম তখন কেউ শোনেওনি ; মেয়েরা তখন জামা গায়ে দিতেন না, ছেলের-ই হোক বা বড়র-ই হোক, পিরান বা চায়না কোটের দরকার বা সখ হ'লে দেশী মুসলমান দরজীকে কাপড় কিনে তৈরী করতে দিতে হ'ত, সাধারণতঃ ২।৩ মাসের ভিতর তৈরী হয়ে এলে বেশ শীগ্‌গির শীগ্‌গির দিয়েছে মনে হ'ত ; এখন বৌবাজার পটলডাঙ্গা শিমলে হাতীবাগান জোড়াসাঁকো এই সব পুরনো নাম বদলে বড় জামাবাজার, মেজো জামাবাজার, সেজো ন' জামাবাজার নাম দিলে বে-মানান হয় না। বাঙ্গালী এণ্ড কোং-দের কল্যাণে পুরানো দার্জ্জিদের নবাবী মর্জ্জির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে বটে, ৬ ঘণ্টার অর্ডারে এখন বেলদার পাঞ্জাবী তৈরী হয়ে যায়, কিন্তু বঙ্গ-অঙ্গের ঘেরাটোপ তৈরীর এই মহাধুমধাম দেখে মনে হয় না কি যে, ফতোনবাবী বা ফাঁপিস-নেসটা বড্ড বেড়ে উঠেছে। বিয়ের আগে এক একটি মেয়ের পেনি থেকে আরম্ভ ক'রে বডিস, ব্লাউজ, জ্যাকেট প্রভৃতিতে যা খরচ পড়ে, তাতে অনায়াসে দুখানা কনে-গয়না তৈরী হয়ে যায়।

৪

দুর্গোৎসব বাঙ্গালার জাতীয় উৎসব। বর্ষায় ডুব দিয়ে নেয়ে উঠে আশ্বিনে যেন বাঙ্গালী গা-মাথা মুছে নতুন কাপড়চোপড় প'রে আবার নবীন জীবনের কাযে লেগে যায়। আশ্বিনে বাঙ্গালী মহাশক্তিকে আনন্দময়ী নামে উদ্বোধিত ক'রে আপন আপন সংসার মধ্যে আপন আপন হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করেন। বাঙ্গালী পিতামাতা দেবীকে দূরে শূন্যে নিরাকাররূপে কল্পনা করিয়া ভূমিষ্ঠ-প্রণামে পরিতুষ্ট হয়েন না। মাকে প্রতিমায় মূর্ত্তিমতী করিয়া মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিতা করেন এবং সেই মূর্ত্তিতে আপনার পতিগৃহবাসিনী প্রিয়তমা কন্যাকে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা জ্ঞানে অপত্যস্নেহের আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়েন। উপাসক কেবল পরকালে মুক্তি ও ইহকালে জয়কামনায় দেবীর সম্মুখে নৈবেদ্য-ভোজ্যাদি নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব, স্বজাতি, বিজাতি, আহূত অনাহূত সকলকে না ভোজন করাইলে তাঁহার

আনন্দের বাজার অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই প্রলয়কারী আশ্বিনে ঝড় কত জাহাজ ডুবাইল, কত হর্ম্ম্য ভূতলশায়ী করাইল, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণের প্রমোদ-চালার একটি খড়-ও ঐ ঝড়ে নড়িল না।

কলকাতার সব পূজোবাড়ীতে যেমন ধূমধাম, বিদায়-আদায়, নৈবেদ্যবলি, পাঁঠাবলি, ভোগবলি, প্রসাদ-বিতরণ, ভুরিভোজন, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, যাত্রা গান নাচ যেমন হয়, তেমন-ই হ'ল। সে সময় কলকাতায় একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁর বাড়ী, ভোজন করেন কুমারটুলীর অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী,[৮] আর রাত্রি জেগে নাচ দেখেন স'বাজারের রাজবাড়ীতে। শিবকৃষ্ণ দাঁর মত অমন পরিপাটী ঠাকুর সাজান আর কোথাও হ'ত না, এখনও বোধ হয়, একেবারে তা উঠে যায়নি, তবে সাবেক লোকের সঙ্গে সাবেক ভাব-ও গিয়েছে, একটি শিবরাত্তিরের সলতে যথাসাধ্য নিয়ম রেখে চলচেন। কিন্তু অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী একেবারে ধূধূ। এখনকার কুমারটুলীর লোক আর অভয়চরণ মিত্তির, ভৈরব মিত্তির, বনমালী সরকার নাম করলে কিছু বুঝতে পারে না; "এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে, বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" পাল মশাই, কুণ্ডু মশাইরা এখন ওখানে দণ্ডধর, সিংহাসন পরিপূর্ণ; কিন্তু রাজকার্য্যের কোন চিহ্ন-ই নেই, তবে কবিরাজ মশাইরা এখন-ও গঙ্গাতীরস্থ ঐ পল্লীর গৌরব কতকটা বজায় রেখেছেন; স্বনামধন্য স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের[৯] পূতচরিত্র পৌত্র গিরিজাপ্রসন্ন এখন-ও পূজার সময় বহু ক্ষুণ্ণ জনকে প্রসন্ন করেন। কিন্তু ঐ ১২৭১ সালে-ও অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা একটা দেখবার জিনিষ ছিল, সাধারণ ঠাট বাঁধা কাঠামোয় মিত্তিরদের বাড়ীর প্রতিমা প্রস্তুত হ'ত না। দোলচৌকীর ধরণে কাঠের একখানা সুসজ্জিত সিংহাসন ছিল, যাতে "সিংহশিখী মূষাপৃষ্ঠে সপুত্র পার্ব্বতী" আর দক্ষে বামে লক্ষ্মী সরস্বতীর আলাদা আলাদা পুত্তলী প্রতিষ্ঠিত হ'ত; সিংহাসনের উপরিভাগে মহাদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি-ও স্থাপিত হ'ত; দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি মূল্যবান বস্ত্রপরিহিতা ও আসল স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারে ভূষিতা; বিজয়া হ'ত সুসজ্জিত পাল্কীতে প্রতিমাগুলি আলাদা আলাদা জলে দিয়ে। দালানে প্রতিমার একপাশে মায়ের শয়নের জন্য মূল্যবান শয্যাবিন্যস্ত পর্য্যঙ্ক থাকত, আর মায়ের মুখপ্রক্ষালনের জন্য রূপার গাড়ু ঘটি গামলা ইত্যাদি। কিন্তু সবার চেয়ে দেখবার জিনিষ ছিল যা কোথাও হ'ত না বা আর কোথাও

হবে ব'লে মনে হয় না ;—রচনা আর মিষ্টান্নসজ্জা। দুর্গোৎসবের সময় বাটীর প্রাঙ্গণে একটা রচনা টাঙ্গাবার পদ্ধতি আছে। বছর কতক আগে জোড়াসাঁকোর প্রতাপ ঘোষ মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি শাস্ত্রমতে দুর্গোৎসব করতেন ও প্রাঙ্গণে ঐ রচনা বিন্যাস-ও করতেন। রাসের সময় যেমন রাসমঞ্চের সামনে একটা জাল খাটিয়ে তাতে নানাবিধ রঙ্গিন শোলার ফুল মাছ পাখী ইত্যাদি টাঙ্গিয়ে ইন্দ্রজাল রচনার প্রথা আছে, তেমন-ই দুর্গোৎসবের সময়ে মণ্ডপের সামনে অঙ্গনে একটা রচনা খাটাতে হয়, তাতে মাটীর নয়, শোলার নয়, আসল স্বভাবজাত ফলমূল ফুল, যেমন—কাঁদিসুদ্ধ নারিকেল, কলা, মোচা, লাউ, কুমড়া, বেল, আখ, নেবু, ডালিম আর যেখানে যত ফলফুল পাওয়া যায়, সব টাঙ্গায় আর সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টান্ন তৈরী করে-ও টাঙ্গাবার পদ্ধতি আছে। অভয়চরণ মিত্তিরের বাড়ী যত রকম ফলফুল পাওয়া যেত, তা ত খাটান হ'ত-ই, তার পর মিষ্টান্ন, এক একখানা জিলিপি যেন এক একখানা গরুর গাড়ীর চাকা, গজা নয়, যেন এক একখানা বারকোষ, মতিচুর এক একটা বড় কামানের গোলা, এই রকম সব। দালানে মায়ের দু'পাশে দু'খানা থালা পাতা হ'ত, তাতে উপরি উপরি মিঠাই সাজান হ'ত—একেবারে মেঝে থেকে আরম্ভ ক'রে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকত। বর্ত্তমান পাঠকের জন্য আমি 'হ'ত' 'ঠেকত' লিখলুম, কিন্তু আমি নিজে যেন ষাট বছর পেছিয়ে গিয়ে অবাক্ বালকচক্ষুতে দেখছি, সেই নীচের থাকে কাশীর কলসীর মত এক একটা বড় বড় মেঠাই, তার উপর থাকে তার চেয়ে একটু ছোট, এমনি আকৃতিতে কমে কমে চূড়ায় একটি আগমণ্ডা আকারে একটি ছোট মেঠাই, এঁদের গুরুর বাড়ী ছিল শ্যামপুকুরে, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে মহাষ্টমীর দিন সেখানে মহানৈবেদ্যখানি যেত। একটা বড় বাঁশের মাঝখানে নৈবেদ্যের থালাখানি ঝুলিয়ে দু'জন দু'জন ক'রে চার জন বেয়ারায় নৈবেদ্যখানি ব'য়ে নিয়ে যেত ; নৈবিদ্যির মাথার উপর যে একটি আগমণ্ডা সাজান থাকত, সেটির ওজন ১০।১২ সেরের কম নয়, চালের ওজনটা অঙ্কবিদ্রো খতিয়ে নেবেন।

স'বাজারের রাজাদের উত্তর দক্ষিণ দু'বাড়ীতে এখন-ও পূজো হয়, কিন্তু ধূমধাম যা তা রাস্তায়, ভিতরে ধাম আছে, কিন্তু ধূম নেই, তবে যদি সিগারেট বা বিড়ির ধূম বলেন ত সে স্বতন্ত্র। কিন্তু ৭১ সালে-ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ক'মে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু রাজারা তখনও রাজা ছিল। কৃষ্ণা নবমীতে এঁদের

বাড়ী বোধন বসে, সেই দিন থেকে দু'বাড়ীতেই নাচ আরম্ভ, শেষ মহানবমীতে। পঞ্চমী অবধি উপরের নাচঘরে-ই মজলিস, ষষ্ঠীর দিন বন্ধ, পূজার তিন দিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই উঠোনে। বোধনের ক'দিন যে ইচ্ছে সে বাইনাচ দেখতে যেতে পারে, পূজোর তিন দিন টিকিট না দেখালে ঢোকবার যো নেই, আর রাজার বাড়ীর একখানি টিকিট পাবার জন্য কত হাঁটাহাঁটি, কত সাধ্যসাধনা। আর রাজার বাড়ী লেগে যেত সাহেব-মেমদর্শকের ভিড়। আজকাল ছুটী পেলে নিজের বাড়ীর পূজো ফেলে-ই বাবুরা হিল্লী দিল্লী কিষ্কিন্ধ্যা দার্জ্জিলিং ছোটেন, তা সাহেবদের কথা বলব কোন্ মুখে। কিন্তু তখনকাব সাহেবরা পূজোয় আমোদ করত, আমাদের সঙ্গে একটু বেশী মেশামেশি-ও করত ; অনেক বড় বড় সাহেব-ও রাজার বাড়ীতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণপত্র পাবার জন্য পরিচিত অন্য সাহেবের বা বিশ্বস্ত বাবুদের সুপারিস ধরতেন। সাদা মুখের শোভায় রাজবাড়ীর উঠানে পদ্মফুলের মালা ফুটে উঠত আর আমরা কাল কাল অলিরা আশেপাশে ঘেঁষে ঘুঁষে গুঞ্জন করতুম। সাহেবদের জন্য একটু শেরি শ্যাম্পেন ব্র্যাণ্ডি বিস্কুট থাকত বটে, ভাগ্যবান দু' দশ জন বাঙ্গালী প্রসাদ-ও পেতেন ; কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার বেলা নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীদেব ভাগ্যে ফক্কা, আর অ-টিকিটী ভদ্রলোকের পক্ষে গলাধাক্কা। তবে পূজার পর রাজারা নিমন্ত্রিতদের বাড়ীতে বাড়ীতে খুব ভাল মেঠাইয়ের থালা পাঠাতেন বটে।

একবার কালী সিঙ্গী—নাম করলে-ই যাঁর প্রতি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধা উথলে উঠে, যে সিংহ মহোদয়ের অমরস্মৃতি জাগরিত রাখবার জন্য মর্ম্মর-মূর্ত্তি, তৈলচিত্র, এমন কি, বাৎসরিক শোক-সভারও প্রয়োজন হয় না, তাঁর বাঙ্গালা নামটা বাঙ্গালীর মতন সোজা বাঙ্গালাতেই উচ্চারণ ক'রে কালী সিঙ্গী বললুম, আমার এই "সিঙ্গী"তেই এত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা মাখান আছে যে, অন্য কোন সাহিত্যসিংহ-ও তত ভক্তি ভালবাসা দিতে পারবেন না। সেই কালী সিঙ্গী একবার পূজোয় রাজার বাড়ী নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, বৈঠকখানায় ব'সে আছেন। বিস্তর বড়লোক সেথায় জমায়েৎ ; ও-দিকে উঠোনে নাচের মজলিস বসেছে, এমন সময় সেই নির্ভীক তেজস্বী স্পষ্টভাষী যুবক ব'লে উঠলেন, "রাজার বাড়ী—দুগ্গো পূজো—নেমন্তন্ন আসা গেছে—সেপাই খাও, শান্ত্রী খাও—গোরা কনেষ্টবল খাও—ফরাস তাকিয়া চেয়ার কউচ খাও, ঝাড় সেজ দেলাগিরি বেললণ্টন যত পার খাও, বাইজীর সেঁইয়া বেঁইয়া খাও, কিন্তু

লুচি-সন্দেশের যদি প্রত্যাশা কর ত স'রে পড়।" মজলিসে একটা হাসি-ও উঠল, একটা আমতা আমতা ভাব-ও কারুর কারুর মুখে দেখা গেল। রাজবাটীর প্রতিভূ ছিলেন তথায় হরেন্দ্রকৃষ্ণ, তিনি বিশেষ অপ্রস্তুত না হয়ে বল্লেন,—"কি জা নে ন কা লী বা বু, আ মা দে র বু হ ৎ ব্যা পা র, এই ক ল কা তা র সা হে ব ই ব লু ন, মে ম ই ব লু ন, আ র স ম স্ত ব ড় মা নু ষ গু ষ্টী ত আ ছে ন-ই, তা তে এ ই না চে র ম জ লি সে র ব্যা পা র, এ র স ঙ্গে কি আ বা র খা ও য়া নো র উ দ্যো গ ক ল্লে সা ম লা ন যা য়, ঐ জ ন্যে আ ম রা এ র প র বা ড়ী বা ড়ী খা বা র পা ঠা ই।"

"সামলাতে পারা যায় কিনা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।" এই ব'লে সিংহ মহোদয় নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে বাড়ী গেলেন। পর বৎসর হ'তে কয়েক বৎসর তিনি নিজের বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাস্তার দু' ধারে বাঁধা রোশনাই, বাড়ীতে উৎকৃষ্ট তয়ফার[১০] মজলিস ক'রে আর হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে পরিতোষ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যের আয়োজনে ভূরিভোজন করিয়েছিলেন।

৫

সিংহ মহোদয় নিজে বড়মানুষের ছেলে ছিলেন, এবং সমসাময়িক প্রায় সকল বড়লোকই একদিকে যেমন তাঁহাকে স্নেহ ও আদর করতেন, অন্য দিকে তেমন-ই একটু ভয়-ও করতেন। শান্তিরাম সিংহের বংশে তিনি জন্মেছিলেন শান্তিরাম সিংহ। তাঁর স্পষ্টবাদিত্ব কিছু মারাত্মক রকম-ই ছিল। সিংহীর বাচ্ছা যেমন প্রকাণ্ড দুরন্ত হাতীর মাথার উপর-ও লাফিয়ে পড়ে, কালীপ্রসন্ন সিংহও সেইরূপ যত বড় নামজাদা মহারাজা রাজা কি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ধনী-ই হোন, সবার-ই সম্মুখে তাঁদের ভণ্ডামীর বা ন্যাকামীর ব্যাখ্যানা করতেন, প্রায় তখনকার সকল বড়মানুষ-ই সিংহ-দত্ত এক একটি ব্যংগাত্মক ডাকনাম পেয়েছিলেন। এখন ধনবান্ অনেক আছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বড়মানুষ বেশী দেখা যায় না; তখনকার ধনীদের মেজাজ প্রায়ই বড় হ'ত, তাই বড়মানুষ বল্লে-ই সঙ্গে সঙ্গে ধনী বোঝাত। যার নিজের ঘরে নোয়ার সিন্দুকের ওপর নোয়ার সিন্দুকে বোঝাই টাকা আছে, সে মোলো কি বাঁচলো, তাতে লোকের বড় এসে যেত

না, কিন্তু মধ্যবিত্ত গরীব ও গেরস্তরা বড়মানুষকে ভয় করত, ভালবাসতো, তাঁদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হ'তো। তখন টাকা শুধু জমাতে জানলে-ই সুখ্যাতি হোতো না, সংগে সংগে টাকা ছড়াতে পারলে-ই তবে নাম বেরুতো। এখন অনেক বড়-মানুষকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, তাঁরা বলেন, তাঁদের আর লোকে বড় গ্রাহ্য করে না। কেন করবে বাপু ? তোমার টাকায় তোমার নিজের ছাড়া কার কি উপকাব হয় ? তুমি বিশ হাজার টাকা দিয়ে প্রকাণ্ড মোটার কিনলে, আমার ধোবা দয়া কোরে আড়াই মাস পরে এসেছেন, সবে ধোপদস্ত কাপড়খানি পোরে বেরিয়েছি আর শোফার দিয়ে গেলেন জামার উপর কতকটা কাদা ছিটিয়ে, এতে আমার প্রাণ তোমার জন্য প্রেমে ডগমগ হয়ে উঠবে কি কোরে ? কাগজে দেখতে পাই, তুমি মাঝে মাঝে দান কর বটে ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ব'লে গেছলেন, 'নামে রুচি জীবে দয়া' আর এখন হয়েছে 'নামে দয়া জীবে রুচি' ; বাবুদের ভোজ্য-পাত্রে বহু জীবের অধিষ্ঠান ও কাগজে নাম বেরুবে বোলে দান। কালী সিংগী একটা সত্যি বড়মানুষ ছিলেন ; বড়মানুষী দান, বড়মানুষী শাসন, বড়মানুষী শিষ্টাচার, বড়মানুষী দুষ্টুমী, বড়মানুষী মহাভারত, বড়মানুষী হুতোম প্যাঁচা।

টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' আব 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এই দু'খানি সরস গদ্য-গ্রন্থ সেই সময় অনেক বাংগালী অ-পাঠককে-ও পাঠক ক'রে ছাড়িয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুর হচ্ছেন প্যারীচাঁদ মিত্র আর হুতোম প্যাঁচা কালীপ্রসন্ন সিংহ। অধুনা বিস্তৃত বাংগালীর সহজ সাহিত্যরাজ্যের রোমুলাস রিমাস ছিলেন ঐ দুই মহাপুরুষ। আজ বাংগালী ঔপন্যাসিক হিউগো, টলস্টয়, আনাটোল ফ্রান্স, ভল্টেয়র, অস্কার ওয়াইল্ড, মারী করালি, আর-ও কত কি বলছেন, তা' ছাড়া মোপাসাঁ ত ঘরে ঘরে। কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্র কি কালী সিংগীর নাম কোরে একবার মাথা নুইয়ে শ্রীদুর্গা ফাঁদতে তো কাকে-ও বড় দেখি না। কিন্তু এই দেশে-ই আজ-ও পিতৃশ্রাদ্ধে বসতে হ'লে ব্যাসদেব ও অষ্টাদশ পুরাণকে আগে প্রণাম ক'রে তবে ক্রিয়া আরম্ভ করতে হয়। যখন বাংগালীর সংসারে ও সমাজে দেবতার প্রতি ভক্তির আধিপত্য ছিল, তখন গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা, গুরুবন্দনাদি লিখিত হোত ; আর এখন সেই বাংগালীর সংসারে সমাজে অর্থশক্তির-ই একাধিপত্য, তাই ইনস্পেক্টার স্তোত্র লিখে স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের মংগলাচরণ করতে হয়।

টেকচাঁদ ঠাকুর ও সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে অন্যত্র একটা বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে, ফল কত দূর হয় বলতে পারি না।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সিংহ-মহোদয় বিদ্রূপ-ই করুন বা কৃতিত্ব-ই দেখান স'বাজারের রাজবাড়ীর পূজো এক সময়ে কলিকাতায় একটা সর্ব্বসাধারণের উৎসব ব'লে গণ্য হ'তো। তিন দিন ধ'রে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে যে বিপুল জনতা হ'তো, তাতে কলিকাতাবাসীর সঙ্গে অনেক দেশান্তরাগত লোক-ও যোগ দিত। উৎকৃষ্ট বাইনাচ ছাড়া কলিকাতায় যে সময়ে দেশী বা বিলাতী কোন রকম নতুন আমোদের আমদানী হ'লে রাজারা সর্ব্বসাধারণের উপভোগের জন্য উহা আপনাদের উৎসব প্রাঙ্গণে প্রদর্শন করাতেন।

৬

কলিকাতায় বাঙ্গালীর মধ্যে যে জিমন্যাষ্টিকের প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, তার সঙ্গে রাজবাড়ীর দুর্গোৎসবের নিকট সমন্ধ আছে; ঘটনাটা একটু পরের হ'লে-ও খবরটা এইখানে-ই দিয়ে রাখি।

শুনতেম যে, প্রাচীন হিন্দু-কলেজে নাকি একবার জিমন্যাষ্টিক শেখাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু কাগজেকলমে তার বিবরণ আমার চোখে কখন-ও পড়েনি বা সেখানে শিক্ষিত কোন ব্যায়াম-বিদের নাম-ও কখন-ও শুনিনি।

১৮৬৭ কি '৬৮ ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, ঐ সময় সভাবাজারের রাজাদিগের দক্ষিণদিকের বাড়ীর পূজাপ্রাঙ্গণে আমরা প্রথম বিলাতী জিমন্যাষ্টিক দেখি। পিটার নামক এক জন ফিরিঙ্গী ছিলেন সেই দলের অধিকারী ও নায়ক। ডবল ট্রাফেজ, রিং, হরাইজন্টাল বার ও গ্রাউণ্ড এক্সারসাইজ দ্বারা পিটারের দল কেবলমাত্র আমাদের চমকিত ও বিস্মিত ক'রে বিবিধ কৌশলপ্রদর্শন করেনি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত অনেক কিশোর ও যুবা দর্শকের চিত্ত ঐ সকল ব্যায়াম ক্রীড়া শিক্ষা করবার জন্য উৎসাহ ও আগ্রহে পূর্ণ করেছিল। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র ছিলেন দর্শকের মধ্যে এক জন, তাঁর তখন পরিপুষ্ট যৌবন, বয়সে আমাদের চেয়ে দশ বারো বৎসরের বড়। এখনকার স্বদেশহিতৈষীরা পেট্রিয়টিক হাইকোর্টের এডভোকেট জেনারেল, ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল, কিন্তু নবগোপাল মিত্র ছিলেন এক জন মোক্তার, সেই জন্য এখন অনেকে তাঁর নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছেন। কিন্তু

তিনি-ই প্রথমে এদেশে "ন্যাশানাল" কথাটি প্রচার করেন। ঐ চতুরক্ষর বীজমন্ত্র তিনি প্রথম বাঙ্গালীকে দেন ব'লে লোক তাঁকে 'ন্যাশানাল নবগোপাল' বোলতো ; তাঁর একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল, যার নাম 'ন্যাশানাল পেপার' ; আইনের প্রতাপে চড়কের পার্ব্বণ মন্দা পড়ায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বেলগেছের ডন্‌কিন্ সাহেবের বাগানে তিনি একটি 'চৈত্র-মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম হয় ন্যাশানাল মেলা ; তাঁর দেশহিতকর সকল কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার মানবমুখোজ্জ্বল ভ্রাতৃ-ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ; রবিবাবু তখন অতি শিশু। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন আমরা প্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করি, তখন ঐ নবগোপালবাবুর উপদেশে-ই আমরা উহার নাম দিই ন্যাশানাল থিয়েটার।

রাজার বাড়ীর জিমন্যাষ্টিক দেখেই নবগোপালবাবুর মনে বাঙ্গালীর ছেলেদের জিমন্যাষ্টিক শেখাবার বন্দোবস্ত করবার প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হ'ল ; চোরবাগানের একটা ছোটখাট স্কুল বাড়ীর উঠানে তিনি সরঞ্জামাদি যোগাড় ক'রে একটি ফ্রি জিমন্যাষ্টিক স্কুল খুললেন ; সপ্তাহে তিন দিন এসে শেখাবার জন্য চল্লিশ টাকা মাস-মাহিনায় পিটার শিক্ষক নিযুক্ত হ'ল ; ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের মধ্যে আমি-ও এক জন ছিলাম। সেকালের বিখ্যাত জিমন্যাণ্ট আহিরীটোলার অখিলচন্দ্র-ও ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র, এই অখিলবাবুর নাম আমি পূর্ব্বে এক যায়গায় উল্লেখ ক'রে গেছি।

আমাদের ত গোড়ায় পিটারকে আনতে হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিল বাগবাজারের শ্যাম ঘোষ ; শ্যামাচরণ আমার শৈশবের সহ-পাঠী ও বন্ধু, শ্যাম ও আমার অপর বাল্যবন্ধু রাধাগোবিন্দ কর রাজার বাড়ী জিমন্যাষ্টিক দেখবার পরেই ডাক্তার আর, জি, করের পিতৃভবন্ ডাক্তার দুর্গাদাস করের বাটীতে জিমন্যাষ্টিকের আখড়া খোলেন। ও আখড়ায় আমি-ও যেতেম। দুর্গাদাসবাবু তখন জীবিত ছিলেন, তিনি স্বর্গীয় ইঞ্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র ও স্বর্গীয় বাবু গোপাললাল মিত্র আমাদের পল্লী-বালকগণকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, তাঁরা নিজে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করতেন। এখনকার বাপের পক্ষে এ কথাটা-কিছু-ই নয়, কিন্তু তখনকার বাবা আর এখনকার বাবা—ও বাবাঃ!

লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সার জন ক্যাম্বেলের মাথায় ঢুকলো যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর

জন্য এমন একটা সার্ভিস তৈরী করতে হবে, যাতে এক এক জন এক একটী বিদ্যাকল্পদ্রুম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবে-ই, তার উপর একটু কেমিষ্ট্রী, একটু বোট্যানি, সারভেয়িং, জিমন্যাষ্টিক, সাঁতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাম্বেল সঙ্কল্পকে রহস্য কোরে তাঁর অমৃতবাজারে একটি কার্টুন ছাপান, জিমন্যাষ্টিকের পোষাকপরা, কোমরে একটি পেছন দিকে ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিমটে (চিমটেটা হচ্ছে কম্পাস), নীচেয় লেখা ছিল ;—

'কানে চিমটে কোমরে শিকলি—
হুজুরের মনোমত ডেপুটি।'

প্রথম ছত্রের শেষটুকু ভুলে গিয়েছি।

ঐ কার্টুন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইঙ্গিতে আমি এক নক্সা লিখি, জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল-বাড়ীতে তার অভিনয় হয় ; শ্মশ্রুবিহীন ছোকরা আমি, তা'তে প্রফেসর আর বড় বড় দাঁড়ীগোঁফপরা হিন্দু-মুসলমান ছাত্র, পরিচ্ছদ শিশিরবাবুর কার্টুনের অনুরূপে কানে চিমটে কোমরে শিকলি, খালি প্রফেসরের পেন্টুলেন চাপকান। কচুপাতা কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে বুঝিয়ে দিতুম, যতই খণ্ড খণ্ড করিয়াছি, তত-ই কচুপাতা হচ্ছে, একখানা-ও কলাপাতা হচ্ছে না, দেখ বোট্যানির কি আশ্চর্য্য মহিমা। দেশলাই জেলে কেমিষ্ট্রির আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়ে বলতুম যে, দেখ, দেশী আগুনের চেয়ে বিলিতী আগুনের ভিতর কি গুপ্ত তেজ, তোমরা হাকিম হয়ে মফঃস্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিতী আগুন ঘরে ঘরে রাখে ; জমীতেই সাঁতার শেখবার কসরত হ'ত, আর আমি নানারকম সেলামের উপর এক লম্বা লেকচার ঝাড়তুম। ঐ "মডেল স্কুল" নক্সাই বোধ হয় আমার ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি ; আর-ও নানা বিষয়ে ও রকম ৮।১০ খানা নক্সা নিজে একা বা গিরিশবাবুর সাহায্যে সে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল ; ২।১ খানা বোধ হয় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় গিয়েছে। গিরিশবাবু-ও জানতেন না, আমি-ও জানতুম না বা কেউ-ই জানত না যে, থিয়েটার কালে একটা প্রকাণ্ড উৎপাত হয়ে দাঁড়াবে, আর আমরা আবার নাট্যকার হব, সুতরাং দলিলপত্র সব যত্ন ক'রে রাখা উচিত। অবিনাশ ক্ষোরা ছিল, তাই কুড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজে পেতে গিরিশবাবুর কত অমূল্য ধন

আজ সাধারণের আনন্দবিধানের জন্য দিতে পেরেছে।

ন্যাশনাল বা চৈত্র-মেলাতেই প্রথমে "মিলে সবে ভারত-সন্তান" প্রভৃতি উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা পঠিত হয়, ঐ মেলাতে-ই প্রথম নারী-শিল্প প্রদর্শিত হয়, কৃষিপ্রদর্শনী-ও ছিল। ঐ মেলাতে-ই বাঙ্গালী বালকের বিলাতী জিমন্যাষ্টিক, আর ঐ মেলাতে-ই বর্দ্ধমানের রায়বেঁশেদের অদ্ভুত ব্যায়াম দেখা গিয়েছে। আহা, সেই জিনিষ আমি-ও আর দেখব না ; বাঙ্গালী ছোকরারা, তোমরাও কখন দেখতে পেলে না! Give a dog a bad name and hang it, ডাকাত নাম দিয়ে বাঙ্গালা তোদের চিরবিদায় দিয়েছে! কিন্তু সত্য কথা বলতে হবে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল স্বয়ং সেই মেলাতে ব'সে সে খেলোয়াড়দের শুধু যে তারিফ করেছেন—তা নয়, তাদের আদরে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত-ও করেছেন। বাঙ্গালী যে শক্তিমান হয়, সাহসী হয়, সাধারণতঃ সাহেবের এ ইচ্ছা নয়, সেটা আমি লাঠী খেলা বন্ধ, বাণ ফোঁড়া বন্ধ, একজামিনের পড়া মুখস্থ, এই রকম নানা নিদর্শন দেখে বুঝেছি ; সেই জন্য-ই ক্রিকেট খেলা ফুটবল খেলা হকি খেলা ঐ সব সরঞ্জাম বিক্রেতাদের পক্ষে যতটা হিতকর, আমাদের যুবকদের পক্ষে ততটা হিতকর কিনা, আমার বরাবর সন্দেহ আছে ; ওঁরা আমাদের ইঙ্গিতে শেখান মল্ল-বিদ্যাধমাধম, আর নিজেরা প্রয়োগে দেখান মল্ল-বিদ্যা দমাদ্দম! কিন্তু সার জর্জ্জের ঘাড়ে কি দুষ্ট সরস্বতী চেপেছিল যে, সাধারণতঃ বিশেষ হিতৈষী না হ'লে-ও বাঙ্গালী পীলে রোগাটা থাকে, সেটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি-ই প্রথমে শ্যাম ঘোষকে চুঁচুড়া কলেজে জিমন্যাষ্টিক টিচার নিযুক্ত করেন ; পরে তাঁর-ই আদেশে কলিকাতা ও মফঃস্বলে বহু জিমন্যাষ্টিক টিচার নিযুক্ত হয়েন। ঐ শ্যাম ঘোষের-ই পুত্র এন, ঘোষ বিলেত গিয়ে সার্টিফিকেট পেয়ে এখন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে ফিজিকেল ট্রেণিংএর এক জন প্রধান কর্ম্মচারী।

একে পুরাতন পঞ্জিকা, তায় বোধ হয়, "বসুমতী আফিসের" দপ্তরী সাহেবের নানা মিয়ার হাতের বাঁধাই, সুতরাং কোথাকার পাতা কোথায় যে গেছে, তার ঠিক নেই ; সুতরাং পুজো থেকে আশ্বিনে ঝড়, ঝড় থেকে সেলারের উৎপাত, কোথায় কালী সিংগীর কথা, কোথায় টেকচাঁদ ঠাকুরের কথা, কোথায় বাইনাচ, কোথায় জিমন্যাষ্টিক, কোথায় নৈবিদ্যি, কোথায় মেঠাই মতিচুর, কোথায় চৈত্র-মেলা, কোথায় ন্যাশানাল থিয়েটার কি যে গোলমাল হচ্ছে, কিছুর-ই ঠিক নেই ;

তবে নদেরচাঁদের কথায় বলি, আসলে কম না পড়লেই হ'ল।

৭

স'বাজারের রাজারা হচ্ছেন সূতোনূটীর জমীদার ; বাগবাজার থেকে মেছোবাজার সিঁদুরেপটী পর্য্যন্ত অনেকটা স্থান-ই সূতোনূটীভুক্ত ; তবে এক সময়ে এঁরা অনেক ভাল ভাল লোককে এনে এখানে জমী দিয়ে বাস করিয়েছিলেন, সেই জন্য আর অতুল ঐশ্বর্য্যের সময় সালিয়ানা ১॥০, ১৸০ খাজনা গ্রাহ্যের মধ্যে-ই আসত না, তাই আদায়-ও হ'ত না, সেই তামাদিতে সূতোনূটীর সীমানার মধ্যে অনেক পাকারাটী লাখরাজ ; তবু এখন-ও এমন বড়-মানুষ বা গৃহস্থ আছেন, যাঁদের রাজাদের কিছু কিছু খাজনা দিতে হয়। এই জমীদারী প্রিভিলেজ রক্ষার জন্য রাজবাড়ী সন্ধিপূজা আরম্ভ হ'লে একটা তোপ হ'ত, তবে এ অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ীতে সন্ধিপূজা আরম্ভ হ'ত। ওঁদের বিজয়ার আগে কারুর প্রতিমা বার করবার যো নাই, সেই জন্য-ই অপরাহ্ণ ৪টা বাজতে-ই রাজাদের ঠাকুর বিজয়ার দিন রাস্তায় বার করা হয় ; অবশ্য ব্রাহ্মণ-বাড়ীর প্রতিমা প্রায়-ই সকালে নিরঞ্জন করা হয়, যখন চক্র ছিল, তখন-ও সে জন্য ফোঁস্-ফোঁস্ শুনতে পাওয়া যেত না। বিজয়ার দিন বেলা ৩টা থেকে-ই রাস্তায় ভিড় আরম্ভ হ'ত। কোর মাথান ধুতি, গায়ে ছিটের পিরাণ, মাথায় জরির তাজ, কার-ও বা রং করা রেশমের পায়জামা, গোটা লাগান ফুলকাটা রেশমী চাপকান, মাথায় যাত্রার দলের ছেলেদের মত সামনেটা একটু জরির কায করা মুকুটের মত উঁচু করা টুপি ছেলের দল সঙ্গে, নীলাম্বরী শাড়ী, শালুর পাড় বসান শাড়ী, সেপাই পেড়ে শাড়ী, কলমার শাড়ী, জন্ম-এয়োস্ত্রী ডুরে পরা, রূপোর বালা, রূপোর প'ইচে, রূপোর তাবিজ, সোনার হার, সোনার মাকড়ীপরা মেয়েরা সব বিসর্জ্জন দেখতে বেরিয়েছে ; নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষদের বাবুয়ানা পোষাকে তখন-ও চওড়াপেড়ে কোঁচান ধুতির উপর জামদানের হাফ চাপকান, জরিপাড় চাদর লম্বা কুঁচিয়ে বুকের উপর ঢেরাকেটে ঝোলান, মাথায় সোজা সীঁথে, বাবরী চুল দাঁতে মিসি দেখা যেত, লোক চলেছে সব বিসর্জ্জন দেখতে, চিৎপুর রোডের উপর ভিড়, বাজারের ছাতে, চকে ছাতে, রকে বারান্দায় যেখানে যত লোক ধরে, মেয়ে-মদ্দ সব দাঁড়িয়ে গেছে। 'চানাচুর' 'সখের জলপান' 'সাড়ে আঠার ভাজা' 'নান খাত্তাই'

'চীনের বাদাম' 'গোলাপী খিলি' দেদার বিক্রি হচ্ছে; রঙিন কাগজের ফুল পাটের রোঁয়া তুড়ুক লাগান বাঁদর, বাঁশের বাঁশী, সোলার পাখী, টিনের ঘুরুণ চাকা, মাটীর টেমটেমী, বাঁশের বেহালা প্রভৃতি খেলনা পেয়ে ছেলেমেয়েরা আহ্লাদে আটখানা।

বাড়ীর এক জন প্রবীণ আত্মীয়ের সংগে বিসর্জ্জন দেখতে গিয়ে আমরা পায় পায় প্রায় বটতলার কাছাকাছি অবধি গিয়েছি, এমন সময় এক জন পটওয়ালা দেখে আমার একখানা নব-নারীকুঞ্জরের পট কেনবার সাধ হ'ল। সংগের অভিভাবককে বলাতে তিনি পটওয়ালাকে হাত নেড়ে ডাকলেন, সে সামনে আসতেই আমাদের অভিভাবক বল্লেন—"একি, গুরুচরণ যে, তুমি পট-ও বেচ না কি?" আমাদের সেই পূর্ব-পরিচিত ঘটিতোলা গুরুচরণ একটু হেসে উত্তর দিলে,—"কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হবে, দেশেও মাঝে মাঝে কিছু খরচ পাঠাতে হয়, তা কেবল সকালের মেহনতে চলবে কেন বোসজা মশাই; তাই দুপুরবেলা গোটাকতক বালাণ্ডা মাদুর মাথায় ক'রে ঘুরে বেড়াই, বিকেলে এই পট ফেরি করি, আর সন্ধ্যাব পর গ্রীষ্মকালে কুলপি বরফটা আসটা বিক্রী করি; যখন যাতে যা হয়।" আমাদের অভিভাবক বললেন,—"বেশ বেশ, এই রকম মেহনত-ই ত চাই।" ইচ্ছা ছিল দু'পয়সায় একখানা পট কেনবার, গুরুচরণকে পেট্রনাইজ করবার জন্য চার পয়সা দিয়ে দু' দুখানা পট কিনে ফেললুম। তখন রাম-রাবণের যুদ্ধ, অশোকবনে সীতা, কালীয় দমন, নবনারীকুঞ্জর, কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ এই রকম নানা পৌরাণিক ছবি বটতলায় লিথোগ্রাফে ছাপা হ'ত। কতক কতক ছবিতে আবার রং দেওয়া-ও হ'ত; গরীব লোকরা সেই ছবি কিনে আপনাদের ঘরের দেয়ালে আটা দিয়ে লাগিয়ে রাখত, কেউ কেউ বা বাঁধিয়ে-ও রাখত; গৃহস্থ-বাড়ীতেও সে সব ছবি রাখা নিন্দার কথা ছিল না। অনেক গরীব গৃহস্থের মেয়েরা সেই ছবিতে ঘরে ব'সে রং দিতেন ও শ'দরে কিছু কিছু পেতেন। এই কলকাতায় তখন অনেক গরীব গৃহস্থ ঘরের বিধবা এবং সধবাও ঐ রকম ছবিতে রং দিয়ে, ঠাকুরের সাজের জন্য কাঠের মালায় বাদলা জরি জড়িয়ে, ডাল বেছে দিয়ে, কচুরীর জন্য ডাল বেটে দিয়ে, চরকা কেটে, ফুলশয্যাদির তত্বের জন্য বাহারে সুপারি কেটে, খয়েরের গহনা, খয়েরের ফুল, খয়েরের বাগান গ'ড়ে, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নিচু, জামরুল, জাম এই সব তয়ের ক'রে দিয়ে আপনাদের সংসারের

সুস্যার করতেন।

আয়েষার রূপবর্ণনাচ্ছলে[১১] বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান ক'রে বঙ্কিমবাবু একটু বিদ্রূপ করার পর থেকে অনেক সাহিত্য-ঘোড়সোয়ার বটতলার নামে নাক সিঁটকে থাকেন। বলি, ও ঠাকুর! কোথায় থাকত তোমার বাঙ্গালা বিদ্যা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ধর্ম্ম, বাঙ্গালা পুণ্য, বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য যদি না চোদ্দ আনায় বিকৃত বটতলার বাঙ্গালা মহাভারত, বাঙ্গালা রামায়ণ! আর বটতলা কি মরেছে? বটতলা-ও মরেনি, বটতলার কবি-ও মরেনি। এখন একটু দামী কাগজে চকচকে বাঁধাইয়ে আর "নিঝুম নিঝুম রেতে চাঁদিনী মেখে" "স্ফুরিত অধরে চুম্বন মুদ্রিত ক'রে" "চায়ের সরঞ্জাম হাতে" "ঝড়ের মত বেগে" বটতলা বাগবাজার থেকে আরম্ভ ক'রে বৌবাজার পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, এই পর্য্যন্ত।

রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভারতচন্দ্র, মনসার ভাসান, মৎস্যপুরাণ, বরাহপুরাণ এই রকম আর-ও কত পুরাণ, বৈষ্ণবগ্রন্থ, বাঙ্গালা আইনের বই এ সব ত বটতলায় ছাপা হত-ই, তারপর আমি যে সময়ের কথা বলতে আরম্ভ করেছি, সেই সময় একটা নতুন 'বটতলা-সাহিত্য' দেখা দেয়। যদি এক পয়সা দিয়ে এক সরা সখের জলপান কিনে "ছি ছি, এ ঠাকুরদের দেওয়া চলবে না" কি "পিঠের মতন পোষ্টাই নয়" বা "পেস্তার মত সুস্বাদু নয়" ব'লে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তবে সে বটতলা-সাহিত্য সত্য সত্যই আঁস্তাকুঁড়ে ফেলবার উপযুক্ত। কিন্তু সেই যে গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত বা শুধু পদ্যে "কি মজার শনিবার" "কি মজার রবিবার" "কি দুঃখের সোমবার" "ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ" "অসৈরণ সইতে নারি" প্রভৃতি চটি বই যা ১ পয়সা বা ২ পয়সা ক'রে বিক্রী হত, তার একখানি পাবার জন্য আমি আজ ৩০ বছর ধ'রে হয়রাণ হয়েছি; আমি গরীব, তবু সেই "কি মজার শনিবার" টীনবার পেলে এক একখানা বইয়ে ১ টাকা বা ২ টাকা দিতে রাজি আছি। সে বায়রণ নয়, ব্রাউনিং নয়, শেলি নয়, সুইফ্‌ট নয়, হেম নবীন রবীন্দ্র সত্যেন্দ্র নয়, কিন্তু সেই সব বইয়ে একটা ভাষা ভাব ছন্দঃ রস ছিল যা তার নিজস্ব; যেমন এই একটু আগে বললুম, পেস্তার মিষ্টতা সখের জলপানে নাই বটে, কিন্তু বর্ষার বৈকালে বাদাম পেস্তাও গরম গরম সখের জলপানের মত মুখরোচক হয় না। আমার কতকটা জানা আছে যে, তখনকার অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক-ও নাম গোপন রেখে সখ ক'রে

ঐ রকম এক একখান বই বটতলার পাবলিসারদের লিখে দিতেন। তবে এখন-ও যেমন হচ্ছে, তখন-ও তেমনই, অক্ষম অনুকরণকারীরা জিরেন কাঠের খেজুর-রসে ধুতুরার বীচি মিশিয়ে তাড়ি ক'রে ফেলে, সেইরূপ গ্রাম্য রসিকতার ভিতর কুৎসিত উলঙ্গ অশ্লীলতার অবতারণা ক'রে একটা বেশ মুখরোচক জিনিষ একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে। আজ বছর ৩০।৩৫ আগে কলকাতার একটা ফিরিওয়ালা সাড়ে আঠার ভাজার উপর সুর চড়াতে গিয়ে সাড়ে বত্রিশভাজা ব'লে হেঁকে বেরুতে আরম্ভ করলে। দেখাদেখি আরও দু চার জন বেরুল :—আঃ রাম রাম! সে একেবারে হাটখোলার ধুলো ঝাঁট দেওয়া হাঁটকা, মুখে বালি কাঁকর যা ইচ্ছে তাই ঢুকে গেল, শেষ অতকালের সখের 'সখের জলপানটা' একেবারে উঠে গিয়ে এলেন কি না পাঁটার (কি না কুকুরের নাড়ী সিদ্ধব) ঘুঘনিদানা আর অবাক্ জলপান।

* * * *

বিজয়া দশমীর দিন রাত ১০ টা পর্য্যন্ত কলকাতা বেশ সজাগ ছিল, কিন্তু তার পর সহরটা যেন নিবে গেল। সন্ধ্যার পর থেকে রাত প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত খুড়তুতো ভাই মামাতো ভাই পিসতুতো ভাই বাড়ীর জামাই ভাগনে অন্য আত্মীয়কুটুম্ব স্বজন প্রতিবেশী ক্রমাগত আসা-যাওয়া নমস্কার কোলাকুলি মিষ্টিমুখকরা চলল, তারপর বাড়ীর লোকের কাছে নিজের নিজের বাড়ী যেন অন্ধকার আর পুজোবাড়ীর দালান পানে চাইলে মনে হয় যেন খেতে আসছে। বড় রাস্তায় গ্যাস সে দিন মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে, গলির রাস্তার তেলের আলো দেশলাই ধরিয়ে দেখতে হয় জ্বলছে কি না; কিন্তু এই বিজয়ায়, আজকের-ও এই বিজয়ায় সকল বয়সের সকল অবস্থার বাঙ্গালীর মনে জগতের সমস্ত জীবের প্রতি সহানুভূতির কি এক পবিত্র ভাব উদয় হয়; যারা বিদ্বেষের বশে এক বৎসর ধ'রে মুখ দেখাদেখি করেনি, তারা-ও পরস্পরে নমস্কার আশীর্ব্বাদের পর কোলাকুলি ক'রে চোখের জল ফেলে। কিন্তু আশঙ্কা হয়, বুঝি এই বিদ্বেষ বিজয়কারিণী মধুর-মিলনের জয়ভেরীনাদিনী বিজয়ার-ও বিজয়া হয়।

৮

ভাবতেম, বুঝি রেলের কনসেসনের প্রলোভনে-ই পঞ্চমীর প্রভাতে বাড়ী ছাড়া

ক'রে প্রবাসের প্রমোদের পানে টেনে নিয়ে যায়; ভাবতেম, বুঝি টেলিগ্রাফের তার-ই ওয়াল্‌টিয়ার থেকে কলকেতায় মায়ের পায়ে বিজয়ার প্রণাম পাঠাবার সুবিধা ক'রে দিয়েছে ;—কিন্তু এখন দেখছি, তা নয়।

আসল কথা, ভদ্রাসন থেকে ভদ্রলোকের সমাগম উঠে গেছে, বৈঠকখানার দরজার চাবি খুলে এখন ডাক্তার এলে এক আধবার তাঁকে বসান হয় মাত্র। সর্ব্ব-জগতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "স্ত্রী-স্বাধীনতা" "স্ত্রী-স্বাধীনতা" ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে, নারীর অধিকার বিস্তারের ব্যবস্থা নিয়ে নিত্য নূতন লেখ্য ও বাক্যের সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু পুরুষ, দেখতে পাচ্ছ কি, তোমার আপনার স্বাধীনতা ক্রমে রাহুগ্রস্ত ?

৯

এই যে "স্ত্রী-জাতির অধিকার—স্ত্রী-জাতির অধিকাব" ব'লে আমরা গুম্ফ-বিশিষ্ট অধম জীব একটা চীৎকার করুতে আরম্ভ করেছি, এটা কেবলমাত্র বাইরে আমাদের পুরুষগিরির একটা পসার বাড়াবার জন্য, নইলে সংসারে যা কিছু সত্য স্বাধীনতা, সত্য অধিকার, তা কেবল একমাত্র স্ত্রীলোকের-ই। পাঠক! যখন বৌমার মেজাজটা ভাল থাকবে, তখন একবার গোপনে মাথার দিব্যি দিয়ে জিজ্ঞেসা করো দিকি যে, 'লক্ষ্মি! এ বাড়ীতে তুমি কর্ত্তা না আমি কর্ত্তা?' ঐ দেখ, মা আমার একটু মুচ্‌কে হাসছেন। হ্যাঁ বাবাজি, যে দিন তোমার বাপ তোমার হাত থেকে লাটিম কেড়ে নিয়ে একখানি ফার্ষ্ট বুক দিয়েছিলেন, সে দিন কি মনে করেছিলে, একটা অধিকার পেলুম? যে দিন মাষ্টার মশাই বলেছিলেন যে, এই গর্ম্মির ছুটীর পর আমায় ১৩৩টে Greatest Common Measure ক'সে এনে দেখাতে হবে, সে দিন কি মনে করেছিলে, একটা অধিকার পেয়েছ? যে দিন বিধবা মা বল্লেন, বাবা, আর আমি সংসার-ও চালাতে পারিনি, পড়ার খরচ-ও জোটাতে পারিনি, একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা কর, সে দিন কি মনে করেছিলে, আজ একটা অধিকার পেলুম? বৌমা, তোমাকেও জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে ছোঁড়া—না হয় মিন্‌সে-ই হ'ল, এই ত নাকে-মুখে দু'টি গুঁজে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পরের গোলামী করুতে ছুট্‌ল, এটা কি তোমার রান্নাঘরের ভাঁড়ার ঘরের কর্ত্তৃত্বের

অধিকারের চেয়ে বেশী প্রলোভনীয় অধিকার? আর মা লক্ষ্মী, তুমি যদি মুখ খানি ঘুরিয়ে বল, "আর আমি আগুনতাতে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে পারি না, একটা উড়ে-ফুড়ে যা হয় দেখ"; তখন বাবু-উপাধিবিশিষ্ট জীবটি কি বলতে পারবেন, "আমিও আর টাকার জন্য গোলামী করতে পারিনি, তুমি যা হয় একটা চেষ্টা-বেষ্টা দেখ?" যে রাস্তায় দশ পা চলতে আমরা তিনবার গাড়োয়ানের কাছে, মুটেব কাছে, টিকেওয়ালার কাছে অপমানিত হই, সেই রাস্তায় তোমাদের চলতে বারণ করি ব'লে কি তোমাদের অধিকার কেড়ে নিই? হিন্দুর ত অবরোধ প্রথা নেই, চোরডাকাতের ভয়ে যেমন সোনা-জহরত সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখতে হয়, শিলাবিগ্রহাদি দেব-মূর্ত্তিকে যেমন ইতরের স্পর্শের অন্তরালে মন্দির মধ্যে রাখতে হয়, সহরেব মধ্যে তোমাদের-ও তেমন-ই অন্তঃপুর-মধ্যে রক্ষা করি, নইলে পল্লীগ্রামে বা তীর্থস্থানে তোমাদের কোথায় যেতে বাধা মা? কিন্তু নারি! ভালবাসাই তোমার সর্ব্বস্ব, যাকে ভালবাস, তার জন্য প্রাণ অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু প্রতিদান-ও তুমি চাও সুদ সমেত। কুব্জাব ন্যায় ঈর্ষা-দাসী ঐ ভালবাসার পাছু পাছু ঘুরতে থাকে আর ফিস্ ফিস্ করে। মা'র মতন ছেলেকে কে অমন ভালবাসে, কিন্তু বিয়ে দিয়ে আনার পর সেই ছেলে যদি বৌয়ের ঘরে একটু বেশী বসে, তা'কে লুকিয়ে সাবানটা এসেন্সটা কিনে এনে দেয়, অমনই মা মনে করেন, ছেলে আমার পর হয়ে গেল। এদিকে আবার স্বামী যদি বাড়ীর ভিতর ঢুকে বলেন, "মা, আমার খাবার হয়েছে এখন দেবে কি?" অমনি বৌমার অভিমান,—"আমি পরেব মেয়ে দু'দিন এইছি বই ত নয়, মা-ই ওঁর সর্ব্বস্ব!"

স্নেহ-ভালবাসার তীব্র আতিশয্যে ঈর্ষার জন্ম, দেহ বুদ্ধি মানব-মনের এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। নারী-চরিত্রের এই বিচিত্রতা সত্বে-ও কুটুম্ব-কুটুম্বিনী-পরিবৃত একান্নবর্ত্তী সংসারে সহ্যসংযমে আমাদের দিন এক রকমে চ'লে যাচ্ছিল কিন্তু পাঠশালা-সাহিত্যে বিলাতী ডুবালের প্রবেশের পর আমাদের বৈঠকী সাহিত্যে যখন বিলাতী প্রণয় বা 'লভ্' দেখা দিল, তখন চক্ষুলজ্জার পর্দ্দা একেবারে গুটিয়ে উঠল। দু পাঁচ জন পুরুষ বন্ধু নিয়ে স্বামী যে বাড়ীতে ব'সে একটু খোসগল্প আমোদ-আহ্লাদ করেন, এটা মেম-সাহেবদের বড় সহ্য হয় না, তাই বিলাতে সন্ধ্যার পর আনন্দের জন্য ইতর-সাধারণের মদের দোকান আছে, আর ভদ্রলোকের আছে ক্লব্; আমাদের সংসার চালিয়ে তার উপর 'ক্লব'

চালাবার কড়ি নেই, আর একবার কর্ম্মস্থল থেকে ফিরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফের যে ধড়াচূড়ো এ'টে বাইরে বেরুব, তার শক্তি বা উৎসাহ নেই; সুতরাং বৈঠকখানার পাঠ উঠিয়ে দিয়ে শয়ন-মন্দিরে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বৈ গতি কি! গিন্নী যদি কৃপা ক'রে দুখানা রুটী সে'কতে যান, কর্ত্তা ততক্ষণ ঘরে নজরবন্দী। এই জন্যে একটা ছুটী-টুটী পেলেই স্বামী-মশাইরা অমনি পাশ পেয়েছি-টেয়েছি যা হোক্ একটা অছিলা ক'রে বাড়ী ছেড়ে প্রবাসে চম্পট দেন; প্রবাসে কেবল বন্ধুসমাগম হয় না, অনেক নূতন বন্ধু-ও জোটে।

মা! কিছু মনে করো না, আমি তোমাদের নিন্দা করিনি, যা করেছি, তা ব্যাজস্তুতি। শাস্ত্র, সংস্কার, প্রবৃত্তি সব-ই আমার মস্তক নারীর চরণে অবনত ক'রে দেয়। পুরুষ বীর হ'তে পারে, কিন্তু তোমরা বীরপ্রসবিনী; পুরুষ বিদ্বান্ হ'তে পারে, কিন্তু নারী বিদ্বানের জননী; ত্যাগী সন্ন্যাসী পুরুষের-ও প্রসূতি রমণী।

১০

এই কলিকাতার পুরাতন দিনে এক জন মহীয়সী মহিলা যে তেজ, সাহস ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের অভিনয় দেখিয়ে গেছেন, তার একটা গল্প বলি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা একবার মতলব করলেন যে, জেলেরা কলকাতার সম্মুখস্থিত গঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধ'রে বিক্রী ক'রে ফাঁকি দিয়ে খায়, অতএব এই গঙ্গায় মাছ ধরার ইজারা দিলে কোম্পানীর বেশ একটা আয় হ'তে পারে; অমনি ইজারার নোটীশ-ও বেরুল। বিপন্ন জেলেরা মুখের অন্ন ইংরাজরা কেড়ে নিচ্ছে, এই ভয়ে রাণী রাসমণির দরজায় গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল; রাণী সব কথা শুনে বললেন, ওদের যেতে বল, আমি এর বন্দোবস্ত কচ্ছি। কর্ম্মচারীদের হুকুম দিলেন, যত টাকা ডাক উঠে, আমার নামে ইজারা ডেকে নাও; আশাতিরিক্ত টাকায় রাণীর নামে ডাক উঠল, ইংরাজ উকীলের বাড়ী থেকে পাকাপোক্ত দলিল লেখাপড়া হ'ল, এখন চিৎপুর থেকে মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত রাণী রাসমণির ইজারা। ইজারা পেয়ে-ই রাণী আর এক উকীল দিয়ে কোম্পানীকে নোটীশ দিলেন যে, কলকাতার সামনে গঙ্গার জলের উপর যত জাহাজ, বোট, ভড় প্রভৃতি আছে, এ সব তিন দিনের মধ্যে সরিয়ে নেওয়া হ'ক, নইলে

মাছ সব জাহাজ টাহাজের তলায় গিয়ে লুকায় আর আমার ইজারার সম্পূর্ণ স্বত্বভোগে ব্যাঘাত ঘটে। কোম্পানীর চক্ষু স্থির! বাঙ্গালার বাঘিনীর বুদ্ধির প্রভাবে অর্থলোভী ইংরাজের বিড়ালচক্ষু বিস্ফারিত! তখন সাধ্য-সাধনা, অনুরোধ-উপরোধ, সুপারিস আরাধনা, শেষ—খরচা-খেসারত দিয়ে ইজারা ফেরত, সেই অবধি গঙ্গায় ও-সব উৎপাত আজ-ও হয়নি।

আজ আমরা হ'লে হয় জেলে-মালার কথা ভ্রূক্ষেপে-ও আনতাম না, আর না হয় সভা করতুম, বক্তৃতা দিতুম, রেজোলিউসন পাশ করতুম, আর্টিকেলের উপর আর্টিকেল লেখা যেত, আর বোম্বাই, মাদ্রাজী, বর্ম্মা, সিংহলী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী সব মিলে প্রসেসন্ ক'রে গঙ্গাস্নান! কেমন ইংরাজ জব্দ হ'ত, সব বাসায় গিয়ে ম'রে থাকত।

আর একবার ঐ রাণী রাসমণি একা ক্ষেপা গোরার দল তাড়িয়েছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিউটিনির পর পশ্চিমাঞ্চল একটু ঠাণ্ডা হ'লে কলকাতায় বেজায় গোরার আমদানী হয়; সেই সময়-ই হাইলাণ্ডার গোরার এ দেশে প্রথম প্রবেশ, লোকে এদের নেংটা গোরা বলত। কেল্লা, দমদমা, বারাকপুর এ সব যায়গায় আর গোরা ধরে না, কাজে-ই কুইন্স কালেজ, হিন্দু কালেজ, ফ্রি স্কুল এই রকম অনেক বাড়ীতে-ই গোরাদের বাসা দেওয়া হয়; একে রক্তখেকো গোরা, তাতে মদ খেয়ে মাতাল; সেই সময় তাদের উৎপাতে কলকাতার অনেক লোক অস্থির হয়ে উঠেছিল। একদিন দুপুরবেলা কতকগুলো মাতাল গোরা রাণী রাসমণির বাড়ী ঢুকে পড়ে, দরওয়ানরা তাদের রুখতে না পেরে পালিয়ে যায়, সরকার লোকজন-ও যা ছিল, চম্পট দেয়, বাবুরা তখন কেহ বাড়ীতে ছিলেন না, অন্দরে মেয়েরা ভয় পেয়ে ছাতের উপর দিয়ে পাশাপাশি বাড়ীতে পালিয়ে যান, একা রাণী রাসমণি দু'হাতে দু'টু তরোয়াল নিয়ে ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ান; গোরারা অন্দরে ঢুকেছিল, কিন্তু ঠাকুরঘরের কাছ পর্য্যন্ত পেঁছুতে পারেনি, এমন সময় পুরুষদের কে বাড়ীতে ফিরে আসেন, পুলিসে ও কেল্লায় খবর পাঠান হয়, সেখান থেকে পল্টন সার্জ্জন সব এসে গোরাদের বের ক'রে নিয়ে যায়। এই রাণী রাসমণি বাঙ্গালীর মেয়ে, কলকাতার বৌ। যাঁরে আমরা এখন অশিক্ষিতা নারী বলি, তিনি প্রকাণ্ড জমীদারী চালিয়েছেন রাণীর মত! কোম্পানীর কুটিল কৌশলকে ব্যর্থ করেছেন চাণক্যের চেয়ে চক্রীর মত! দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সাক্ষাৎ ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের কৃপা লাভ করেছেন

ভক্তিমতী সাধিকার মত। সাধে কি সেকালের যশোরের জনকতক চাষা কলকাতা দেখতে এসে দেশে ফিরে গেলে যখন তাদের গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করেছিল, "সব-ই ত দেখেছিস্, কিন্তু রাণী রাসমণিকে দেখেছিস্ ?" তাতে তারা উত্তর দিয়েছিল, "দেখেছি বৈ কি—ইয়া গোঁফ, ইয়া চৌপাট্টা দাড়ী, এক ধারে এক ছালা চিঁড়ে মজুত, আর এক ধারে এক ছালা চৌনি মজুত, একবার এক থাবা চিঁড়ে-ই বা গালে পুরছে, আবার এক থাবা চৌনি-ই বা গালে পুরছে।" চাষা-বুদ্ধিতে চিঁড়ে চিনি ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক আর চৌপাট্টা দাড়ী-গোঁফ বীরত্বের পরিচায়ক।

তখন আমাদের শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে প্রায় প্রত্যহ প্রাতে-ই বাজনা বাজিয়ে গোরার পল্টন, সেপাইর পল্টন, ঘোড়সওয়ার পল্টন, কামানের গাড়ী কুচ ক'রে যেত ; শিখ পল্টন-ও সেই প্রথম কলকাতায় আসে, তখন-ও তাদের ব্যাণ্ডের বদলে দেশী বাদ্য ঢোল-সানাই ছিল। শ্যামবাজারের রাস্তায় মাতাল গোরার তখন বড়ই উৎপাত ছিল, গৃহস্থলোকের প্রায়-ই সদরদরজা বন্ধ ক'রে বাস করতে হ'ত ; এক দিন দুটো গোরা কিন্তু বেশ আপনাপনিই জব্দ হয়েছিল, দুঃখের কথা, হাসিরও কথা বটে। Aristotle বলেছেন, painless infirmity একটা comic দৃশ্যের উপাদান, ঘটনাটা নেহাৎ যাতনাশূন্য না হলে-ও মারাত্মক নয়, তাই বলছি।

ফড়েপুকুরের কাছাকাছি অমনি এক যায়গায় একটা বুড়ী এক চেঙ্গারী ওল বেচছিল, দিব্যি রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ওল ; দুটো গোরা সেখান দিয়ে যেতে যেতে ঐ ওলের চেঙ্গারী দেখিয়ে ইসারায় জিজ্ঞাসা করে, "ও কি করে ?" বুড়ী ইসারায় মুখে হাত তুলে বুঝিয়ে দেয় যে, "খায়।" গোরা দুটি দু'জনে দুটো ওল তুলে নিয়ে বুড়ীকে দুটো টাকা ফেলে দেয় ; সে সময় বোধ হয় দুটো ওল দু' পয়সার বেশী হবে না, সুতরাং বুড়ী ভুলে দিয়েছে, এখন-ই এসে কেড়ে নেবে, মনে ক'রে গোরারা একটু এগোতে-ই চাঙ্গারী মাথায় ক'রে স'রে পড়ে। গোরারা মদের সঙ্গে চাট্ করবে মনে ক'রে ওল দু'টি হাতে ক'রে পাঁচ মাথার দিকে যেতে যেতে আর লোভ সংবরণ করতে না পেরে এক একটা মুকী গালের ভিতর পুরে চর্ব্বণ—আর অমন-ই গোটা নাল ভাঙ্গন আর গালফুলো গোবিন্দর মা। বুড়ীকে ত আর খুঁজে পেলে না, তার পর এর দরজায় ধাক্কা মারে, ওর দরজায় লাথি মারে, আর যেন গর্জ্জে বেড়াতে লাগল। এমন সময় একজন দোকানী

সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে ইসারা-ইংগিতে বুঝিয়ে নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে খানিকটে তেঁতুলগোলা খাইয়ে দিলে, তবে কতকটা সুস্থির হয়। দোকানী বুঝিয়ে দিলে, ও জিনিষ সিদ্ধ ক'রে খেতে হয়, অমনি খেতে নেই। তবে একটা লাভ—ওলে দুটো টাকা গেল বটে, কিন্তু রমের দামটা বেঁচে গেল। সেই মুখ-কুটকুটুনির উপর মদ পড়লে আর রক্ষা থাকত না।

১২৭১ সালের বিজয়ার কোলাকুলির পর মন থেকে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের অবসাদ ঘোচাবার জন্য দুটা সামাজিক খোসগল্প ক'রে নিলুম। পূজা ফুরুল, কিন্তু এখন-ও পূজার ছুটী ফুরুতে দেরি আছে। যখন রেল হয়নি বা হয়েও বেশী বিস্তৃতি লাভ করেনি, তখন এই পূজার সময়-ই চাকরেরা প্রবাসের কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে নিজের বাস্তুতে এসে পারিবারিক গৃহস্থালীর মধ্যে দিন কতক জুড়াবার অবকাশ পেতেন, সেই জন্য-ই পূজায় একটা লম্বা রকম ছুটীর ব্যবস্থা, ছিল, ক্রমে এখন তা'র সঙ্কোচ হয়ে আসছে। রেল হবার পরে আবার কলকাতাবাসী চাকুরেদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বাইরে বেড়াতে যাবার সখ মেটাতে আরম্ভ করেন। নৌকায় বা বজরা ক'রে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা-ও তখন পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আমি-ই বাবা ও তাঁর দু' এক জন বন্ধুর সংগে মস্ত এক নৌকায় চ'ড়ে কালনা পর্য্যন্ত পূজার ছুটীতে বেড়াতে যাই ; আর আয়েস ক'রে বেড়াবার জন্য নৌকা গদাইনস্করি চালে চলে, মাঝে মাঝে গংগার ধারে কার-ও বাগানে বা বড় রকম একটা গংগার চড়ায় ছোট তাঁবু খাটিয়ে রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ত ; এই রকম ভাবে কালনায় পোঁছুতে প্রায় দিন ছয়েক লেগেছিল। ৭১ সালে-ও রাঢ় ভুমিতে ম্যালেরিয়া শেকড় গাড়েনি, সুতরাং কলকাতার ভদ্রলোক সুখচর, চুঁচুড়া, ফরাসডাংগা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে পূজার ছুটীতে বেড়াতে যেতেন। তখন বর্দ্ধমান থেকে লোক বেড়িয়ে ফিরে এলে-ও পাড়ার পাঁচজন এসে সেখানকার রাজবাড়ী, শ্যামসায়র, গোলাপবাগ, গোলকধাঁধা, সুন্দরের সুড়ংগ প্রভৃতির গল্প শুনতে আসত ; আর যিনি রাজমহল ভাগলপুর মুংগের পর্য্যন্ত ঘুরে আসতেন. তিনি ত একেবারে নূতন বিলেতফেরত W. C. Bonnerjee। সখ, সংগতি বা সুহৃদ যাঁদের নিয়ে যেতে পারলে, তাঁরা ত্রয়োদশীর দিন-ই কলকাতা থেকে শুভযাত্রা করলেন, বাকি বেশীর ভাগ বাড়ীতে ব'সে-ই ছুটী কাটাবার যা হোক একটা উপায় ক'রে নিলেন। স্কুলের পণ্ডিত মশাইরা পূজার কয় দিন প্রায় কোন না কোন বাড়ীতে ব্রতী ছিলেন, এখন টোল বন্ধ ক'রে দেশে গেলেন ;

মাষ্টারমশাইরা বাড়ীর ও-পাড়ার ছেলেদের ধ'রে ধ'রে ঘরে পুরে সমস্ত দুপুর বেলাটা পুরাণো পড়া পড়াতে আরম্ভ করলেন, আর কেরাণীরা ঘরে বসেও কেরাণীগিরির মহলা দিতে লাগলেন। কেরাণী তখনও ছোট কথা হয়নি, কেরাণী কথার সঙ্গে তখন-ও মর্য্যাদা মাখান ছিল; তখনও বাঙ্গালীরা হাতের লেখার চর্চ্চা কলাবিদ্যার হিসাবে করতেন। মেল-রাইটার, বুক-কিপার তখনকার বড় চাকুরে, এঁরা ৩।৪ দিন অফিস কামাই করলে অনেক সময় আফিসের সাহেব তাঁদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত দেখতে ছুটে আসতেন; সালঙ্কার ওল্ড ইংলিশ লিপিকর্ম্ম-পটু উকীল পাড়ার কেরাণী গয়ংগচ্ছ ক'রে বেলা ১২টার পরও অফিস পেঁছুলে 'সুইন হো এণ্ড ল' জাতীয় মনিবগণ তাঁদের বড় একটা বেশী বকুতে-টকুতে পারতেন না, তখন যাঁদের বাড়ীতে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল, তাঁদের বাড়ীতে একটা বা ততোধিক মাদুরে ব'সে লেখবার উপযোগী ডেক্স থাকত। অনেক কেরাণী-ই তখন হাতে বাঁধা পাগড়ী মাথায় দিয়ে আফিস যেতেন; পাগড়ী একটা ইজ্জতের চিহ্ন, তখনকার রিপুকর্ম্ম দরজী ও নাপিত-ও মাথায় পাগড়ী বাঁধত। নিত্য আহারের পর মাথায় পাগড়ী বাঁধা অভ্যাস হওয়ায় কেরাণীরা ছুটীর দিনও আহারের পর মাথায় একটা চাদর জড়াতেন, না হ'লে তাঁদের উদ্ধর্ক হ'ত; সেই চাদর মাথায় জড়িয়ে তাঁরা বসে যেতেন ডেক্স নিয়ে সমস্ত দিন ধ'রে ব'সে লিখতে; অভ্যস্ত কর্ম্ম ছুটীর খাতিরে স্থগিত রাখলে পাছে লেখা খারাপ হয়ে যায়, আর আলস্যে ঘুম আসে, এই আশঙ্কায়-ই তাঁরা লেখা কায পারতপক্ষে বন্ধ রাখতেন না। গোবা ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে, তাঁরা সোমবারে কোন নূতন কায আরম্ভ করেন না; ইহার কারণ বোধ হয়, রবিবারে বিশ্রামের পর সোমবারে মিস্ত্রি ও কর্ম্মীদের হাত একটু জড়সড় থাকে। ইষ্টমন্ত্র জপ থেকে কুটনোকোটা মাটী-খোঁড়া প্রভৃতি সকল কায-ই নিত্য অভ্যাসের ফলে ধোপদস্ত থাকে।

আমরা ছেলেরা ত কবে ছুটী ফুরুবে, সেই দিন গুণতে আরম্ভ করিছি, একে বাড়ীতে-ও সেই nominative governs the verb আছে,—$(\frac{3}{4}+\frac{1}{8}+\frac{9}{12})\div(\frac{2}{3}+\frac{7}{18})$ গোছ অঙ্ক কসা আছে। তার উপর নূতন জুতো, ক্লাস-ফ্রেণ্ডদের দেখাতে পারছিনি,—স্কুলটা যদি নিদেন এক দিনের জন্য খুলে আবার বন্ধ হয়, তা হ'লে বাঁচি।

ভাগ্যে কোজাগর পূর্ণিমা এসে পড়ল, তাই কতকটা আবার উৎসাহ এল।

দশভুজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে-ই সন্দেশের অন্তর্ধান ও নারিকেল-ছাপার আবির্ভাব, কোজাগরের রাত্রিতে সেই নারিকেলছাপা আর তার সঙ্গে ঝুনা-নারিকেল চিঁড়ে আর তালের ফোঁফল ভক্ষণে একটা নূতন আমোদ, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আমোদ ঐ দিন শেষ রাত্রে আমরা যাত্রা শুনতে পাব, পাড়ায় মৈত্র মশাইদের বাড়ী খুব ধূমধামে দুর্গোৎসব হ'ত, ঐ তিন দিন খিচুড়ী, সাদা ভোগ ও লুচি মিঠাইএর দীয়তাং ভুজ্যতাংএর ভিড়ে রাজু ঢুলীর ঢাকঢোল ছাড়া আর কোন প্রকারের আমোদের বন্দোবস্ত থাকত না। যাত্রা হ'ত কোজাগরের রাত্রে। সাজ বাজনা আরম্ভ হ'ত বটে রাত দুপুরের পর-ই, কিন্তু আমরা রাত্রি ৩/৩॥টার আগে যাবার হুকুম পেতুম না।

এবার নিমাই দাসের যাত্রা, পালা রাবণবধ। আমরা পেঁছিলুম, তখন আসরে "দা দিনি দো দিনিকু দিদো" বাজনার বোল চলছে, আর রাবণ একখানা টিনের তরোয়াল হাতে ক'রে লম্বা লম্বা পা তুলে ফেলে নাচছে। এখনকার পাঠক, তোমরা রাবণ কখন দেখতে পেলে না, এটা আমার একটা বড় আপশোষ। থিয়েটারে যে বেহারী চাটুয্যে, অমৃত মিত্তির, ক্ষেত্তর ফেত্তর ওরা কি আর রাবণ,—যেন মাণিক-পীর! রাবণ দেখেছি আমি আর আমার সেকালের সেই খেলুড়ীরা। রাবণ পরেছেন ইজের, তার উপর শালুর লম্বা ঝুলদার চাপকান, মুড়োয় সব চওড়া জরির ফিতা লাগান, আর নিজের মুখে একটা মস্ত মুখোস, আর ঘাড়ের দিক থেকে লাগান যেন একখানা ছোটখাট টানাপাখা, সেই টানাপাখায় দু'দিকে আর আটটা মুখ আঁকা, ঘাড়ের পিছন দিকে আর একটা মুখোসের মুখ। আরে বাপু রে! রাবণের মত রাবণ বটে! আর সেই রাবণ নাচছে "দা দিনিদো দিনিক দিদো"—সেই নাচটা হচ্ছে তার বীররস—সেই নাচের বীররসের ঝাঁঝ কতকটা এদানীকার সখীদের পায়ে নেমেছে। কিন্তু নিমাই দাসের রাবণের চেয়ে বিখ্যাত অভিনেতা ছিল তার মন্দোদরী। মন্দোদরীর নাম ছিল ঝোড়ো; ঝোড়ো নাচতে গাইতে বলতে সব দিকে মজবুত, ঝোড়োর নাচের বিচিত্রতার কথা বোধ হয় আমি প্রবন্ধান্তরে বলেছি, সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বর্ত্তমান যুগে থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতাদের মুখের উপর ইলেকট্রিক লাইট দেওয়া ফেসান হয়েছে, কিন্তু আমাদের সেকালে বাঙ্গালা লেখাপড়া করা, সুতরাং অশিক্ষিত, যাত্রাওয়ালারা আর্টের এই কদরটুকু জানতেন; যাত্রা হ'লেই দু'জন মশালচি আনাতে হ'ত, তারা দু'দিক থেকে দু'টো জ্বলন্ত মশালের আলো

প্রধান প্রধান 'গায়ক ও অভিনেতাদের মুখের সামনে ধ'রে থাকত। বালক-বালিকা শ্রোতাদের যাত্রার আসরে একটু বিশেষ কায ছিল, গান আরম্ভ হ'লেই শুয়ে প'ড়ে নাক ডাকান আর সং এলেই তড়াক ক'রে উঠে ব'সে আনন্দ আহ্লাদের হাসিতে আসর আলো ক'রে দেওয়া। নবীন নাট্যকারগণ, সহজ-মানবপ্রকৃতির এই বাল লক্ষণ দেখে আপনারা অঙ্ক সাজাবার একটা ইঙ্গিত পেতে পারেন।

অধিকারী মশাইরা এই প্রাচীনকে মাফ করবেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কার পরামর্শে কোন্ বে-রসিক ধনীর বিদঘুটে সখ মেটাবার চেষ্টায় আপনারা সেই গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ নীলকণ্ঠ মার্জ্জিতরুচি মতি রায় ভূষণ দাস প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত প্রথা পরিবর্ত্তিত ক'রে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা নাম দিয়ে এই কাঁঠালের আমসত্ব, ছোকরার গান দোয়ারকী প্রভৃতি বাদ দিয়ে একটা কিম্ভূত পদার্থ সৃষ্টি করেছেন ?

১১

ছুটী ফুরোল, স্কুল খুলল, বাঁচা গেল। স'বাজারের মোড়ের দোকান থেকে এক পয়সা দিয়ে এক পাত মাখম আনিয়ে চীনের বাড়ীর বার্ণিস করা জুতোয় ভাল ক'রে মাখিয়ে বই শ্লেট নিয়ে স্কুলেতে যাওয়া গেল। সে দিন আর স্কুল বসবার আগে উঠানে দোড়োদৌড়ি নেই, পরস্পরের জুতোয় জুতোয় মিলনো, আমার চেয়ে যা'র জুতো জোড়াটি ভাল, তা'র উপর মনে মনে হিংসা, আর যা'র জুতো আমার চেয়ে একটু নিরেশ, তা'র পানে চেয়ে মনে মনে একটু গর্ব্ব। ক্লাস বসল, মাষ্টার মশাই এলেন, তাঁ'কে সবার প্রণাম ; নজর তাঁর হাতের বেতের প্রতি, আর পায়ের প্রতি, জুতোর প্রতি নয়। এখনকার বাবাজীরা মাষ্টার ক'টাকার জুতো পায়ে দিয়েছে, তা নজর ক'রে দেখে, মাষ্টার পণ্ডিতের মাইনের খবর নেয়, হেডমাষ্টার হে'টে স্কুলে এলে মনে মনে তাঁ'কে একটু অবজ্ঞা করে ; বেচারীদের বিশেষ দোষ নেই ; প্রহারের পাট উঠে গেছে, ছেলেদের উপর মাষ্টার যদি একটু চোখ রাঙালে, গোপাল অমনই ভ্যা ক'রে কে'দে জানালে, আর মায়াময়ী পিসীমা বললেন, "অহহ ! কোথাকার পোড়ার-মুখো মাষ্টার, আমার ননীর বাছাকে বকে, জানে না মিনষে—ক' টাকা বা মাইনে পায়।" বাড়ীতে এই শিক্ষা পেলে ছেলের আর কি সদ্গতি হবে ? আমাদের বাপ-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, পিসী-মাসী বলতেন, মাষ্টার পণ্ডিত

গুরুলোক বাপের মতন, তাঁদের মান্য করতে হয়, সুতরাং তাঁদের জুতো কাপড়ের দামের উপর নজর-ও পড়ত না, আর অন্ততঃ ১২ বছর বয়সের আগে মাষ্টারদের আবার যে মাইনে আছে একথা-ও মনে উঠত না। শিক্ষককে একটু ভয় করতুম, সংগে সংগে একটু ভক্তি-ও আসত। একটু ভয় না থাকলে সংসারী লোক ঈশ্বরকেই ভয় করে না, তা মানুষ কোন্ ছার। কলকেতায় কোটা বাড়ী হয়ে ব্রহ্মার পূজা উঠে গেছে, কিন্তু 'মা শীতলা' ব'লে মন্দিরে বাজিয়ে ডোমের পণ্ডিত বাড়ী ঢুকলে এক মুটো চাল দিতে-ই হবে, তখন আর ভিখিরী ফেবাবার অব্যর্থ মহৌষধ 'শুভাশৌচ হয়েছে' কথাটা মুখ দিয়ে বার হয় না। আমরা শিক্ষকদের ভয় করতুম, ভক্তি করতুম, ভালবাসতুম, যেমন বাবাকে মাকে ভাবতুম, ঠিক যেন তাই। তাঁ'রা-ও আবার (২।১ জন ছাড়া) আমাদের ঠিক সন্তানেব মত-ই দেখতেন। আমাদেব মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' পড়াতেন যে পণ্ডিত মহাশয়, তাঁ'র নাম ছিল নৃসিংহ পণ্ডিত; ব্রাহ্মণ; স্থূলকলেবর, দীর্ঘাকার. উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুণ্ডিত মুখ আর মাথার ধবধবে চুলের ভার একটি খোঁপায় বাঁধা; কিন্তু প্রায় কোন ছেলে-ই তাঁ'কে পণ্ডিত মহাশয় ব'লে ডাকত না, কেউ বলতে ঠাকুরমা, কেউ জ্যেঠাইমা, কেউ পিসীমা; তাঁর একটি সখের গালাগাল ছিল 'র‍্যাজলা', আর এমনি লম্বা চড় তুলতেন, মনে হ'ত, এক চপেটাঘাতে-ই ভূমিসাৎ, কিন্তু নরম হাতখানি পিঠে পড়লেই পিঠ যেন জুড়িয়ে যেত; ছেলেরা কাঁদলে-ই তিনি কোলে ক'রে বেড়াতেন, পবিত্র দেহমন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের গাত্রে কত শিশু ছাত্র যে মূত্রত্যাগ করেছে, তা বলা যায় না; হায়! সে পণ্ডিত-ও নাই—সে পোড়ো-ও নাই! আর রমানাথ গুরুমহাশয়ের বেত ও তাড়িপাতের বাড়ি প্রহার; প্রৌঢ় বয়সে যখন আসর জমকে বসেছি, তখন-ও সেই সেকালের গুরুমশাই দেখা করতে এলে প্রাণটা যেন ভয়ে ছাঁৎ ক'রে উঠত; আহা! সে ভয়-ও কি আনন্দময়!

১২

'গুরুমশাই' জিনিষটা কি, তা একালের ছেলেদের একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। য়ুরোপে বোধ হয় জার্ম্মাণী-ই প্রথমে জনশিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করলে, স্কুলে পড়তে যেতে-ই হবে, এই রকম আইন-ও হ'ল, বিনা দক্ষিণায় শিক্ষা-দানের-ও ব্যবস্থা হ'ল; ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য দেশ-ও ঐ পথ

সোজাসুজি বা একটু এঁকে বেঁকে অনুসরণ করলে ; আমরা ব'লে উঠলুম, বা বা, কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত, কি মহত্ব ! বিদ্যার প্রতি কি বিপুল অনুরাগ ! এমন ত কোথা-ও কখন দেখিনি,—পোড়া দেশ আমাদের ! যখন রুস-জাপানে যুদ্ধ হয়, তখন জাপানের খবর পড়াটা সকলের একটা বাই হয়ে উঠেছিল ; এক দিন কাগজ খুলে দেখি, জাপানীরা বড় চমৎকার জাতি, এরা পূর্ব্বপুরুষের পূজা করে। আমরা অমনি-ই বললুম, বা, কি আশ্চর্য্য ! আমাদের যে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ না ক'রে, কোন-ও মঙ্গল কায, কোন-ও তীর্থযাত্রা কোন-ও উৎসবক্রিয়া সম্পাদন করতে নেই, সে কথাটা একবার-ও মনে এল না ; আসবে কেমন ক'রে ? আপিসের বেলা হবাব অছিলায় বাপ-মার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের পাট উঠিয়ে দিয়েছি, আর মেয়ের বিয়ের সময় বাড়ী বাঁধা দেবাব দলিলে সই করব কি নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের ভুজ্জি সাজাব, তাই ঠিক করতে পারিনি, কাযে-ই পূর্ব্বপুরুষের পূজা না ক'রে যে হিন্দুকে কোন কার্য্য-ই করতে নেই, এ কথাটা জাপানের খবব প'ড়ে-ও নিজের মনে উঠল না।

দরখাস্ত লিখতে আমাদেব মত মজবুত জাত জগতে আর আছে কি না সন্দেহ ; প্রথম ইংরাজী শিক্ষার আমল থেকেই—"Being given to understand that there is a vacancy in your honorable lordship's office ব'লে যে চাকরীর দরখাস্ত লিখতে শিখেছি, আজ লাটসাহেব থেকে পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত সেই দরখাস্ত লেখা-ই চলেছে। বিলাতে যখন আইন ক'রে জনশিক্ষা চলেছে, তখন আমাদের দেশে জনশিক্ষা চাই ব'লে গবর্ণমেণ্টকে দরখাস্ত পাঠান হ'ল। কি আইন-ই চাইতে শিখেছি আমরা, আর কি আইন-ই করতে শিখেছে ইংরাজরা ! এক এক জন লাটের এক একটা আইন মজলিস; আর ফি মজলিস ৪ শত ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন চালিয়ে মাসে মাসে আইন তৈরী করছে ! ধান গম পাট চাষে হাজা শুকো আছে, এ পোড়া আইন বন্যাতে হেজে-ও যায় না, অনাবৃষ্টিতে-ও জ'লে যায় না ! বিদ্যাশিক্ষা ভিক্ষা করতে ভারতবাসী কি বাঙ্গালী যে কখন রাজার দরজায় গিয়ে 'জয় রাধে কৃষ্ণ' ব'লে ধামি হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছে, এ কথা ত কখন শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। উচ্চশিক্ষা দিতেন পণ্ডিতরা টোল ক'রে ছাত্রদের অন্ন খাইয়ে, আর সাধারণের বৈষয়িক ও নৈতিক শিক্ষার জন্য নিযুক্ত হতেন গুরুমহাশয়।

গুরুমহাশয়কে সাধারণে তিনটি নামের মধ্যে যা হয় একটা নামে অভিহিত

করতেন ;—যথা, 'গুরুমশাই', 'মশাই' বা 'সরকার'। পশ্চিম বাঙ্গালায় অধিকাংশ গুরুমশাই আমদানী হতেন বর্দ্ধমান অঞ্চল হ'তে। গ্রামের আয়তন বুঝে প্রত্যেক পল্লিতে-ই এক হ'তে ৫।৭টি পর্য্যন্ত পাঠশালা বসত, এই কলকেতা সহরেও পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা ছিল ; যে গৃহস্থের বাড়ীতে একটা দালান, উঠান ও গুরুমশাইকে শুতে দেবার একটা খালি ঘর থাকত, তিনি-ই প্রায় মাসিক ৪।৵ টাকা বা তার-ও কম বেতন, গ্রাসাচ্ছাদন ও থাকবার একটা ঘর দিয়ে এক জন গুরুমশাই নিযুক্ত করতেন। গুরুমশাইরা প্রায় কায়স্থ জাতি হতেন, ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতীয় গুরুমশাই ছিলেন, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। গৃহস্থরা বাড়ীতে যে বিদ্যালয় বসাতেন, তা'র নাম ছিল পাঠশালা, সাদা কথায়—পাঠশাল। সেকালে 'শালা' স্থলে 'শাল' শব্দ ব্যবহৃত হ'ত, যথা ;—পাকশাল, ঢেঁকিশাল, ঘোড়াশাল, হাতিশাল, এখন-ও কোন কোন "শালা" বোনের বাস্তুতে এসে বাঁশগাড়ি ক'রে ভগ্নীপতির "শাল" হয়ে দাঁড়ান।

পাঠশালে পড়ত গৃহস্থের নিজের বাড়ীব ছেলেরা আর পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে ; এই কলকেতা সহরে-ই যখন মেয়ে স্কুলের এত ধুমধাম হয়নি, তখন আমি ভাইবোনকে একসঙ্গে তাড়ি বগলে পাঠশালে যেতে দেখেছি। পাঠশালে বর্ণভেদ-ও ছিল না, স্বর্ণভেদ-ও ছিল না ; জমিদার, মহাজন, সরকার, গোমস্তা, কারকুন, কেরাণী, মুহুরি, দোকানদার, কৃষক, মুটে, আবার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক, গোপ, কৈবর্ত্ত, দুলে, বাগ্দী সবার-ই ছেলে-মেয়ে এক দালানে বা উঠানে ব'সে লিখত। লিখা আরম্ভ হ'ত তালপাতে, শেষ হ'ত কাগজে—মধ্যে কলাপাত। প্রত্যেক পোড়োকে-ই নিজের বসবার মত ছোট মাদুর কিনতে হ'ত, সেই মাদুরে লিখবার তালপাতাগুলি জড়িয়ে বগলে ক'রে পোড়োরা পাঠশালে যেত। কলকেতায় অবশ্য তালপাত কলাপাত কিনতে হ'ত, কিন্তু পল্লীগ্রামে কারুর বা বাড়ীর চাকর-বাকর, কারুর বা বাপ-খুড়ো গাছে উঠে কেটে দিত। কলম ছিল কঞ্চির, কল্মীর বা শরের ; এই কল্মীশাক, যা আজকাল আমরা কলকেতায় এক পয়সায় ছোট্ট একটি আঁটি কিনে সড়সাড় ক'রে খাই, তারির-ই পাকা শক্ত ডাল থেকে যা কলম হয়, তা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কল্মীশাক পুকুরে হয়, এ কথাটি ব'লে দি ; নইলে কলকেতার কোন গ্রাজুয়েট মাষ্টার মনে করতে পারেন, কল্মী হয় ত আইভির সঙ্গে বিলেত থেকে আমদানী। দোয়াত ছিল —মাটী, চীনেমাটী, দস্তা কিংবা পিতলের ; আমার একটি সহপাঠীর পিতলের

দোয়াতের প্রতি এত লোভ ছিল যে, সেটি যে চুরি করিনি, ধর্ম্মভয়ে কি ধরা পড়বার ভয়ে, এখন ঠিক মনে হয় না। গুরুমশাই প্রথম শিক্ষা দিতেন তালপাতে দাঁড়িটানা, তা'র পর একে একে ছেলেদের হাত ধ'রে নিজে ক খ লিখে পোড়োদের তা'র উপর দাগা বুলুতে বলতেন। তা'র পর ক্রমে ক কিও (ক্য) কর (ক্র) কল (ক্ল) আঙ্ক (ঙ্ক) আস্ক (স্ক) ইত্যাদি ফলা বানান। ফলা বানান শেষ হ'লে আরম্ভ হ'ত নাম লিখা। ঠাকুরদেবতার নাম, নিজের পিতৃপুরুষের নাম; 'গদাধর' 'হলধর' 'ভজহরি' থেকে সুরু ক'রে 'রুক্মিণীকান্ত' 'জনার্দ্দন শর্ম্মা' 'গোবর্দ্ধন গাঙ্গুলী' প্রভৃতি নানাবিধ বানানের নাম; যখন এ সব নাম লিখতে আরম্ভ করেছে, তখন ছেলেরা কলাপাতের ক্লাশে উঠেছে। এদেশের কাগুজী মুসলমানরা পুরোনো কাগজ ভিজিয়ে তা'র মাড় বার ক'রে এক রকম কাগজ প্রস্তুত করতো, তা'র নাম ছিল বাঙ্গালা কাগজ; ছেলেদের পাঠশালে লিখা থেকে কাছারী গদীর খাতাপত্র পর্য্যন্ত সেই কাগজে প্রস্তুত হ'ত। হাতিবাগানে যে জমীতে এখন ষ্টার থিয়েটার, সেইখানে অনেক কাগুজে মুসলমানের বাসা ও কারখানা ছিল। আতপ চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে চুঁইয়ে তা থেকে লিখবার বাঙ্গালা কালি তৈরী ক'রে দিতেন পোড়োদের মা-ঠাকুরমারা-ই। কাগজে লিখা সুরু হ'ত 'সেবকশ্রী' 'মহামহিম' 'পরম-পূজনীয়' প্রভৃতি পাঠ দিয়ে পত্র লিখা থেকে আর শেষ হ'ত 'দলিল' 'কওলা' 'কব্‌চ' 'দাখিলা' 'দানপত্র' 'বন্ধকী-পত্র' লিখার পর। আর একটা লিখাব যন্ত্র সে সময় ছিল বলতে ভুলে গিয়েছি, তা'র নাম 'রামখড়ি'; দেখতে কতকটা পটোলের মত লম্বা এক রকম নরম পাতর, মেঝেতে টানলে সাদা দাগ পড়ে; এখন-ও বোধ হয় বেণের দোকানে পাওয়া যেতে পারে। ছেলে পাঁচ বছরে পড়লে-ই গৃহস্থরা তা'র হাতে খড়ি দেওয়াতেন; শ্রীপঞ্চমী বা অন্য কোন একটা শুভদিনে হাতে-খড়ি হ'ত; পুরোহিত আসতেন, নারায়ণের পূজা, সরস্বতীর আরাধনা, হোমাদি সম্পাদনের পর ছেলেকে ঐ রামখড়ি ধরিয়ে তা'র হাত হ'তে প্রথম অক্ষর বার করা হ'ত; সেদিন গ্রাম্য গুরুমহাশয়-ও একটি বড় রকম ভোজ্যপাত্র পেতেন।

পড়বার একখানি বই ছিল, তা'র নাম 'শিশুবোধক'; ঐ নামে বটতলায় এখন-ও এক রকম বই পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলা খাঁটি 'শিশুবোধক' নয়, অপুষ্ট বিকৃতদেহ-গর্ভস্রাব মাত্র। আসল শিশুবোধকে থাকত প্রথমে-ই অক্ষর-

পরিচয়, পরে ফলা বানান, যুক্ত অক্ষর। এখন বাঙ্গালা স্কুলে-ও আলাদা দ্বিতীয় ভাগ পড়ান উঠে গেছে, তাই ছাত্রবৃত্তি পাশ করে-ও কোন কোন ছেলে 'তদ্ধেতু' বানান করে 'তদ্‌ধেতু' লিখে। যুক্ত অক্ষরগুলির সঙ্গে বালক ভালরূপে পরিচিত হবার পর তা'র কথাসাহিত্য পাঠ আরম্ভ হ'ত ঐ শিশুবোধক হ'তেই। কথাসাহিত্যে প্রথম থাকত গঙ্গা-বন্দনা,—

"বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী";

শিশুবোধকের এই 'বন্দ মাতা' শব্দটিকে-ই বঙ্কিম বাবুর "বন্দে মাতরম্" শব্দের আদি পুরুষ ব'লে মনে হয়। গঙ্গার বন্দনার পর আসত "গুরুদক্ষিণা"; শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বাল্যজীবন বৃন্দাবনে গোচারণে ও ননীহরণে যাপন করেছেন, বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই, মথুরার সিংহাসনে ব'সে সভাসদ্‌গণের পাণ্ডিত্য দেখে তাঁদের মনে আপনাপন বিদ্যাভাবের জন্য লজ্জার উদয় হ'ল, সেই জন্য তাঁ'রা রাজমর্য্যাদার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে সাধারণ বালকদের সঙ্গে ব'সে সন্দীপন মুনির পাঠশালায় পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হলেন। পরমপূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জ্ঞানপিপাসার এই আদর্শটিকে পরিত্যাগ ক'রে মেষপালক ভুবালের চরিত্র লিখে হিন্দু-সন্তানগণকে আশীর্ব্বাদ করলেন। বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশঙ্কা হয়েছিল যে, এই গল্প পড়লে দেশের বালকগণের মনে একটা কুসংস্কার জন্মে যাবে, কারণ, ঐ গুরুদক্ষিণার শেষটা অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। রাজশিষ্যরা গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করায় সন্দীপন মুনি তাঁ'র জলমগ্ন ও কুম্ভীরভক্ষিত পুত্রের জীবন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে আজ্ঞা করেন, আর শ্রীকৃষ্ণ কুম্ভীরের উদর চিরে গুরু-পুত্রের দেহকে পুনর্জীবিত ক'রে দক্ষিণা দান করেন;—এটা ঘোরতর অসম্ভব কথা। কিন্তু ইংরাজরা অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনাপূর্ণ পরীর গল্পের পুস্তক নিজ নিজ শিশুপুত্রদের নির্ভয়ে পড়তে দেন, আর সেই পাপের ফলে চিরকাল যে কোন ইংরাজ নরনারী 'ফেয়ারী টেলে' বিশ্বাসবান্ থেকে আপন জীবন নষ্ট করে, এমন ত শুনা যায় না। তা'র পর দাতা কর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্রাদি প্রাঠ। পরে ঐ পুস্তকে-ই পত্রলিখন-প্রণালী, দলিল, কচ কবলাদি লিখনপ্রণালী থাকত; এর দ্বারা ছেলেরা নিজে নিজে-ই আপনাদের এটর্ণীগিরি আপনারা কর্‌বার মত কতকটা শক্তি লাভ কর্‌তে পারত। শেষে থাকত সব্যাখ্যা চাণক্য-শ্লোক; বড় হ'লে সভায় ব'সে দুটা সংস্কৃত নীতিবচন-ও দরকারমত ছেলেরা

আউড়ে দিত। ঐ শিশুবোধক-ই আবার অঙ্ক-পুস্তক; শটকে, কড়াঙ্কে, গণ্ডাকে, বুড়কে, সেরকে, মণকে, নামতা, সইয়ে, আড়াইয়ে, তা'র পর তেরিজ, জমাখরচ, গুণ, ভাগ, বাজারদরকষা, সুদকষা, কাঠাকালি, বিঘেকালি, পুস্করিণীকালি, ইটের পাঁজাকালি প্রভৃতি গৃহস্থ, দোকানদার, মহাজন, জমীদার, মুহুরী, গোমস্তা প্রভৃতির নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারিক অঙ্ক সমস্ত-ই ঐ পাঠশালায় শেখান হ'ত। এখন ছেলেরা শেখে গরিষ্ঠ-সাধারণ-গুণনীয়ক আর কনিক্‌সেক্‌সান, তা'র পর এগার টাকা মাইনের চাকরের তের দিনের মাইনে চুকিয়ে দিতে হ'লে ছোটেন বৌমার কাছে।

এক কথায় পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত ক'রে যে ছেলে বেরুত, সংসারী লোকের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়-ই সে এক রকম মোটামুটি শিখে নিত। সকল ছেলে কিন্তু শেষ অবধি পড়ত না; মোটামুটি খানিকটা লিখতে পড়তে গুণতে শিখলেই চাষাভুষো ছোটখাট দোকানী কারিগর প্রভৃতি লোক তাদের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিজের নিজের কর্ম্মে শিক্ষায় ভর্ত্তি ক'রে নিত। পাঠশালায় ছেলেদের বেতন দিতে হ'ত মাসিক দু'পয়সা থেকে চার আনা পর্য্যন্ত। তা ছাড়া যে যার ক্ষমতা বুঝে গুরুমশাইকে প্রতি পাল-পার্ব্বণে, বিশেষতঃ পৌষসংক্রান্তি শ্রীপঞ্চমী, দুর্গোৎসবের সময় একটা ক'রে সিধা, নারিকেল, গুড়, গামছা, কাপড় ইত্যাদি উপহার দিত। বাড়ীর গাছে লাউ, কুমড়া, বেগুণ, কলা, এ সব ফললে বা পুকুরে মাছ ধরলে গুরুমশাই তার-ও একটা ভাগ পেতেন; ফলতঃ তখনকার গুরুমশাই, বৈদ্য, রজক, নাপিত, পুরোহিত-টুরোহিতকে গৃহস্থরা নিজ পরিজনের এক জন বলিয়া গণ্য করতেন। যে চাষার ছেলে পাঠশালা থেকে হাত তৈরী ক'রে হিসেব-দোরস্ত হয়ে বেরুত, পরিবার মধ্যে তা'র একটা বিশেষ আদর ও সম্মান লাভ হ'ত; সর্ব্বকনিষ্ঠ হ'লে-ও সে ভাত খাবার সময় বসবার জন্য একখানা পিঁড়ে আর ভাতের পাতে আলাদা একটু লবণ পেত; সংসারে তা'র খেতাব হোতো "দরবেরে" অর্থাৎ রাজ-কাছারিতে কাযের কথা কওয়ার উপযুক্ত। বিদ্যার যে একটা সম্মান আছে, বাংগালার চাষার মেয়েরা-ও এ কথা জানত।

বৎসরের মধ্যে পাঠশালে সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব ছিল মকর সংক্রান্তির দিবস। পোড়োদের গংগার বন্দনা গাইতে গাইতে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে সুরধুনীসলিলে বা অন্য নদী বা পুস্করিণীতে স্নান। এই থেকেই বন্দ মাতা-দলের সৃষ্টি।

আজকাল কলকেতায় বন্দ মাতার দল বেরোয় বেলা ১২টার পর, সং সাজে আর গান গায় বুড়ো বুড়ো মুস্কো জোয়ানরা, কিসের কি একটা গন্ধ যেন মাঝে মাঝে বেরোয়, মাঝে যতটা দাঙ্গা-মারামারি হ'ত, এখন ততটা নেই। এই জনশিক্ষার ভিতর কম্পলসারী আইন-ও ছিল, কিন্তু ধরপাকড় ধাক্কা দেওয়ার কাযটা পুলিসের হাতে না দিয়ে গুরুমশাই নিজের হাতে রাখতেন। 'ফেলিওর কথাটা পাঠশালে ছিল না, ছেলেটাকে কিছু না কিছু শিখতেই হবে, নয় গ্রাম ছেড়ে মামার বাড়ী, পিসীব বাড়ী পালাতে হবে। পোড়ো পাঠশাল কামাই করলেই গুরুমশাই অনুপস্থিত পোড়োর দৈহিক শক্তি বুঝে ৪ হ'তে ৬।৭টি বলবান্ পোড়োকে তা'কে ধ'রে আনতে পাঠাতেন, পোড়োরা ধরতে আসছে দেখে পলাতক লুকাল বাঁশঝাড়ের আড়ালে, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে উঠল তেঁতুলগাছের উপর, পোড়ো-পাহারাওয়ালারা-ও পাছু পাছু গাছে উঠল (পুলিসের পাহারাওয়ালার বাবার সাধ্য নেই যে তা করে), তেঁতুলগাছের ডাল বেয়ে আসামী ধরলে আমগাছের ডাল, সে ঝুলছে, সকলের হাত ছেড়ে দিলে মাটীতে ঝম্প, সেখান থেকে এক দৌড়ে পোড়ো পড়ল পুকুরের জলে, খানিক ডুবে রইল, কেউ দেখতে পায় না। যেই উঠল ভেসে, অন্য পোড়োরা-ও পড়ল ঝাঁপিয়ে, সাঁতবে পুকুর পার হয়ে দুষ্ট ছেলে দৌড়ে নিজেদের রান্নাঘরে ঢুকে মায়ের আঁচল ধ'বে চীৎকার ক'রে কাঁদতে আরম্ভ করলে ; মা বলে, 'ও বাবা, আজকে ছেড়ে দে, কাল আমি কোঁচড়ে জলপান বেঁধে দিয়ে পাঠশালে পাঠিয়ে দেব', গুরুমশায়েব পুলিস বলে, "মাসি, তুমি ও সব কথা বলো না, মশাই হুকুম দেছে, আমরা ধ'রে নিয়ে যাব, তুমি কথা কবার কে ?" মা-ও কাঁদে, বেটা-ও কাঁদে, কিন্তু সে শুনে কে ? দু'জনে দু'খানা হাত আর দু'জনে দু'খানা পা ধ'রে ঝোলাতে ঝোলাতে নে' গে' পাঠশালে পেঁছে দিলে, বলে, "গুরুমশাই, গুরুমশাই, তোমার পোড়ো হাজির, এক দণ্ড ছুটী দাও জল খেয়ে আসি।" সুর ক'রে এই অপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবৃত্তি করার পর ধৃতকারী বালকরা মিনিট পাঁচ সাত আড়ালে গিয়ে ছুটাছুটি করবার অবসর পেলে, এইবার পলাতকের শাস্তিবিধান।

১৩

অবাধ একজিকিউটিভ ক্ষমতা হাতে পেলেই অথরিটির কতকগুলি দোষ জন্মে

যায়। অল্প মদ খেলে একটু নেশা হয়, তাতে স্ফূর্ত্তি আছে, উত্তেজনা আছে ; শক্তিসঞ্চার-ও আছে ; আর সেই মদ বেশী খেলে-ই লোক মাতাল হয়, তাতে বে-ফাঁস কাজে বকুনি আছে, ঝগড়া-মারামারি আছে, শেষ নর্দ্দামায় প'ড়ে ডোরাটানাও-আছে। অতিরিক্ত মদ খেয়ে যে বলে, আমি মাতাল হইনি, সে যেমন মিথ্যাবাদী, অতিরিক্ত ক্ষমতা পেয়ে যে বলে, উৎকট ব্যবহার করি না, সে তেমন-ই সত্য কথা কয় না। কবে ঘি খেয়েছেন, আজ-ও হাতে গন্ধ ; অধিক শক্তি সঞ্চার ক'রে দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিরা শাপ দিয়ে ভস্ম ক'রে গেছেন ব'লে আজ-ও পাচক পাঁউরুটীওয়ালা বামুনরা পৈতে ছেঁড়বার ভয় দেখান। মদের নেশা এক রাত্রি ঘুমুলে পরে কাটে, ক্ষমতার নেশা বোধ হয় যুগান্তরে-ও কাটে না। এ দেশে রাজপ্রতিনিধি বড় লাট সাহেবের-ও যে ক্ষমতা নাই, একজন পুলিস পাহারাওয়ালার-ও সে ক্ষমতা আছে ; বড় লাট তাঁহার পদমর্য্যাদা ও সৎ শিক্ষার প্রভাবে এবং আইনের বিধিতে-ও এক জন সামান্য লোককে-ও একটা শক্ত কথা বলতে পারেন না, কিন্তু পাহারাওয়ালা সাহেব অনায়াসে এক জন পথচারী দেশীয় ভদ্রলোকের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যেতে পারে, কটু গালি দিতে পারে, প্রত্যুত্তরে যদি ভদ্রলোক তাকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করেন, তবে ধৃত ভদ্রলোকের ডবল সাজা হয়।

প্রভুত ক্ষমতা হাতে থাকায় গুরুমশাইরা ছাত্রদের দণ্ডবিধানের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অতিশয় মূল্যবান ঘোড়াকে-ও তা'র অশ্বত্ব স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে চাবুকের চেহারা দেখাতে হয়, তেমন-ই ছাত্রদের বালকত্ব বজায় রাখবার জন্য শিক্ষকের হস্তে একগাছি বেত্র থাকা প্রয়োজন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করি, কিন্তু বেত্রাঘাতে ছাত্রের চর্ম্মের ভিতর সংশিক্ষা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এটা দানবীয় কল্পনা। অনেক গুরুমশাই ছাত্রদের শাসিত করতে গিয়ে নিজের মানবত্ব ভুলে যেতেন। তাঁ'দের ব্যাকরণের প্রথম সূত্র ছিল, বেত্র। ছেলেদের হাজরে লিখা বা গোণা পর্য্যন্ত ঐ বেত্র দ্বারা সম্পাদিত হ'ত। যে ছেলে প্রথম হাজির হ'ত, তা'র হাতের তেলোয় বেতের একটি নরম গোঁজা, তা'র নাম 'শনি্য' ; দ্বিতীয় হাজিরের হাতে এক ঘা, তৃতীয়ের দু'ঘা, ক্রমে ১২।১৪।২০।২৫ ঘা, আর লেটের মিনিটের পরিমাণে আঘাতের তীব্রতা-ও বর্দ্ধিত হ'ত। সাজা ছিল, হাতে পিঠে বেত্রাঘাত, চেয়ারের মত দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসা, তা'র

নাম ছিল চিলে বসা; এক পায়ে কান ধ'রে দাঁড়ান, ডান হাতের তেলোয় একখানি ইট দিয়ে নাড়ুগোপাল হয়ে বসা, বিছুটী গাছ জলে ডুবিয়ে কোমরের নীচের কাপড় তুলে তার-ই দ্বারা আঘাত ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া গুরু-মশাইদের দোষ ছিল, ছেলেদের বাড়ী থেকে তামাক চুরি ক'রে আনতে বলা, শালা প্রভৃতি অবৈধ সম্বন্ধ পাতিয়ে গালাগাল দেওয়া প্রভৃতি। এগুলো কতকটা গুরুমশায়ের দোষ, কতকটা সময়ের-ও দোষ।

১৪

গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন পৌঁছেছে যে, জনশিক্ষা দেশে চালাতে-ই হবে; গবর্ণমেণ্ট-ও একটা বৃষোৎসর্গের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছেন। ইংরাজী মেজাজ ছোট বাড়ী, কম লোকলস্কর এ সব দেখতে পারে না, তাই হাঁসপাতাল ক'রবার সময় রুগীর ভাল ওষুধ, পুষ্টি ও রুচিকর পথ্যের যোগাড় করবার আগে প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর বন্দোবস্তে বিপুল অর্থ ঢালা হয়, অনাথ-আশ্রমের জন্য-ও ঐ ব্যবস্থা, তার উপর আবার অনাথিনীদের টেনিস খেলবার জন্য হ্যারিসন রোডে বহুবাজার ষ্ট্রীটের মত রাস্তার উপর ১৷৷০ বিঘা ২৷৷০ বিঘা জমি কিনতে হবে। গরীবের ছেলেকে অমনি এনে পড়াবে, তা'রা এমন কিছু শিখে যাবে, যাতে চাষাগিরি, কারিগরী, দোকানদারী প্রভৃতি কায চালাবার মত কতকটা জ্ঞান লাভ হবে, এর জন্য ইন্স্পেক্টারের উপর ইন্স্পেক্টার, তা'র উপর ইন্স্পেক্টার, চাঁচাছোলা বেঞ্চি টেবল এ সব কেন রে বাপু, বেঞ্চিতে ব'সে পা দুলিয়ে "সাবান দিয়া গাত্র পরিষ্কার করিলে ত্বকে আর মলা মৃত্তিকা থাকিতে পায় না", ব'লে যে ছেলে 'স্বাস্থ্যসংস্থাপন' পড়বে, সে কি আর হাল ছোঁবে, রেঁদা ধরবে, না দাঁড়ীপাল্লা হাতে করবে? শিক্ষা-বিভাগ যদি সচেষ্ট হয়ে বাঙ্গালা শুভঙ্করী আঁক ভাল ক'রে জানা, হস্তলিপিকুশল, কাশীদাস কৃত্তিবাসাদি খাঁটি বাঙ্গালা পুস্তক ব্যাখ্যা করতে সমর্থ গুটি কয়েক গুরুমশাই তয়েব করতে পারেন, আর প্রাচীন "শিশু-বোধক" একখানা খুঁজে তা'র একটা পরিশোধিত সংস্করণ করাতে পারেন; তা'র পর একটু চেষ্টা ক'রে জন কয়েক স্বদেশানুরাগী শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা মাস কয়েক মাত্র একটা প্রোপাগাণ্ডা কায চালান, তা হ'লে আবার সহরের এবং গ্রামের অনেক ধনী ও গৃহস্থ সেই গুরুমশাইকে নিযুক্ত ক'রে নিজ নিজ বাটীতে পাঠশালার

পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হবেন। একেবারে বিনা বেতনে ছাত্র কোন কাযের কথা নয়; হাতের অক্ষর দোরস্ত করবার জন্য কাগজে লিখবার সময় 'বিদ্যা অমূল্য ধন' বেশ উপযোগী, কিন্তু কিছু মূল্য না দিয়া যা পাওয়া যায়, গ্রহীতার চক্ষুতে তা'র কোন মূল্য-ই নেই। এই কারণে-ই অন্ততঃ একটা দুয়ানি 'তৈলবট' না দিয়ে আত্মীয় স্মার্ত্তের নিকটে-ও কোন ব্যবস্থাপত্র নিলে যে "ব্যবস্থা" কার্য্যকরী হয় না। ব্যারিস্টারকে-ও একটা 'ফি' না দিলে "আপিনিয়ানের" খাতির নেই। দু'পয়সা থেকে চার আনা মাসিক গুরুদক্ষিণা ধানভানানীব ছেলেরা-ও দিতে পারে, তবে দু' এক জন যারা নেহাত দিতে না পারে, তা'বা না হয় ফিু হ'ল। বৃত্তি বা স্কলারশিপ একেবারে বন্ধ, ঐ বৃত্তি পেতে পেতে-ই লিখাপড়া শিখে 'সাহেবের' দোরে টাকা টাকা ক'রে ছুটে যাওয়াটা সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়।

এ দেশে পুরুষরা কারুর উপর বেশী রাগলে বড় জোর বলে, "জুতিয়ে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব," লাথিমারাটা পুরুষের বড় অভ্যাস ছিল না; ও শাস্তিদানটা কলহপ্রিয়া কামিনীদেরই কস্ত ছিল, "মেয়ে লাথি মেরে দূর ক'রে দেব" এই গ্রাম্যকথাটাই তা'র প্রমাণ; এই জন্য ফুটবল খেলার মত লাথিমারা অভ্যাস করা বোধ হয় আমাদের দেশে ছিল না, সাধারণতঃ গ্রাম্যছেলেরা ভাঁটা খেলত, আপনা-আপনি ঘোড়দৌড় করত, হাঁডুডুডু, কপাটী, গাদি, নিজে ঘুড়ি নাটাই তৈরী ক'রে উড়ান, মোগল-পাঠানের যুদ্ধাভিনয়, পুকুরে ডুব সাঁতার, চীৎ সাঁতার প্রভৃতি শরীরের বলবর্দ্ধক অনেক খেলা খেলত। ছোট ছোট মেয়েরা-ও জল ডিঙ্গাডিঙ্গি খেলা খেলে, ঢেঁকিতে পা দিয়ে, পুকুরজল নিয়ে, চরকা কেটে, মাছ কুটে, সংসারের ও নিজেদের শরীরের উপকার করত; এছাড়া পাঠশাল পালিয়ে পরের বাগান লুটতে, গাছে চড়া এক রকম ব্যায়রাম ছিল, এ জন্য সে দিন পর্য্যন্ত সহরের চেয়ে পল্লীগ্রামের বালক ও যুবকরা অনেকটা পুরুষত্বলাভ করত, এদের নাম-ও ছিল, অর্জ্জুন, জনার্দ্দন, কৃত্তিবাস, গোবর্দ্ধন, শঙ্কর, আর এখন যামিনী, কামিনী, নলিনীবাবুরা কলেজের হস্টেলে শুয়ে শুয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, আর যাঁ'রা ক্রিকেট, ফুটবল, হকিটকি খেলেন, তাঁ'দের অভিভাবকদের সর্ব্বনাশ হয়, খেলার সরঞ্জাম যোগাতে আর শ্রান্তদেহের পিপাসা মেটাতে গোলাপী

ঘোলের সরবতের জন্য প্রতি গ্লাসে আট আনা দিতে।

কাসুন্দীর হাঁড়ি মাঝে মাঝে রৌদ্রে না দিলে ভেপ্‌সে ওঠে, তাই পুরাতন পঞ্জিকার পাতাগুলি মাঝে মাঝে আধুনিক চিন্তার রৌদ্রে তাতিয়ে নিচ্ছি।

১৫

যে পঞ্জিকা ময়রাদের খুসী কববার জন্য বিবাহের দিন বাড়িয়ে দেয়, আর বাবু হিন্দুদের ঝঞ্ঝাট শীগ্‌গির শীগ্‌গির মিটিয়ে দেবার জন্য দুর্গাপূজার উৎসবের দিন কমিয়ে দেয়, যে পঞ্জিকা ঠাকুরঘরে নারায়ণশিলার পদাসন পরিত্যাগ ক'রে রতিশক্তি বৃদ্ধি ও উপদংশের ঔষধ মাথায় তুলে বাজারে বাজারে বিক্রী ক'রে বেড়ায়, সে পঞ্জিকার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই মনে করেছিলুম, পঞ্জিকা লিখা বন্ধ ক'রে দেব। কিন্তু পণ্ডিতমশাই বল্লেন যে, আপনি ত এখনকার পঞ্জিকা লিখছেন না, পুরাতন পঞ্জিকায় বিজয়া নিয়ে ৫ দিন পর্য্যন্ত দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা পাবেন, আর মলাটের গায়ে একটু হলওয়ের মলম ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞাপনের প্রলেপ ত নেই সুতরাং সে পঞ্জিকার ফল শ্রবণ করানয় আপনার আপত্তি কি? সুতরাং ব্রাহ্মণের কথায় আবার পুরানো পাঁজির পাতা উল্টান আরম্ভ করা গেল।

ইংরাজী ১৮৬০ এর কোটার প্রায় শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় পাঠশাল দেখেছি; এখন কলকাতায় আর বাঙ্গালী গুরুমশায়ের পাঠশাল নেই, হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীদের ২।৪ টা পাঠশাল আছে। ইংরাজী ১৮৮০ কোটার শেষ পর্য্যন্ত শালিখাতে গুটিকয়েক ভাল পাঠশাল দেখেছি, কিন্তু শেষাশেষি তাহাদের চেহারা বদলে যাচ্ছিল; পাঠশালায় পরীক্ষা ঢুকল, পাশ ঢুকল, গুরুমশাই পাশকরা ছেলেদের মাথা পিছু ৩।৪ টাকা ক'রে বৃত্তি পেতে লাগলেন, আর পাঠশালগুলি পাট-সেগুন হয়ে দাঁড়াল; ছেলেরা দাতাকর্ণ ছেড়ে "তরল পাঠে" দেড়পাতায় আলুর চাষ ও সওয়া পাতায় ঝুড়িবোনার উপদেশ লাভ করতে আরম্ভ করলে, আর গণ্ডাকে বুড়কে ছেড়ে অবিমিশ্র গুণন ও মিশ্র ভাগহার কষতে আরম্ভ করলে।

আগে গাড়ী-জুড়ি তাঞ্জাম-পাল্কী জমীদারীওয়ালা বা মুৎসুদ্দীগিরি করা লোক বাবু ছিলেন; এখন যে একটু আধটু ইংরাজী পড়ে, তার-ই নাম হয়

বাবু। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাত ২ প্রস্থ ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত বাবু কলকাতার ও বাঙ্গালার আর-ও কয়েকটি সহরে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় বাঙ্গালীর প্রভূত প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় দিচ্ছিলেন। নতুন ধরণের শিক্ষক প্রস্তুত করবার জন্য গবর্ণমেণ্ট জোড়াসাঁকোয় একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপন করেন এবং ভাবী শিক্ষকদের কসরতের জন্য ওর সঙ্গে একটি পাঠশালা জুড়ে দেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কম্বুলেটোলায় শ্যামবাজারস্থ "বঙ্গবিদ্যালয়" বলে একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। আমাব যদি ভুল হয়ে থাকে, কেউ শুধরে দিবেন ; বোধ হয়, গবর্ণমেণ্টেব ঐ পাঠশালা ছাড়া মাত্র নাগরিকজনের চেষ্টায় ঐটি কলকেতার নতুন ধবণের প্রথম বিদ্যালয়। সেই স্কুলের বয়স এখন ৭০ বৎসব হয়েছে, আর নাম হয়েছে "এঙ্গলো ভার্ণাকুলার স্কুল"। এর অব্যবহিত পরেই অধুনা সোনাগাছী দেওয়ানবাড়ীতে অবস্থিত যদুপণ্ডিতের স্কুল নামে খ্যাত, "আহিবীটোলা বাঙ্গালা বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয় ; বলতে গেলে এই দুটি স্কুলেব জন্ম যেন এক আঁতুড়ে। কম্বুলেটোলার স্কুলটির প্রতিষ্ঠাকল্পে তৎকালীন পল্লীস্থ কৃতবিদ্য অনেকে-ই উদ্যোগী ছিলেন, তার মধ্যে প্রধান হলেন দু'জন। ইদানীং যে রামচন্দ্র মৈত্রেব গলিতে বসুমাতা আমাকে একটু সাময়িক আশ্রয় দিয়াছেন, সেই ধনশালী বামচন্দ্র মৈত্রের পুত্র বিশ্বম্ভর মৈত্র এক জন,আর দ্বিতীয় জনেব নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র বসু ; ইনি তৎকালীন গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল বা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিব হেড মাষ্টার ছিলেন, ইনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দশহরার সন্ধ্যার পবে টাইফয়েড বিকাব রোগে ৩৬।৩৭ বৎসর আন্দাজ বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন ; কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, ঐ ওরিয়েণ্টালে-ই তাঁর শিক্ষালাভ, কাপ্তান ডি, এল, রিচার্ডসন, জেফারিশ ন্যাসু প্রভৃতি তাঁর গুরু ছিলেন, সেক্সপীয়র আবৃত্তি তিনি চমৎকার করতে পারতেন। তাঁর চরিত্র অতি পবিত্র ছিল এবং কোন জন্মান্তরের কর্ম্মফলে স্বল্পস্থায়ী জীবনে একটিমাত্র দুষ্কর্ম্ম করেছিলেন, আমার মতন কণ্টককে পুত্ররূপে এই বঙ্গদেশে স্থাপিত ক'রে যাওয়া। ঠিক যেন :—

বোপিব কণ্টকবৃক্ষ
গৌড়জন যাহে
অঙ্গে অঙ্গে বিদ্ধ হবে নিরবধি।

এখন যেমন অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি অবসরকাল-বিনোদের জন্য রাজনীতি

বা সমাজসংস্কার নিয়ে দেশের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখনকার শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা স্বদেশীয় লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইংরাজী বা বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন এবং ডিবেটিং ক্লাব প্রতিষ্ঠাতে-ই মনোযোগী হতেন। গৌরমোহন আঢ্যের অতি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে-ও একটি বাঙ্গালা-বিভাগ যুক্ত ছিল। তবে বড়গাছের আওতায় প'ড়ে সেটি বেশী বাড়তে পারে নি।

১৬

নতুন ধরণের বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের সঙ্গে নতুন ধরণের বই প্রস্তুতের-ও প্রয়োজন হ'ল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক লিখতে আরম্ভ করলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুর বই-ই টেক্সট বুক হিসাবে বেশী চলতি হ'ল। এঁদের পুস্তক বাঙ্গালায় লিখিত হ'ল বটে, সংস্কৃতের স্তন্যে পোষিত নূতন বাঙ্গালা গদ্য সাদরে সর্ব্বসমাজে গৃহীত-ও হ'ল কিন্তু এ দেশীয় ভাব, এ দেশীয়ের কথা শিক্ষাপুস্তকের পৃষ্ঠা হ'তে অন্তর্হিত হ'ল। বাঙ্গালীর ছেলে ইংরাজীতে পড়ে 'ইসপ্স্ ফেব্‌ল', আবার বাঙ্গালায় পড়ে 'কথামালা', ইংরাজীতে পড়ে 'রুডিমেণ্টস্ অফ নলেজ', বাঙ্গালায় পড়ে 'বোধোদয়', ইংরাজীতে পড়ে 'মরাল ক্লাস বুক', বাঙ্গালায় পড়ে 'নীতিবোধ', ইংরাজীতে পড়ে 'চেম্বারর্স বায়োগ্রাফি', বাঙ্গালায় পড়ে 'চরিতাবলী', ইংরাজীতে পড়ে 'বপুনস্ নেচারল হিস্ট্রী', বাঙ্গালায় পড়ে 'চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ'; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করলে-ও নতুন বাঙ্গালীবংশের প্রাণ থেকে দেশের ভাব-ভক্তি শক্তিসামর্থ্য ধর্ম্মকর্ম্মাদির কথা ক্রমে লোপ পেতে লাগল। এর উপর আবার খৃষ্টান মিশনারীরা অজ্ঞতা, অন্ধতা বা বিদ্বেষ বুদ্ধির বশীভূত হয়ে মোড়ে মোড়ে হিন্দুপুরাণোক্ত দেবদেবীর চরিত্র যে কদর্য্য তুলিকায় চিত্রিত করতে আরম্ভ করলেন, তাতে অতি সেকেলে হিন্দুভাবে গঠিত সংসারে প্রতিপালিত হয়ে-ও আমাদের মনে-ও পৈতৃক ধর্ম্মসংস্কারের উপর বিদ্বেষ জন্মে যেতে লাগল। এই সকল মিশনারীদের মধ্যে অনেকের-ই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল, "To hate others and love none," ঈশ্বরাবতার যীশুখৃষ্টের সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেমবিস্তারের শিক্ষার বিনিময়ে

তাঁরা হিন্দুর দেবদেবীকে লম্পট ও মাতাল কহাটা-ই আপনাদের ধর্ম্মকর্ম্মের সারভূত ব'লে মনে করতেন। সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ না থাকলে বোধ হয়, গরু, মুরগী খাবার আর মেম বে' করতে পাবার লোভে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী-ই খৃষ্টান হয়ে যেতেন।

ঐ সময়ে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী অনেকগুলি বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থ প্রচার করেন; সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা 'রবিনসন ক্রুশো', 'অহল্যা হুন্ডিকার জীবন-বৃত্তান্ত', 'সুশীলার উপাখ্যান' প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক এক সময় আমি পড়েছিলাম। 'সুশীলার উপাখ্যান' বালিকাশিক্ষার একখানি চমৎকার বই; স্ত্রীশিক্ষার অমন চমৎকার বই আজ-ও আর একখানি প্রণীত হয়েছে কি না সন্দেহ, একটু ভাব, ভাষা বদলে সেখানির পুনঃ সংস্করণ করলে মন্দ হয় না। আমি স্কুল বুক সোসাইটীতে খবর নিয়েছি, সে সব বই আর একখানি-ও পাওয়া যায় না; পুরাতন কাগজ-ওয়ালাদের সেগুলি ধ'রে না দিয়ে যদি সাহিত্য-পরিষৎ বা অন্য কোন লাইব্রেরীকে ম্যাকমিলান কোম্পানী সে বইগুলি দিতেন ত মানুষের মতন কায করতেন।

১৭

একটু আগে বলেছি, বাবা খুব ভাল সেক্সপীয়র পড়তে পারতেন; তিনি যখন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সামনে সেক্সপীয়রের দৃশ্যবিশেষ আবৃত্তি কত্তেন, তখন আমি হাঁ ক'রে অবাক্ হয়ে শুনতুম এবং বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলে-ও এত ভাল লাগত যে, মনে মনে ভাবতেম যে, কবে আমি বাবার মতন সেক্সপীয়র পড়তে পারব। আমি যে ভবিষ্যতে থিয়েটারওয়ালা হব, তার বীজ কি তিনি অজ্ঞাতে আমার বুদ্ধির ভিতর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন? সম্ভব, কেন না, ওরিয়েণ্টালে যে সেক্সপীয়র অভিনয় হ'ত, তার গল্প-ও বাবা যখন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে করতেন, আমার কানের ভিতর দিয়া তা-ও মরমে পশিত।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৬০ কোটার মাঝামাঝি সময়টার, তখন এখনকার হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সিনেট হাউস প্রভৃতির বাড়ী প্রস্তুত হয়নি। সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বদিকে ছিল হিন্দু-স্কুল আর পশ্চিমদিকে ছিল আধখানা প্রেসিডেন্সী কলেজ, আর আধখানা

প্রেসিডেন্সী কলেজ ছিল সামনে আলবার্ট হলের পুরানো বাড়ীতে, দরজায় ঢুকে ডান হাতে একটি ছোট কুঠারিতে ছিল কেমিষ্ট্রীর ল্যাবরেটরী, ব্লাঙ্কফোর্ড সাহেব ছিলেন কেমিষ্ট্রীর প্রফেসার। প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্যালারীতেই সকালে ল'ক্লাস হ'ত। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল তখন ছিলেন সাটক্লিফ সাহেব। অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন রিজ্ ব'লে এক জন ফিরিঙ্গী, ইনি অঙ্ক-বিদ্যায় ছিলেন শুভঙ্কর এবং মাতাল ছিলেন ভয়ঙ্কর, সাটক্লিফ সাহেব অনেক চেষ্টা ক'রেও একে শোধরাতে পারেন নি, শেষ বয়সটা এব বড়-ই কষ্ট গিয়েছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাবু প্যারীচরণ সরকাব প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রথম ইংরাজী অধ্যাপক ছিলেন, আর এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক ছিলেন, মণিলাল সান্ন্যাল (এম, এল, স্যাণ্ডেল), ইনি খৃষ্টানপুত্র এবং সাহেবী পোষাক পরতেন, আর সংস্কৃতেব অধ্যাপক ছিলেন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। লাইব্রেরীয়ান ছিলেন, হরমোহন চট্টোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি পুত্র ছিলেন পূর্ণবাবু, তিনি হিন্দু-স্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন। হিন্দু-স্কুল ও সংস্কৃত কলেজের মধ্যে একটা ফালি জমী ছিল, তাব উপর গোটা ২।৩ নতুন ঘর তৈরী ক'রে ঐ সময় তথায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এর আগে লালদীঘির ধারে রাইটার্স-বিল্ডিঙে সারভেয়িং টারভেয়িং এই রকম কি একটা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ঐ সময় হিন্দু-স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন মহেশ বাঁড়ুয্যে মহাশয়, তিনি-ই হিন্দু স্কুলের প্রথম বাঙ্গালী হেড মাষ্টার। এর পূর্ব্বে গুড্, আইফ প্রভৃতি সাহেবেরা-ই হেড মাষ্টারী করতেন; ভোলানাথ পাল মহাশয় ছিলেন অঙ্ক শিখাবার এসিষ্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার, দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, খুব সেকেলে ঈশ্বরচন্দ্র সা মহাশয়, হরলাল রায় মহাশয় ছিলেন অঙ্ক শিক্ষক, তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন গোপীনাথ মিত্র মহাশয়, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুরের কাকা; এঁদের নামেই ছড়া ছিল,—

"গুড্ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং,
তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং, (বেঁটে)
তার নীচে গুপে কাণা (চশমা পরতেন)
গুপে কাণা বড় দানা,"
তার পরে আমার নাইক জানা।

আমাদের পড়াতনে বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ইনি পরে আলিপুরের উকীল ও "সহচর" নামক বাংগালা সংবাদ-পত্রের সম্পাদক হন। হিন্দু-স্কুলের তখন হেড পণ্ডিত ছিলেন শ্যামাচরণ বাবু ব'লে এক জন ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ছিলেন গৌরীশঙ্কর পণ্ডিত, ইনি সেকেলে পণ্ডিত, কিন্তু ইংরাজী বলতে শিখেছিলেন, আর একজন পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম ভুলে গেছি, তাঁকে সবাই ঢাকাই পণ্ডিত বলত। মহেশ বাবুর বাড়ী আমাদের পাড়ায় বাগ্-বাজারে-ই ছিল, এঁর বড় ভাই হুগলী কলেজের প্রফেসার ছিলেন, মহেশ বাবু-ও বছর খানেক পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রোফেসার হন, এঁরা দুই ভাই-ই খুব পাকা ইংরাজী-নবীশ ছিলেন। মহেশ বাবুর মত জাঁদরেল হেড মাষ্টার আজ পর্য্যন্ত আমি কোথা-ও দেখি নি, তখন হিন্দু-স্কুলে যত বড় মানুষের ছেলে পড়ত, তার উপর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধীনস্থ ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটে বাংগালার রাজা-রাজড়াদের যে সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবরাজরা থাকতেন, তাঁরা-ও হিন্দু-স্কুলে পড়তেন। কিন্তু মহেশ বাবুর দবদবায় অত বড় স্কুলটার মধ্যে একটু টুঁ শব্দ থাকত না! তাঁর কণ্ঠস্বরে কম্পিত হয়ে না উঠত, এমন শীল মল্লিক ঠাকুর সিংহ হিন্দু-স্কুলেই ছিল না, কিন্তু মহেশ বাবু যেমন শাসন করতে জানতেন, আদর করতে-ও তেমনই জানতেন, আমরা সকলে তাঁকে ভয়-ও করতেম, ভাল-ও বাসতেম।

কথায় কথায় গৌরমোহন আঢ্যির স্কুল সম্বন্ধে-ও কিছু ব'লে যাই। তখনকার হিন্দু কলেজের শিক্ষাদানপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট হলে-ও, ভাল ভাল ইংরাজ অধ্যাপক দ্বারা সেখানকার কায পরিচালিত হলে-ও সেকালের হিন্দুদের চক্ষুতে ছাত্রদের মধ্যে অনেকে-ই ভ্রষ্টাচার হয়ে যাচ্ছিলেন; এক দিকে হিন্দু কলেজের এই অবস্থা, অপর দিকে মিশনারীদের কালেজ স্কুল অথচ পুত্রদের ইংরাজী বিদ্যায় কৃতবিদ্য করতে-ই হবে, সুতরাং চিন্তায় ও শঙ্কায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা সে সময় একটু বিচলিত হয়েছিলেন। গৌরমোহন আঢ্য জাতিতে সুবর্ণবণিক, বাড়ী ছিল তাঁর সিমুলিয়া-কাঁসারীপাড়া, তিনি হিন্দু আচার-ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে বটতলায় বাড়ী ভাড়া ক'রে ঐ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্থাপন করেন; সাধারণ লোক বরাবর-ই গৌরমোহন আঢ্যির স্কুল-ই বলত, কিছু দিন পরে বর্ত্তমানে যে বাটীতে স্কুল আছে, সেইখানে স্থানান্তরিত হয়। নামে স্কুল হলে-ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে উহা ঠিক কলেজ-ই

ছিল। এক দিকে অহিন্দু আচারে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় না, অপর দিকে হিন্দু কলেজের চেয়ে বেতন কম, সুতরাং কলিকাতার নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক ধনবান্ ও গৃহস্থ তাঁহাদিগের পুত্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিতে লাগলেন। সেকালের ধনীপ্রধান ঠাকুরবংশের, মল্লিকবংশের, শোভাবাজার রাজবাটীর এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বংশের বড়লোকরা গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন। আঢ্য মহাশয়ের সস্তায় ভাল শিক্ষক খুঁজে বার করার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তখনকার অনেক ভাল লিখাপড়া জানা ইংরাজ স্বদেশে হতাশ হয়ে নিজেদের ভাগ্যপরীক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসতেন এবং মিশনারী-ভবনে সস্তার হোটেলে বা সেলার হোমে-ও আশ্রয় নিতেন; সেই সব যায়গা খুঁজে খুঁজে গৌরমোহনবাবু শিক্ষক বাহির করতেন; এইরূপ এক শিক্ষকের সন্ধানে শ্রীরামপুর গিয়ে ফেরবার সময় হঠাৎ নৌকাডুবি হয়ে তিনি গঙ্গাগর্ভে দেহ রক্ষা করেন। তাঁর অবর্ত্তমানে তদীয় অনুজ হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। আমাদের সময় পর্য্যন্ত হরেকৃষ্ণবাবুর কর্ত্তৃত্ব ছিল। হরেকৃষ্ণ বাবু-ও জ্যেষ্ঠের ন্যায় ভাল ভাল ইংরাজ শিক্ষক অপেক্ষাকৃত স্বল্প বেতনে ঐ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করেছিলেন। কতকগুলি নাম মনে আছে, ব'লে যাই,—জেফারিস্, পামার, ন্যাস্, ভুঁদো মেকেঞ্জি, দেড়ে মেকেঞ্জি, হউইং, (ইনি স্কুলে-ই থাক্তেন, এক দিন অপরাহ্নে ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে চিল উড়িতে দেখিয়া বলেন যে, চিল উড়তে পারে, আর আমি উড়তে পারি না? যেই বলা, আর উড়তে যাওয়া, আর একেবারে নীচের উঠানে প'ড়ে—Heaven take my soul and Calcutta keep my bones) থারলো, পেনী, ভ্যালিস, স্মিথ; শেষোক্ত ৩ জন ফিরিঙ্গী, তার মধ্যে স্মিথ আর ভ্যালিস্ নীচের ক্লাশে পড়াতেন। তখনকার ওরিয়েণ্টালে বন্দোবস্ত ছিল,—সব নীচে ক্লাশে ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালী শিক্ষক, মাঝের সব ক্লাশে ভাল ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক, আর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী সকলে বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী শিক্ষক। আমার পিতা ঐ স্কুলে-ই পড়েছিলেন এবং ছোট মাষ্টার থেকে ক্রমে হেড মাষ্টার হন। কৃষ্ণদাস পাল, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অনেকেই বাবার ছাত্র, বাবার মৃত্যুর পর বড় হয়ে আমি এ কথা তাঁদের-ই মুখে শুনেছি। আমি শৈশবে দিন কতক ওরিয়েণ্টালে গিয়েছিলুম, তার পর পিতৃহীন হয়ে ১৮৬৬ থেকে

৬৮ পর্য্যন্ত ঐখানে পড়ি এবং শেষ সনে ঐখান থেকে-ই এনট্রান্স দেই। আমাদের একটা স্কুল-বয় দুষ্টুমীর কথা ব'লে যাই। ওরিয়েণ্টাল তখন প'ড়ে আসছিল, হরেকৃষ্ণ বাবু আর তখন খরচ চালাতে পারেন না। তিনি স্কুলে আসা প্রায় বন্ধ করলেন। গৌরমোহন বাবুর পুত্র ভৈরব বাবু সুশিক্ষিত ছিলেন, তিনি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। ভাল রকম ইতিহাস পড়ানটা ঐ আঢ্যকুলের একটা বিশেষত্ব ছিল। দেখা গেল, ভৈরব বাবু-ও আর ৩।৪ দিন স্কুলে আসেন না, শিবু শীল নামে একটি বৃদ্ধ লোক চাপকান প'রে মাথায় পাগড়ী বেঁধে এ ক্লাশ ও ক্লাশ ঘোরেন আর মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসেন। অনুসন্ধানে জানলেম, আঢ্য মহাশয়েরা স্কুলটি বিক্রী করেছেন ঐ শিবু শীলকে। রাগে ক্ষোভে, অভিমানে আমরা যেন জ্বলে গেলুম। আমার-ই সহপাঠী এক জন একটা বারান্দায় শিবু শীলের সামনে দিয়ে শীস দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, শিবু বাবু তাকে ইংরাজীতে ধমকালেন, তারপর আমাদের ক্লাশে ঢুকে বললেন, "Do you think I am a cooly coming here?" "আমরাও উত্তর দিলেম—"Worse than that, clear out!" বেগতিক দেখে শিবু বাবু স'রে পড়লেন, আমাদের থার্ড ক্লাশটা ছিল বৃন্দাবন বসাকের গলির ধারে উপরের ঘরে, ঝড়াঝড় চাদর দিয়ে সব বেঞ্চি টেবল বেঁধে গলির রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া গেল, ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস ক্রমে আমাদের সংগে যোগ দিলে, খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল; আমাদের মাষ্টার পেনী সাহেব আর অক্ষয় বসু বি, এ, এসে আমাদের থামাতে চেষ্টা করলেন। আমরা বললাম, স্কুল আমরা কখন-ই বেচতে দেব না, বাড়ীতে কাঁদা-কাটা ক'রে ডবল মাইনে দেব, তবু স্কুল বেচতে দেব না। শিবু বাবু স'রে পড়লেন, সে দিন পড়াশুনা বড় হ'ল না, আমরা ছেলেরা সব কমিটী করতে ব'সে গেলুম, তার পরদিন সকালে স্কুলে গিয়ে ক্লাশে বসেছি, এমন সময় ভৈরব বাবু এসে ক্লাশে ঢুকলেন, আমরা কাঁদ কাঁদ মুখে মুখ হেঁট করলুম, ভৈরব বাবুর-ও মুখ যেন একটু ছল ছল করছে; তিনি আমাদের উপর রাগ করেননি, খুব স্নেহের স্বরে বললেন, "তোমাদের-ই কথা রাখব, স্কুল বেচব না, এস, ভাল ক'রে পড়াই।" আমাদের সকল ছাত্রের চোখ যেন একটা দৃষ্টিতে ২ হাজার আহ্লাদের কথা কয়ে ফেল্লে। আবার বেশী ভাল ভাল মাষ্টার এল, ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয় হলেন হেড মাষ্টার, ইতিপূর্ব্বে স'বাজার নন্দরাম সেনের গলিতে মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থাপিত একটি ইংরাজী স্কুল ছিল, ইনি সেখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ফ্রেডারিক পেনী রইলেন এসিস্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টার, ইনি বাঙ্গালা-ও ভাল জানতেন, সংস্কৃত-ও কিছু কিছু পড়েছিলেন, নভেলের মতন ইনি গ্রামার পড়তে ভালবাসতেন, এঁর ডেস্কের ভিতর ইংরাজী গ্রামার, ল্যাটীন গ্রামার, গ্রীক গ্রামার, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ, কেবল গ্রামার—গ্রামার—গ্রামার! ইনি অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন, আমার বাবার সময়ের লোক; দু বৎসরের মধ্যে এঁর এক দিন লেট বা কামাই দেখিনি, ইংরাজী ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি এক দিন পেনী সাহেব স্কুলে এলেন না, জিজ্ঞাসা ক'রে কোন খবর-ই পাই না, ৪ দিনের দিন দেখি স্কুলের উঠানে একটা পাল্কী নামল আর ফার্ষ্ট ক্লাসের মটুক মিত্তির হাত ধ'রে সাহেবকে পাল্কীর ভিতর থেকে নামালেন, পরে হাত ধরে-ই তাঁকে লাইব্রেরীর দিকে নিয়ে গেলেন, তিনি যেন চলতে পারছেন না,—আমরা প্রথম মনে করলুম পক্ষাঘাত, পরে বুঝলুম বোতল। কিছুক্ষণ পরে ঐ পাল্কীতে-ই সাহেব চ'লে গেলেন, বোধ হয়, টাকা নিতে এসেছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে পেনী সাহেব মদ খান, একথা আমরা কখন-ও শুনিনি। ৩ দিন পরে ঈশ্বর বাবু ক্লাসে এসে বললেন, "তোমরা শুনে দুঃখিত হবে, তোমাদের প্রিয়তম শিক্ষক পেনী সাহেব দেহত্যাগ করেছেন।" সকল ছেলের-ই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল; এ সংসারে পেনী সাহেব একাকী-ই ছিলেন, কেউ কোথা-ও ছিল না বলে-ই জানতুম, কেন যে তিনি অনবরত সুরাপানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন, এ কথা প্রকাশ পায়নি। সেই বৎসর বাবু চন্দ্রনাথ বসু ও বাবু বেণীমাধব দে এম, এ, পাশ করেন (তখনকার এম, এ, বি, এ, পাশ যা তা নয়) এঁরাও সংসারে প্রবেশ করলেন, ওরিয়েণ্টালে আমাদের শিক্ষক হয়ে। স্কুল বেশ চলতে লাগল, ১৮৬৮ সালে আমরাও স্কুলের বিদ্যা শেষ ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। ঐ সময়ে-ই গরাণহাটা পাড়াটা আর-ও গুলজার হয়ে উঠল,—নতুন বিডন ষ্ট্রীট ও বিডন বাগান হয়ে; আমাদের দুষ্টুমীর কথা বলেছি, ওর চেয়ে দুষ্টুমী করা গেছে, এক এক দিন লুকিয়ে হুঁকাতে-ও টান দেওয়া গেছে, কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর বয়সে পাঠ্যাবস্থায় ভদ্রলোকের ছেলে যে নিষিদ্ধ স্থানে যেতে পারে, এ কথা তখন আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। ঐ ওরিয়েণ্টালের আশে পাশে, যাবার আসবার পথে গণিকালয় সব ছিল, তারা দরজায় বারান্দায় দাঁড়াত, আমাদের মধ্যে অনেককে সোনাগাছির মধ্য দিয়ে-ও যাতায়াত করতে হ'ত, কিন্তু

এখনকার মত তখনকার অভিভাবক বা বিদ্যালয় পরিচালক কারুর মাথায় এ কথা ঢোকেনি যে, ছেলেদের চোখে কাপড় বেঁধে রাস্তায় না চলালে কিংবা •সমগ্র সহরের স্বৈরিণীদের ধাপায় না পাঠালে ছেলেরা উচ্ছন্ন যাবে, অথচ আমাদের সময়ের ছাত্রদেব মধ্যে অনেকেই ভবিষ্যজ্জীবনে সংসারে, সমাজে ও কার্য্যক্ষেত্রে চরিত্রবান্ ব'লে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে গেছে। তখনকাব ছাত্রদের আদর্শ দেবতা ছিলেন, কেশবচন্দ্র সেন।

সেকালেব কলকাতায় আর একটি বড় ইংরাজী স্কুল ছিল কুইন্‌স্' কলেজ, ডফ সাহেব ছিলেন সে স্কুলের কর্ত্তা। স্কটলণ্ডের গির্জ্জাসম্বন্ধীয় কোন মতবিরোধেব জন্য ডফ সাহেব কুইন্স কলেজ ত্যাগ ক'বে নিমতলা ষ্ট্রীটে ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন নাম দিয়ে এক নতুন বড় স্কুল খুলেন, আর কুইন্স কলেজের নাম হয়, জেনাবেল এসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউশন। জেনারেল এসেমব্লীর কর্ত্তাদের মধ্যে অগিলভী সাহেবের নাম খুব জনপ্রিয় ছিল। কয়েক বৎসর হ'ল বিলিতী গির্জ্জাব বিবাদ নিস্পত্তি হওয়ায় ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন বা ডফ সাহেবের স্কুল আবাব জেনারেল এসেমব্লীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নাম হয়েছে স্কটিস্ কলেজ। নিমতলায় যে ডফ সাহেবের স্কুলবাটীতে এক কালে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরেব পর বৎসব খৃষ্ট ধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হয়েছে, পবিত্র-চরিত্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকগণ দ্বারা ছাত্রগণকে ঈশ্বরের পথ—স্বর্গের পথ প্রদর্শিত হয়েছে, অধুনা সেই বাটীতে আমাদের কৃশ্চান গবর্ণমেণ্ট ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনেব পর দিন হাতকড়ি-পরিহিত অভাগাদিগকে জেলের পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতেছেন,—হা ডফ্ সাহেবেব স্কুল! **From what height to what pit thou hast fallen.**

প্রাচীনরা এবং মেয়েরা পাছে ছেলেদের 'ধ'রে ধ'রে কৃশ্চান ক'রে ফেলে ব'লে ডফ সাহেবকে একটু ভয় করুতেন বটে, কিন্তু ডফ সাহেবের চরিত্রের ভিতর কত বড় মহত্ত্ব ও মধুরত্ব ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, অমন জাত-মারা সাহেবকে-ও দেশের লোক অত্যন্ত সম্মান করত ও ভালবাসত। তিনি ছেলেদের ভাল ক'রে লিখাপড়া শিখিয়ে কৃশ্চান করুতে পারুলে বেশী খুশী হতেন বটে, কিন্তু কৃশ্চান না হয়ে-ও বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েরা ভাল ক'রে লিখাপড়া যাতে শিখে, তার জন্য তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করুতেন, যেথায় সেথায় যেতেন, এমনকি, বাবার ঐ সব বিষয়ে অনুরাগ ছিল ব'লে আমাদের সামান্য বাড়ীতে-ও তিনি

এসেছেন। আমার বোধ হয়, ইংরাজীতে ভাল রকম লেকচার দেওয়া কাকে বলে, সেটা শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রথমে ডফ সাহেবের লেকচার শ্‌নে-ই ব্‌ঝতে পারে। বাগ্মী ব'লে প্রথম বাঙ্গালীর নাম বেরোয় রামগোপাল ঘোষের। বাল্যকালে আমাদের যেথায় সেথায় লেকচার শ্‌নতে যাওয়ার হ্‌ক্‌ম ছিল না, তাই আমি তাঁর লেকচার শ্‌নিনি, তবে দ্‌'জনের-ই লেকচার আমি পড়েছি।

ক্রশ্চান বাঙ্গালীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় নাম ছিল ক্‌ষ্ণ বন্দ্যোর। ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এঁকে দেখেছে, এমন কতকগ্‌লি লোক আজ-ও জীবিত আছেন ও হেদোর মোড়ের গির্জ্জাকে লোক সেকালে ক্‌ষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা বলত। ক্‌ষ্ণ বন্দ্যো ক্‌শ্চান হয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে খ্‌ব মিশতেন, তখন যে সব বিষয় দেশের কায ব'লে গণ্য হ'ত সে সব কাযে তিনি খ্‌ব যোগ দিতেন; বাঙ্গালার ন্‌তন গদ্যের স্‌ষ্টিকর্ত্তাদের মধ্যে রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম অত্যন্ত সম্মান ও ক্‌তজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য। আর এক বড় বাঙ্গালী ক্‌শ্চান ছিলেন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। রেভারেণ্ড লালবিহারী বাঙ্গালা কিছ্‌ লিখেননি, তবে বাঙ্গালীর র্‌পকথা, বাঙ্গালীর গ্‌হস্থালীর কথা ইংরেজীতে লিখে রেখে গেছেন।

কলিকাতার সেনেট হাউস ইউনিভারসিটি বিল্ডিং ইষ্টক-দেহে দেখা দিবার প্‌র্বে-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্‌ষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তখন ঐ বিশ্ব পদার্থটি দ্‌শ্য হতেন মাত্র তাঁর স্‌ষ্ট পরীক্ষা ও ডিগ্রীতে, বস্ত্‌ হিসাবে উটি নিরাকার ছিল। বড়লাট হতেন চ্যানসেলার, হাইকোর্টের এক জন জজ সাহেব হতেন ভাইস্‌ চ্যানসেলার, পালপাব্বর্ণে এঁরা প্‌জা নিতে আস্‌তেন, সাট্‌ক্লিফ্‌ সাহেব প্রথমে রেজিস্ট্রার ছিলেন, পরে টনি সাহেব-ও বোধ হয় ঐ পদে নিয্‌ক্ত হন, ১৮৬৫-তে টনি প্রফেসার হয়ে প্রেসিডেন্সিতে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতি বৎসর-ই বড় একটা ঝঞ্ঝাটে পড়তেন। স্প্রীমকোর্ট হাইকোর্ট নাম পরিগ্রহ ক'রে টাউনহল জ্‌ড়ে বসলেন, এখন ছেলেদের কোথায় বসিয়ে খাদ কষে· নম্‌না বাছাই ক'রে পাশ করা হয়? জোয়ারের জঞ্জাল যেমন এ-ঘাট ও-ঘাট ক'রে বেড়ায়, পরীক্ষার্থী ছাত্রদের অবস্থাও ঠিক তেমন-ই দাঁড়িয়েছিল। এখন যেখানে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্ক্‌ল হাসপাতাল হয়েছে, কোনিং মার্কেট নাম দিয়ে ঐখানে একটা সরকারী বাজার বসাবার জন্য একটা লম্বা চক তৈরী হয়; ১৮৬৪ খ্‌ষ্টাব্দে ঐ গর্ভস্রাব বাজার-ই পরীক্ষা-স্থল হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাক্‌র-ই

প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান; কিন্তু তিনি দেশী হয়েও বোম্বাই দাঁড়ালেন। বাঙ্গালার প্রথম বাঙ্গালী সিভিলিয়ান সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে, বেহারী গুপ্ত আর রমেশ দত্ত মহাশয়ত্রয় এই ত্রিমূর্ত্তি-ই এনট্রান্স পাশ করেন বাজারে ব'সে, বোধ হয়, এই জন্য-ই এঁদের নাম বাজারে আজ পর্য্যন্ত বেশী চলতি।

১৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের সে এক দিন গেছে; পাশকরা ছেলে তখন বাঙ্গালা দেশে নূতন চীজ, বি, এ, এম, এর, ত কথাই নেই; স্কুলের ছেলেদের চোখে বি, এ, এম, এ, ডিগ্রীধারী যেন কোন দেবলোক হ'তে আগত পুরুষ, পুরনারীর চোখে প্রথম ষষ্ঠীবাটায় সমাগত নূতন জামায়ের চেয়ে তার মুখ প্রলোভনীয় দৃশ্য, বঙ্গের সমস্ত শাশুড়ীর সুখের স্বপ্নের সোনার মূর্ত্তি বি, এ, এম, এ-র! হায়, আজ কি দশা! আজ তুমি একটা ৩০ টাকার চাকরীর জন্য লালায়িত, তাই বলি, আজ তোমার কি দশা! কৈ, আগেও দেখেছি. এখন-ও দেখি, কত ন্যায়রত্ন, বিদ্যাবাগীশ, তর্কনিধি, বেদান্তরত্ন সব অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার অথচ পল্লী-কুটীরে বাস, নগ্নপদ, আজানুলম্বিত বস্ত্রপরিধৃতে, উত্তরীয়ের মধ্যে একখানি গামছা বা আড়াই হস্ত পরিমাণ নামাবলী, একটা দু'আনি কেহ হাতে দিলে আজকের দিন বেশ চ'লে যাবে ব'লে আহ্লাদে গদগদ, কোন ধনীকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে টাকার থাক মাত্র দেখিয়াছেন, নিজের হাতে একসঙ্গে ২০টি টাকা বোধ হয় জীবনে-ও কখন-ও গণনা করেন নি, তাঁদের দেখে ত কেউ কখন-ও বলে নি যে, পণ্ডিত, তোমার আজ কি দশা! টোলের পণ্ডিত বাল্যে ব্যাকরণ পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে-ই সংযম শিক্ষা অভ্যাস করিতে শিখিত, অর্থো-পার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় প্রভুত্ব ও বিলাসের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি কখন-ও পাঠ্যাভ্যাস করেননি, জ্ঞানলাভ ও সভায় বিচারে দিগ্বিজয়ী হওয়া-ই তাঁহার একমাত্র উচ্চ আশা, তাই নগ্নপদ তাঁহার মনকে লোকসমাজে অপদস্থ করে না; আর পাশ-স্বর্গে সামীপ্য, সালোক্য, সাযুজ্য (ডেপুটী, গবর্ণমেণ্ট উকীল, হাইকোর্টের জজ) লাভপ্রয়াসী পুত্রের পিতা পুত্রকে পাঠশালায় পাঠান—শান্তি-পুরে ধুতির উপর নীনুর পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, জুতা মাথা দুই-ই চকচকে বুরুষ করা, ধারাপাত বই বয়ে নেবার জন্য সঙ্গে এক জন ঝি। স্কুলে গিয়ে

পড়েন,—"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই," স্কলারশিপ তার প্রথম মাসমাইনা বা পরীক্ষা পাশরূপ অন্যায় কর্ম্ম করার লোভ বৃদ্ধির জন্য ঘুস। তাহার পর যত উপর ক্লাশে উঠছে, একটার পর একটা পাশ করছে, তত-ই দামী চকচকে বইয়েব সংগে দামী চকচকে পোষাকের আয়োজন ; চার বছর বয়স হ'তে আরম্ভ ক'রে ২৪।২৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত তার কানে মনে কেবল টাকা—টাকা—টাকার কাঁড়ি, কাষেই এই ১০ টাকা মন চাল, টাকায় ২৷৷ সের দুধের বাজারে মাসে ৩০ টাকার-ও সুবিধা নেই দেখে তার মন জগতের বিচারেব উপর বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে না কেন ?

১৯

তখন কেবল এণ্ট্রান্সে ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ড ডিভিসন ছিল। যে ছেলে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে ১৬।১৪ কি নিদেন ১০ টাকাও 'জলপানি' পেত, তার নাম হ'ত 'হীরের টুকরো' ; সেকেণ্ড ডিভিসনে-ও পাশ হ'লে সে 'সোনার টুকরো'। কলকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেদের-ও তখন বিবাহটা হয়ে যেত সাধারণতঃ ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সের ভেতর। এই অন্যায় অপ্রেমিক কাযটা হয়ে যাবার কারণ, তখন ছেলে বিয়ে করত না, বাবা বিয়ে দিতেন, বাবা নিজের মেয়েটিকে পরের ঘরে দিয়ে অপরের একটি মেয়েকে বউ ব'লে নিজের সংসারের ভিতর এনে গ'ড়ে তোলবার জন্য ঘরে নিতেন, প্রেমিক পুত্র প্রেয়সী ঘরে আনতেন না। বাল্যবিবাহ ভাল কি যৌবনবিবাহ ভাল, এ প্রবলেমের একমাত্র মীমাংসা যে, যদি প্রজাবৃদ্ধি, সংসারের সুখ ও সমাজের মংগলের জন্য মাতৃভাবে পরিপূর্ণহৃদয় নারীপ্রস্তুত বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে বালিকা বধূ ঘরে এনে তাকে সংশিক্ষ, সহবং (লিখাপড়া শিক্ষা শুদ্ধ) দেওয়া ভাল, আর যৌবনের চোখের নেশা যাকে 'লভ' বা প্রণয় বলে, তার পরিতৃপ্তি যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে যৌবনপ্রবেশোন্মুখী কিশোরীকে 'পাকা দেখে' নেকলেশ পরিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবেন।

পাশপ্রবেশের সংগে সংগে-ই এক প্রকার 'ঘট্‌কী'র সৃষ্টি, কুলাচার্য্যদের অনেকে-ই ছেলেদের পাশের পড়া পড়তে দিয়েছেন, নিষ্কর্ম্মা বামুনরা কতকটা ঘটকালী ধরেছিল, কিন্তু আধপাকা চুলে টকটকে সিঁদুর প'রে দু'হাতে সোনার

খাড়ু নাড়া দিয়ে 'শিবি ঘটকী'র দল যখন একেবারে অন্দরমহলরূপ ফোর্ট উইলিয়মে ঢুকে মেয়ের মা পিসি ঠাকুমার সামনে 'এনট্রেন্স' পাশ করা ছেলের খবর পৌঁছে দিতে আরম্ভ করলে, তখন পুরুষজাতীয় ঘটকরা আস্তে আস্তে সটকে পড়লেন।

ঘটকী। ওগো, বাছা, তোমাদের একটি বছর নয়েকের মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে না ?

গিন্নী। হ্যাঁ, আছে, কেন ?

ঘটকী। একটি ভাল পাত্র আছে, দেবে ? মেয়ে কেমন ?

গিন্নী। মেয়ে আমার দেখতে হবে না। কোথাকার পাত্র শুনি ?

ঘটকী। পাত্র খুব ভাল, কুলীনের ঘর।

গিন্নী। (অগ্রাহ্যভাবে) আপত্তি নেই।

ঘটকী। কলকাতায় বাড়ীঘর আছে।

গিন্নী। (অগ্রাহ্যভাবে) তা মন্দ কি ?

ঘটকী। ছেলের বাপ-মা বেঁচে।

গিন্নী। (অগ্রাহ্যভাবে) তা থাক্ গে।

ঘটকী। বাপ বেশ মোটা মাইনের চাকরী করে।

গিন্নী। (অগ্রাহ্যভাবে) কে—রাণী !

ঘটকী। ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ।

গিন্নী। (অগ্রাহ্যভাবে) তা ভাল।

ঘটকী। বয়েস সবে এই পনেরো পেরিয়েছে।

গিন্নী। হুঁ।

ঘটকী। এক বছর ডাঁড়িয়ে এগজামিন দেছল।

গিন্নী। (একটু মনোযোগের সহিত) ঐ একজামা কি বল্লে—দেছল ?

ঘটকী। হ্যাঁ গো, ছেলের বাপের অফিসের বড় সাহেবের সংগে কালেজের সাহেবের ভাব আছে কি না, তাই ষোল বছর লিখে নেছে।

গিন্নী। (সাগ্রহে) তারপর তারপর ?

ঘটকী। পাশ করেছে—একেবারে এনট্রেন পাশ।

গিন্নী। বল কি ঘটক ঠাকরুণ—সত্যি বলছ, বাছা ?

ঘটকী। (সোল্লাসে) পাশ ব'লে পাশ বাছা, একেবারে দশ দশ টাকা

জলপানি।

গিন্নী। (সোল্লাসে অগ্রসর হইয়া দুই হস্তে ঘটকীর হস্তধারণ করত) অ বাছা, ঐ বরটি—ঐ বরটি ! উমো আমার বড় আদরের মেয়ে। ঐ বরটি তুমি আমার উমোর জন্যে ক'রে দাও, আমি তোমায় ভাল রকম বিদেয় করবো।

ঘটকী। কিন্তু মা, একটু খাঁই আছে, পাশ করা ছেলে ত, আগাগোড়া বাঁউটী স্যুটের গহনা দিতে হবে, পায়েও গুজরীপঞ্চম পাঁজর তোমাদের-ই দিতে হবে; এ ছাড়া ছেলের খাট-বিছানা, পেতলের দানসমগ্রী, আর রুপোর চারখানা—থালা, গেলাস, চন্দনের বাটী আর বাটা, আর ছেলের পাতরবসান আংটী, হার আর বাজু।

নগদ ২।৫ হাজার বা সোনারুপোর ওজনের কথা, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন, রুপোর ষোড়শ, আলমারী, কোচ, কেদারাগোছ ফরমাসের স্বপ্ন তখন এম, এ,র বাপ-ও দেখেন নি।

গিন্নী। (ঈষৎ ভগ্নস্বরে) তাই ত মা, খাঁইটা কিছু বেশী দেখছি; বাঁউটী স্যুটের গয়নাতেই ত সাত আটশো টাকার ওপর প'ড়ে যাবে, আবার এ সবের ওপর-ও বরযাত্র কন্যাযাত্র আছে, গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত এ সব—

ঘটকী। তা বাছা, তারাও কি খরচ করবে না ?—এই ধর, কোমরের গয়না ত তোমরা দিচ্ছ না—কোমরে রুপো পরা ত উঠে যাচ্ছে, ছেলের বাপ সোনার চন্দ্রহার দেবে। শাশুড়ী যে বালা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে, তা ত ধরা কথা, তার উপর জড়োয়া ঝাপটা (এটা ফাঁকি—তখন টাকা ৩০।৩৫ এর মধ্যে ঝুটো পাতর বসান জড়ওয়া পাওয়া যেত) দেবে, কানে নতুন ইংরেজী গয়না যা হয়েছে,—ইয়ারিং, তা দেবে। তোমরা ছেলেকে বাজু দিও, মেয়েকে শুধু তাবিজ দিও, মেয়ের হাতের বাজু আমি তাদের কাছে আদায় ক'রে নেব। ভাল পরামর্শ চাও ত এ সম্বন্ধ ছেড় না। পরশু একবার হুগলীতে আমায় একটা মেয়ে দেখাতে যেতে হবে, আসতে পারব না, সোমবারে আসব, একটা পরামর্শ ঠিক ক'রে রেখ, তার পর দেখাদেখি চুকিয়ে এই বোশেখ মাসেই বিয়ে দিয়ে দেন।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

২০

গৃহস্থ লোকের চোখে অশ্লেষা আর মঘা নক্ষত্রটা বড় ভয়াবহ, ঐ নক্ষত্রদুটির

প্রভাবকালে যাত্রাদি কোন শুভকার্য্যেই হিন্দুরা প্রবৃত্ত হন না ; কিন্তু বিবাহ-কার্য্যের পক্ষে মঘা নক্ষত্র বেশ প্রশস্ত কেন, তা আমি অনেক দিনই ভাবি ; বোধ হয়, যে কার্য্য দ্বারা পুরুষ তার জীবনের সমস্ত স্বাধীনতা, কল্পনা, কামনা, কার্য্য একটি বালিকার ক্ষুদ্র চরণতলে বিক্রয় করে, তাহা মঘার ন্যায় বিদ্বেষী নক্ষত্রের দৃষ্টিপাতের সময়ই সম্পন্ন হওয়া উপযুক্ত। বিবাহটা এককালে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দ্বারাই সম্পাদিত হ'ত ; মহাভারতাদি পুরাণবর্ণিত 'হরণ', রাজপুত-দের 'তোরণতোড়', আজ-ও কোন কোন সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির মধ্যে অভিনয়ের ছলে পাত্র বাগ্‌দত্তা কন্যার হাতখানি ধ'রে টেনে নে যাবার চেষ্টা করলে, বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয়ের মধ্যে একটা রঙ্গ-দাঙ্গা হয় আর আমাদের একটু আগের সময় পর্য্যন্ত 'ঢেলা ফেলা' দেখে মনে হয়, যে কন্যার বিবাহ আজ 'কন্যাদায়ে দাঁড়িয়েছে', এক সময় সেই কন্যারত্নলাভ বরের পক্ষে বড় সুসাধ্য ব্যাপার ছিল না। ইংরাজদের মধ্যে বর-কন্যার বিদায়কালে মঙ্গলাচরণ হচ্ছে নবদম্পতির উদ্দেশে ছেঁড়া জুতা ছুড়ে মারা, আমাদেরও অমনই একটা 'গুড়চাল' আছে। কোন পণ্ডিত স্কুলে চালাবার জন্য একখানি ব্যাকরণ লিখে 'অনুগ্রহ' ক'রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তা দেখতে দেন ; পণ্ডিতের পরিচিত কোন ব্যক্তি এসে বল্লেন যে, বিদ্যাসাগর আপনার লেখার উপর কলম চালিয়েছেন। তাতে পণ্ডিত রাগে গরগর হয়ে বলেন, বটে, আমি তাঁর লেখার উপর কোদাল চালাব। এ সংবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পোঁছিলে তিনি হেসে বলেন যে, যার যা অস্ত্র। তেমন-ই আমরা আশীর্ব্বাদ করি তণ্ডুল-খণ্ড নিক্ষেপ ক'রে, আর ইংরাজ আশীর্ব্বাদ করেন ছেঁড়া জুতা ছুড়ে। যেমন 'সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী' মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতেই 'সদ্যোদুঃখবিনাশিনী, সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতি' না ব'লে থামা যায় না, তেমন-ই আমার মুখ দিয়ে ইংরাজের মহিম্নঃ স্তবের অর্দ্ধ-চরণমাত্র রসনাগ্রে এলে স্তবকবচমালার একটা স্তবক না শেষ ক'রে বাণী বন্ধ হয় না। ইংরাজ ত আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সভ্য জাতি ব'লে স্থির ক'রে রেখেছেন, তার উপর আমরা যে বড় অসভ্য ছিলুম, ওঁরা যে আমাদের এই পৌনে দু'শো বছরের ভিতর কতকটা সভ্য ক'রে তুলেছেন, কথায় কথায় এটা ব'লে মুখনাড়া দেন। এতে ইংরাজের বিশেষ দোষ নেই, কেন না, আমরা আপনারাই বুক ঠুকে ঢাক বাজিয়ে ব'লে বেড়াই যে, আমরা প্রায় ইংরাজের মত সভ্য হয়ে উঠেছি !

যদি একজন গারো বা কুকিকে লক্ষ্য ক'রে কেউ বলেন যে, এরা প্রাতঃকৃত্য ক'রে জলশৌচ করে না, একটা পাতায় পুঁছে ফেলে দেয়, তা হ'লে অমন-ই আমরা নাক সিঁটকে বলব, "রাম, রাম, স'রে যা বেটা, ছুঁস্‌নি যেন।" কিন্তু আমরা প্রত্যেকে-ই জানি যে, ইংরাজরা মলত্যাগ ক'রে কাগজমাত্র ব্যবহার করেন, অথচ সাহেব যদি সেই হাত বাড়িয়ে দয়া ক'রে আমাদের সংগে সেক্‌হ্যাণ্ড করেন, তা হ'লে সে দিন আর আমরা ভাত খাই না, পাছে সাহেব-ছোঁয়া হাতখানির পবিত্রতা আঁচাবার সময় ধুয়ে যায়। যিনি ছোঁচান না, তিনি যে আঁচান না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তার পর পরিধান—যার জন্য কাপড় পরা, সেই থাকে বাইরে, প্যাণ্ট কোটের শিষ্টতার এই পর্যন্ত চোট। এইবার উপবেশন,—কেদারা যে বৃক্ষশাখার ক্রমবিকাশ এটা যে-সে বুঝতে পারে। ভোজন,—প্রায় আমমাংস। আমরা-ও প্রথম যৌবনে গ্রেট ইস্টার্ণে যখন মটন চপ ছুরি দিয়ে কেটেছি, তখন-ও ভিতর থেকে রক্তের মতন কি একটা দেখা দিয়েছে; তার উপর পনীর, শসেজ আর-ও কত কি দেবভোগ্য বস্তু যে পাশ্চাত্য রসনার তৃপ্তিদায়ক, তা অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন। বিবর্তনের নিয়মবশে নখাংগুলি রূপান্তরিত হওয়ার কারণ ভোজনের সময় কাঁটার প্রয়োজন। চুম্বন আমরা মুদ্রিত করি বটে, কিন্তু প্রকাশিত করি না। দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে মুদ্রাযন্ত্রের ঐ স্বাধীনতাটুকু এ দেশে এখনও প্রবেশ করে নি। আমোদ-প্রমোদ ভাগ্যে আমরা ওঁদের সব দেখতে পাই না, তাই রক্ষে, নইলে যা শুনেছি পড়েছি তা আমাদের কাছে বড়-ই বিট্‌কেল ঠেকে। সোজাসুজি স্ত্রীপুরুষের নাচ ত আছে-ই, এ দেশের ল্যাপচা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে-ও তা প্রচলিত আছে, কিন্তু আর-ও যে সব নাচ আছে, মুখে লাল নীল রং মেখে মুখোস প'রে লম্ফ-ঝম্প। মাদ্রাজে এক সময় একজন লাটসাহেব ছিলেন, তাঁর বড় প্রিয় উপভোগ্য ছিল ডেভিল ড্যান্স অর্থাৎ ভূতের নাচ। এ সবে সভ্যতা অসভ্যতার কথা নয়, ছেলেমানুষে আর প্রবীণে যা তফাৎ, য়ুরোপীয় ও ভারতবাসীতে সেই তফাত। আমাদের শাস্ত্র বলে যে, আত্মা অনেকটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তবে এ দেশের শ্যামাংগে প্রবেশ করে আর শ্বেতাংগ মধ্যস্থ আত্মা নিতান্ত শিশু।

বিয়ের শাঁক বাজাতে বাজাতে একবার ডাইনিং রুমে বল-রুমে বেড়িয়ে এলুম, এইবার বরণটা ক'রে নি।

প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ধর্ম্মাচরণের উপর হস্তক্ষেপ না ক'রে-ও ইংরাজী বই,

ইংরাজী জিনিষের বহিশ্চাকচিক্য, ইংরাজী-পড়া মাষ্টার, ইংরাজী-পড়া ডেপুটী-টেপুটী চার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের মন থেকে ব্রাহ্মণ-প্রভাবের সংস্কার দূর ক'রে ইংরাজী আদর্শের প্রভাব প্রতিষ্ঠা ক'রে সাহেবরা আমাদের যে কি ক্ষতি করেছেন তা ভাল ক'রে বুঝতে আমাদের এখন-ও কিছুদিন বাকী আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে 'বামুন-ঠাকুর' নামক সম্প্রদায় আমাদের মাথা আর তাঁদের নিজের মাথা ভেঙ্গে চুরে, চটকে, পুড়িয়ে অনেক রকম ক'রে খেয়েছেন। মদ খেলে নেশা হবেই, তা কেউ বা ছটাকে মাতাল, কেউ বা আধ বোতল-ও বেশ হজম করেন। প্রভুত্বশক্তির বোতলে-ও যে-মদ থাকে, তার পানে-ও মত্ততা অবশ্যম্ভাবী। সেই মদ আজ পর্য্যন্ত ইংরেজরা ৩ কোয়ার্টার আন্দাজ পান করেছেন, তাই তাঁরা বলেন, কৃষ্ণবর্ণচর্ম্মবিশিষ্ট জাতিগণের উপর প্রভুত্ব করবার জন্য পরমেশ্বর শ্বেতচর্ম্ম বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ জাতি সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু এক সময়ে 'বামুন ঠাকুরেরা' ঐ বোতলের তলা আকাশের সহিত সমান্তরালে স্থাপন ক'রে এতটা শক্তির মদ পান করেছিলেন যে, নেশার ঝোঁকে পুথিতে লিখে ফেল্লেন যে, এক দিন আমাদের-ই এক জন বামুন গোলোকধামে গিয়ে বিশ্বপতি বিষ্ণুর বক্ষে সজোরে পদাঘাত করলেন, আর বিষ্ণু অমন-ই শশব্যস্তে তাঁর পায়ে ব্যথা লেগেছে ব'লে হাত বুলুতে লাগলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া' পদকের মতন আজ-ও বক্ষে ধারণ ক'রে ত্রিসংসার পালন কচ্ছেন।

কুশণ্ডিকা (যাকে অনেক বামুন এখন 'কুশণ্ডিমে' বলেন) আমাদিগের বিবাহে অতি প্রয়োজনীয় পবিত্র দৈবক্রিয়া। সম্প্রদানে মাত্র আইন-সঙ্গত চুক্তির কথা, কিন্তু কুশণ্ডিকায় আত্মায় আত্মায় বিবাহ, যে বিবাহ হয় ব'লে আমাদের বিধবারা দেহান্তে পতির আত্মার সহ নিজের আত্মার মিলনের প্রতীক্ষায় যাবজ্জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। অদূর অতীতে এই পশ্চিম-বঙ্গ দেশে কোন বামুন ঠাকুর নস্য নিয়ে হুকুমজারী করলেন, শূদ্রদের আবার কুশণ্ডিকা কি? —কোন দরকার নেই, সেই অবধি কায়স্থাদি জাতির মধ্যে কুশণ্ডিকা উঠে গেছে। এ অবস্থায় আমরা কায়স্থাদি জাতি যদি বালবিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ দিই, তাহা হ'লে কোন শাস্ত্র কোন কথা বলতে পারে না, কেন না, দেহের বিবাহ, দেহনাশের সঙ্গে-ই শেষ হয়ে গেছে।

যাহা হউক, আমাদের সময় বাল্যবিবাহে গুরুজনরা সর্ব্বেসর্ব্বা হ'লে-ও ক'নের কথা বলতে পারি নি, কিন্তু বরের মনে যে একটু আধটু 'প্রণয়ের'

ছায়াপাত হয়নি, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ আমার ত হয়েছিল। তখন ১৫ বৎসর মাত্র বয়স, এণ্ট্রান্স পড়ি, ৩ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ এল, ঠাকুরদা ক'নে দেখে এলেন, বর দেখতে এল, দেখা দিলুম, একটা স্কুলমাষ্টার সঙ্গে ছিল, কড়া এগজামিন করলে, তা-ও দিলুম, এই অবধি। বে'র কথা, বে' জানেন, দাদা জানেন, কাকা জানেন, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁরা যা বলেন, তাই করা।

প্রেম-ফ্রেমের কথা তখন ততটা বুঝিনি, তবে দু'এক জন সহপাঠীর একটু আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তাদের মুখে বাসরঘর আর ফুলশয্যার কথা শুনে বেশ একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি লাগত। দুর্গেশ-নন্দিনী বইখানি বছরখানেক আগে পড়েছিলুম, কিন্তু তাতে প্রণয় ব্যাপারটা রাজপুত্তুর, নবাবপুত্তুর গোছ সিং-খাঁদের-ই ব্যাপার, এই রকম একটা ঝাপসা ঝাপসা ভাব মনে ঠেকেছিল; কিন্তু বিপদ করলুম বিবাহের দিন দুপুরবেলা। দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটক কিছু আগে বেরিয়েছে, সেই বই একখানি জোগাড় হয়েছিল, উপোসের ক্ষিদের তাগাদা ভোলবার জন্য সেই বইখানি সমস্ত দুপুরবেলাটা পড়লুম, তখন বুঝলুম যে, প্রেম শুধু হিন্দুস্থানী রাজারাজড়াদের একচেটে নয়, আমাদের বাঙ্গালী গৃহস্থঘরে-ও চালালে চলতে পারে। তখন আমার সঙ্গে রাত্রে যে পদার্থটির আধ্যাত্মিক রসায়ন সংযোগ হবে, সেখানি নাটকগত কোন চরিত্রমত হ'লে আমার চিত্তের প্রসাদলাভ হবে, তাই ভাবতে লাগলুম। রাজলক্ষ্মীকে মোটে-ই পছন্দ হ'ল না, কেন না, আমাদের হেডমাস্টার আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সভ্য ঈশ্বর নন্দী মহাশয় গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সেজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ব্রাহ্মধর্ম" প্রথম ভাগের ব্যাখ্যা করছেন মনে হ'তে লাগল। ক্ষীরোদসুন্দরীটা যেন উপোসপোড়া ছিঁচকাঁদুনে রোগা মড়াটা। লীলাবতী বেশ সাজাগোজা কবিতা-পড়া মেয়ে বটে, কিন্তু কেমন মনে হ'ল যেন কলের পুতুল, একজিবিসনে পাঠাতে বেশ; কিন্তু ফার্ষ্ট ডিবিসনে চারটে পাশ করবার আগে তার সঙ্গে যে প্রণয় জমিয়ে তুলতে পারব, এমন মনে হ'ল না, নিয়ে ঘরকন্নার কথা ত নয়-ই। এইবার সারদাসুন্দরী, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ, পুরোপুরি মনের মত, আদর্শ স্ত্রী; আমার চেয়ে কিছু বয়সে বড় ব'লে মনে হ'ল বটে, তা ভাবলেম, ম্যানেজ ক'রে নেওয়া যাবে।

সারদাসুন্দরীকে বুকে ক'রে আভ্যুদয়িকের আশীর্ব্বাদ নিলেম, চেলীর

কাপড় পরলেম, বর-চন্দন মাখলেন, টোপর মাথায় দিলেম; মা'র যখন পায়ের ধূলো নি, তখন-ও সারদাসুন্দরী বুকের ভিতর। "তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি" বাঁধা কথাটা বলবার সময় জিভটা একটু এড়োছিল, কিন্তু ভাবলেম, আর ত কারো নয়, মা'র দাসী, আমার কাছে সে ত মহিষী।

পাল্কী চড়লেম সারদাসুন্দরীকে চেলীর উত্তরীয়ের ভিতর লুকিয়ে, পার হবার সময় পানসী-ও যত দোলে, বুক-ও তত দোলে, সঙ্গে দোলে সারদা। ছাঁদনাতলায় কোলের কাছে দেখি যে, আমার কল্পনার সারদাসুন্দরী আর সেই "নাতিদীর্ঘ", "নাতিখর্ব্ব" নেই, যেন ভট্টাচার্য্যির বাড়ীর দুর্গোৎসবের চেলীপরা ছোট্ট কলা-বৌ। শুভদৃষ্টির সময় দেখলুম, চক্ষু দুটি অনেকটা সারদাসুন্দরীর মত বটে, কিন্তু অঙ্গ থেকে যেন গায়েহলুদের হলুদের গন্ধের সঙ্গে একেবারে ঝিনুকের দুধের গন্ধ বেরুচ্ছে। দু'চার বছরের ফেরে মানুষের বয়সটার কি বং-বদল-ই না হয়; আমার বয়স পনেরো, ক'নের বয়স সবে নয়, এতে-ই আমি আমাকে যুবা, আর তাকে খুকী মনে করতে লাগলুম, মনটা বড় মুসড়ে গেল।

হায় খুকি! বছর পাঁচেক পরে-ই না তুমি কি খেলা আরম্ভ করলে!—

কালি যেই বালিকারে করেছি শাসন।
আজি সেই জুড়ে বসে রাণীর আসন॥
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া গেছে লাবণ্যের জলে।
যৌবন তুফানে রঙ্গে তরঙ্গ উছলে॥

* * *

তর্জ্জন তর্জ্জনী অগ্রে এলো কোথা হ'তে।
হেলায় চালায় পতি দাগ দেওয়া পথে॥

যে যুবক সেকালের থিয়েটারে প্রায় সমবয়স্ক দুর্দ্দম যুবকদের, কুলাচার-বর্জ্জিতা অভিনেত্রীদের পর্য্যন্ত নিজের ব্যবহার-কৌশলে কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলে বশবর্ত্তী ক'রে চালিয়েছে, তাকে-ও তুমি একটা কড়ে আঙ্গুলের ইঙ্গিতে উঠ্-বস্ করিয়েছ।

ছাপ্পান্ন বৎসর পরে সেই খুকী এখন একেবারে লর্ড রেডিং! যৌবনে ছিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এখন সাক্ষী-সাবুদ, একজামিন, ক্রশ-একজামিন, ট্রয়াল-বিচার সব চুলোয় দিয়ে একেবারে অর্ডিন্যান্স!

২১

৫৬ বৎসর পূর্ব্বে এক ফাল্গুন মাসে পরিণয়-বৃক্ষের যে কাঁচ ফলটি কুড়িয়ে পেয়ে তার অতুলনীয় মনোহর গন্ধঘ্রাণে বাল্যানন্দ ভোগ করেছি, সেই অমৃত-ফল ক্রমে বর্দ্ধিত হয়েছে, সুপক্ক হয়েছে, তাতে রং ধ'রে স্বাদে ও সৌরভে প্রাণ মাতিয়ে দিয়েছে, আর আজ-ও যেটিকে মালদহের আমসত্ত্বের আদরে ভাঁড়ারের অমূল্য সংস্থানরূপে রক্ষা ক'রে আসছি, সেই বিবাহের কথা একবার পাড়লে সহজে কি তা ছাড়া যায় ? বিশেষতঃ আমাদের সময় পর্য্যন্ত-ও বিবাহ ব্যাপারটা এ দেশে ভদ্র ঘরে একটা সত্য সত্য উৎসব বলে-ই গণিত হ'ত। বর্ত্তমান বঙ্গে গৃহস্থ পিতারা শুনে আশ্চর্য হবেন যে, তখন-ও পর্যন্ত কন্যাদানের সময় মেয়ের বাপের প্রাণে-ও একটা আনন্দের ঢেউ খেলত। নগদ টাকার নাম-গন্ধ-ও তখন ছিল না ; ববং কয়েক বৎসব পর্য্যন্ত পূর্ব্বে আমাদের কুলীন কায়স্থের ঘরে কুলকর্ম্মের সময় পাত্রের পিতাকে কন্যাকর্ত্তার চরণে যে একটা পণ বলিয়া প্রণামী দিতে হ'ত, তা-ও এক প্রকাব বন্ধ হয়ে এসেছিল। বিবাহ-বাড়ীতে অন্ততঃ ১০।১৫ দিন ধ'রে বেশ একটা আমোদ-আহ্লাদ চলত। প্রথম সম্বন্ধ ঠিক হবার পর 'পাকাদেখা', উভয়পক্ষ-ই অবস্থানুসারে ৪ টাকা থেকে একখানা মোহর পর্য্যন্ত দিয়ে পাত্র বা পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ ক'বে আসতেন, সঙ্গে থাকতেন পুরোহিত আর মোট ৪ জন থেকে ৮ জন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ও স্বজাতি। বাড়ীর মেয়েদের হাতের তৈরী মিষ্টান্নাদি ও কিঞ্চিৎ ফলেই তাঁদের জলযোগ ও পরিতুষ্টি হ'ত। ইদানীং এক একটা পাকা দেখার খরচায়, বোধ হয়, তখনকার এক একটা বিবাহ সম্পন্ন হ'ত। তার পর এক দিন পত্র, সে শুভকার্য্যটা কন্যাপক্ষ প্রায়-ই পাত্রের বাড়ীতে গিয়ে সম্পন্ন করতেন ; সম্বন্ধ যে-ঘটকের দ্বারা-ই ঘটুক, পত্রের সময় এক জন কুলাচার্য্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করা হ'ত ; দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্র এই দুই জনে-ই আমাদের কলকাতা অঞ্চলে প্রধান কুলাচার্য্য ছিলেন। প্রথমোক্ত ঘটক মহাশয় আমার বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অনেকদিন গত হয়েছেন, কয়েক বৎসর পরে ঈশান-ও দেহরক্ষা করেছেন, তার পর থেকে-ই কলকাতার কায়স্থসমাজে কুলাচার্য্যের পাট উঠে গেছে। ঈশানের বংশধররা কেউ বা ডাক্তার, কেউ বা কেরানী বা আর কিছু। ঘটকালী ছেড়ে ইংরাজী কায ধ'রে কুলাচার্য্যকুলধরগণ মানে ও ধনে লাভবান্ বা

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সে বিচার তাঁরা করুন, কিন্তু সমাজ যে তাঁদের উপেক্ষা ক'রে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা বোঝেন নি এখন-ও—বুঝবেন একদিন। ইংলণ্ডের 'কলেজ অফ হেরাল্ডস্' এখনও রাজশক্তি ও সমাজশক্তি দ্বারা সম্মানে সুরক্ষিত ; অনেক অজ্ঞাত পরিচয় ইংরাজ চর্ব্বি, চামড়া, বেনে-মশলা বা বিষয় সম্পত্তি বেচে ব্যারনেট হবার পর ঐ হেরাল্ড কলেজে 'যৎকিঞ্চিৎ' নয়, যথেষ্ট কাঞ্চনমূল্য দিয়ে একটা কুলপরিচয় তৈরী করিয়ে নেয়, আর আমাদের এই কুলাচার্য্যরা-ই পুরুষানুক্রমে প্রত্যেকের বংশপরিচয় এবং বিবাহ দ্বারা কার কোন্ ঘরে আদান-প্রদান হ'ল, তার রেকর্ড রক্ষা করতেন। আমার অগ্রজোপম পূজনীয় বাগবাজারের নন্দলাল বসু মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে বহু পরিশ্রমে ঐ দীনবন্ধু, ঈশান প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে কায়স্থদিগের বংশ পরিচয় সংগ্রহ ক'রে মুদ্রিত ও সমাজে বিতরিত ক'রে গেছেন। উক্ত পুস্তক দেখে আমার এটা-ও বেশ বোধ হয়েছে যে, ইদানীং ঘটক মহাশয়রা-ও নিজেদের কর্ত্তব্য বিবেকের সঙ্গে পালন করেন নি ; দীনবন্ধু ঘটক আমার ও তৎপরে আমার পিতৃব্যপুত্রের বিবাহে-ও উপস্থিত ছিলেন। মর্য্যাদাস্বরূপ অর্থগ্রহণ করেছেন, অথচ আমার প্রপিতামহের পরে আর কার-ও নাম নন্দবাবুর প্রকাশিত পুস্তকে নাই ; আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় ঈশান উপস্থিত থাকেন ও আমায় বলেন যে, দীনবন্ধুর সমস্ত কাগজ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রপিতামহ গঙ্গাচরণ বসুর পর আর কার-ও নাম পান নি।

কুলাচার্যরা এক রকম বিবাহের রেজিস্ট্রার ছিলেন, বিবাহের শুভপত্র তাঁরা-ই লিখতেন এবং স্বাক্ষর করতেন, সিঁদুর-মাখান একটি টাকার ছাপ দিয়ে ষ্ট্যাম্প করা হ'ত, তার পর ধানদূর্ব্বা পত্রের মধ্যে রেখে বেশ ভাল ক'রে পাট ক'রে কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার হাতে দিতেন ও পরস্পরে নমস্কার ও কোলাকুলি করতেন। সেই দিন-ও যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন থাকত। পত্রের পর গাত্রহরিদ্রা বা 'গায়ে হলুদ', ঐ দিন থেকেই বিবাহের উৎসব আরম্ভ।

অঙ্গসংস্কারে এ দেশে পূর্ব্বে সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রা, ছোলা, মসুর ডাল প্রভৃতির বেশম, চন্দন, কেশর, চাঁপা প্রভৃতি দেশীয় ফুলপত্র, গোধূম-চূর্ণ, দুধের সর, অলক্তক, কজ্জল, খদির প্রভৃতি ব্যবহৃত হ'ত। সকল গৃহস্থ রমণী প্রায় ঐ সকল ও অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহারে নিপুণা ছিলেন, এতদ্ব্যতীত প্রসাধন বিদ্যা-শিক্ষিতা বেতনগ্রাহিণী সৈরিন্ধ্রীর-ও অভাব ছিল না। মুসলমান আমলে

বিবিধ ফুলের আতর, গোলাপ, সুর্ম্মাদি কয়েকটি দ্রব্য-ও এ দেশীয়দের মধ্যে সমাদর লাভ করেছিল। এখন যে হলুদেব সাহায্য ভিন্ন কোন ব্যঞ্জন-ই প্রায় প্রস্তুত হইতে পারে না, সে হলুদ গায়ে মেখে স্নান করতে লোকের ঘৃণা হয়; দুধের সরে-ও অনেক সভ্যা নাসিকায় দুর্গন্ধ অনুভব করে, অথচ ভাগাড়ের চর্ব্বি (হ্যাঁ, ভাগাড়ের চর্ব্বি, ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর, ছুঁচোর চর্ব্বি—নইলে চকচকে কাড়ির কৌটো বা পলতোলা শিশি য়ুরোপ থেকে আমদানী হয়ে ৬।৭ আনায় এ দেশে বিক্রী করা পোষাত না) একটু স্পিরিটে ভেজা গন্ধ মিশিয়ে পমেটম্ বা গোল্ডন অয়েল ব'লে আদর করে মুখে মাথায় মেখে আপ্যায়িত হনর দেড় আনা জোড়া সাবান কি মনে করেন যে, নারিকেলাদি উৎকৃষ্ট তৈল বা এক টাকা পাউণ্ডের উৎকৃষ্ট চর্ব্বি দিয়ে প্রস্তুত হয়? চুলোয় যাক্ ও কথা—শ্বেত জাতি আহাম্মক, তাই আজ-ও বিলাতী "বিষ্ঠাবিষ্ট' আমাদের অঙ্গরাগের জন্য এ দেশে আমদানী করেন না।

এই যে আমাদের নাট্যশালার প্রেক্ষাগৃহে খড়ি, সফেদা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, এতে আমাদের শ্যাম চামে না সাহেবী—না দেশী কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বং-ই ফুটে উঠে না; গোড়ায় গোড়ায় আমরা কতকটা পেউড়ি ব্যবহার করতেম, তাতে কতকটা কায হ'ত। আগেকার বহুরূপীরা হরিদ্রা, পেউড়ি, হরিতাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করত, শেষটা সফেদার চেয়ে অনিষ্টকারী। আমাদের সুন্দর মেয়ের কথা বলতে গেলে, বলে, যেন কাঁচা সোনার-রং; যে 'বেশকার' হরিদ্রাকে জমী ক'রে অন্য কিছু কিছু রঞ্জন পদার্থের মিশ্রণে ভারতবর্ষের মুখশ্রী বর্দ্ধনে, উপযোগী 'কাঁচা সোনার রং' প্রস্তুত করতে পারবে, সে আপনার ভাগ্য ফিরিয়ে নেবে।

হরিদ্রা কেবল রঞ্জন-বস্তু নয়, এণ্টিশেপটিক, জার্ম্মিসাইড; হলুদ মাখলে গায়ের পোকা মরে, ঘায়ে হলুদ দিলে ঘা সারে, এ দেশে তা চিরকালই জানা আছে।

গাত্রহরিদ্রার দিন প্রাতে পাত্রের বাড়ী থেকে পাত্রীর পিত্রালয়ে তাঁর অঙ্গরাগের দ্রব্যাদি পাঠাতে হয়। কতকটা বাটা হলুদ পাত্রের ললাটে স্পৃষ্ট হয়ে কন্যার বাড়ী পাঠালে, তবে তার দ্বারা পাত্রীর প্রথম অঙ্গরাগ হবে। ভাবী বধূর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ীর আজ প্রথম আদরের সম্ভাষণ, সুতরাং ঐ একটা বাটি ক'রে একটু হলুদবাটা পাঠিয়ে-ই কি মনে মনে তাঁরা আহ্লাদ অনুভব করতে

পারেন ? তাই ঐ হলুদটি দিতে হবে, একটি ভাল সুন্দর বাটিতে। আমাদের সময়ে-ও ঐ হলুদ আর চন্দনের জন্য রূপোর বাটি কলকেতার অনেক স্থানে প্রচলিত হয়েছিল। তার পর ক'নে কি প'রে হলুদ মাখবেন—তার জন্য একখানি ভাল চওড়া লাল পেড়ে কোরা তাঁতের সাড়ী চাই। হলুদ ত শুধু মাখে না, তাই প্রথম ব্যবস্থা হলুদের সংগে খানিকটা খাঁটি সরিষার তেল, ঐ তেল-হলুদ মাথাঘষাদি একখানি নূতন মাদুর পেতে ক'নেকে তাতে বসিয়ে তাব চুলে ও অংগে মাখাবেন ৫টি আত্মীয়া এয়ো। স্নানেব জন্য একখানি ভাল রঙিন্ গামছা, স্নান ক'রে উঠে ক'নে বসবেন, তার জন্য ভাল মেদিনীপুরে মছলন্দ মাদুর, আমরা যেন সংগে সংগে ভাল একখানা সতরঞ্চও পাঠিয়েছিলুম, আবার একখানি ভাল ধোবদস্ত কাপড়, তোয়ালে একখানা কেউ কেউ দিত, বেনারসী সাড়ী-ও একখানি পাঠান হ'ত। সিঁদুর-চুবড়িটা হচ্ছে, একটি চেঁচাড়িতে বোনা ছোট ঝাঁপি, বাহিবের দিকে খানিকটা লালবনাত মুড়ে তার উপর কড়ি বসিয়ে বাহার করা, ভেতরে থাকে কাঠের মালা, ঘুনসী, কাজললতা, তিলক-মাটী, একখানি ছোট আরসী, চিরুনী, শাঁখা, সিঁদুর, আলতা, রুলী, হাতের লোহার কড় অর্থাৎ সেকালের টয়লেট বক্স। একটা খেলনার বাক্স-ও দেওয়া আমাদের সময় চলিত হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এখন সেই মামুলী চুবড়ী ত আছে-ই, তার উপর দিতে হয়, একটা রূপোর সিঁদুর-চুবড়ী, যাঁরা 'তিলকাঞ্চনে' সারতে পারেন, তাঁরা চেঁচাড়ির চুবড়ির উপর খানিকটা খানিকটা রূপোর বাতা মেরে চালিয়ে দেন, না হয় পুরোপুরি চাঁদির গড়া চুবড়ি ; সেকালের সম্মানরক্ষার পর একালের আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য একটা চুল বাঁধার বাক্স, একটা সেলায়ের বাক্স, একটা খেলার বাক্স, একটা লেখার বাক্স আর খেলনা পুতুল সাজান খান ৫।৬ ট্রে ; সেকালের মত ফুল, ফুলের মালার থালা, তাতে একটা রূপোর বাটিতে চন্দন ঘষা, ইতি সেকাল ; তারপর এখন ট্রে ভরা ভরা জোয়ানপুরী ফুলেল তেল, গাজিপুরী গোলাপ, আগরার আতর, বৌবাজারের কুন্তলীন, ম্যাকেসার, মদন-বিলাস, রম্ভারঞ্জন, পতিপাগলিনী এই ধরণের কত রকম তেল, দেশী ও বিলিতী নাম দেওয়া পাশ্চাত্য এসেন্সের শিশির রাশি, পাউডারের কৌটা (রূপোর হ'লেই বিশেষ গ্রাহ্য) পাউডার পাফ, পাউডার ব্রুস, ভাল আরশী, খান পাঁচ সাত চিরুনী, খান দুই মাথা-ব্রুস। বড় বড় এটর্নী, ডাক্তার, উকীল, কন্ট্রাক্টর প্রভৃতি ধনবানগণ এ সব রূপোর-ই দিয়ে থাকেন। পরিধেয় বস্ত্র এখন একটি

গাঁট-পরিমিত ; জরিপাড়, বাহারে বাহারে পাড়, গোলাপী, আসমানী, বাসন্তী প্রভৃতি নানারকম রং-করা সাড়ী, কাশীর সাড়ী, ঢাকাই সাড়ী, শান্তিপুরে সাড়ী, মাদ্রাজী, বোম্বাই কত রকম-ই যে সাড়ী, তার ঠিক নেই। তখন সেমিজ-ও ছিল না, বডিস-ও ছিল না, কিন্তু এখন সুতী, শিল্ক, সাটিন, ভেলভেট, সল্মা চুমকীর কায করা রকম রকমের জামা, জ্যাকেট, ব্লাউজ। এক স্বুট পেতল-কাঁসার বাসন দেওয়া সেকালে-ও ছিল, একালে-ও আছে। ইংরাজদের মেয়ের বিয়েতে 'ব্রাইডস্ মেড' অর্থাৎ ক'নের সখী হন গুটি কয়েক কুমারী, আর আমাদের দেশে ক'নের সখী হন 'এয়ো' অর্থাৎ পাঁচ সাতটি সধবা, এঁরা প্রায়-ই সম্পর্কে ক'নের বিবাহিতা ভগ্নী, ভাজ প্রভৃতি। এই এয়োদের জন্য-ও গামছা সাড়ী সিঁদুর চুবড়ি প্রভৃতি দেওয়া সেকালে-ও ছিল, তবে একালে কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। আর দিতে হয় ঘি, ময়দা, তরিতরকারি, মাছ, দধি, ক্ষীর এবং সন্দেশাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন। ইদানীং এমন ওজনে দিতে হয় যে, তত্ত্ব নিয়ে যে সব ঝি-চাকর এক একখানি রেকাবি বা থালা হাতে ক'রে যাবে, আর এক টাকা দুই টাকা হারে বিদায় পাবে, তারা প্রত্যেকে ঐ ঘি-ময়দায় লুচি ভাজিয়ে, ঐ আনাজের তরকারি করে, দধি-সন্দেশাদির সহযোগে পেট পরিপূর্ণ ক'রে খেয়ে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রসাদ রেখে আসবে। সে কালে ভাল মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যেত বড় জোর ৮।১০ জন লোক, এখন যায় অন্ততঃ ৩০ থেকে ৫০ জন। বড়মানুষের পক্ষে এইটেকে ২ দিয়ে গুণ ক'রে নেবেন।

গায়ে হলুদের পর এক দিন আগে হ'ত, এখনও হয়, আইবুড়ো ভাত। যেমন এক সময়ে কলকাতা জোড়াসাঁকোর লোকেব মধ্যে কেহ কেহ নিমন্ত্রণ পত্রে ঠিকানা দেবার সময় সংস্কৃত বিদ্যা প্রকাশের জন্য জোড়াসাঁকোর পরিবর্ত্তে যুগল সেতু লিখতেন, তেমনই আজকাল দেখতে পাই, আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ পত্রে আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন অনেকে লিখে থাকেন। এটা ভুল, কেন না, লোকে অবিবাহিত ছেলে বা মেয়েকে আইবুড়ো বলে, তার মানে কি কুমার-কুমারী অবস্থায় আয়ুর্বৃদ্ধি হ'তে থাকে, বিবাহের পর কমে? অব্যূঢ় শব্দ হ'তে আইবুড়ো শব্দের উৎপত্তি। যে দেশে এখন-ও কুমারী পূজার ব্যবস্থা আছে, যে দেশে কুমারকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল, সে দেশে কৌমার্য্যের যে একটা স্বতন্ত্র পূজা থাকবে, এ একটা কিছু বিচিত্র নয়।

বিবাহিত নবজীবনে প্রবেশের পূর্ব্বে পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন এই জন্য বিবাহের অনতিপূর্ব্বে কুমার-কুমারীকে আদরে ভোজন করিয়ে উৎকৃষ্ট নব বসন ও অলঙ্কারাদি উপহার দিতেন। আগে আইবুড়ো ভাত এক দিনের ব্যাপার ছিল না। গাত্র-হরিদ্রার দিন থেকেই বর ও ক'নে সর্ব্বদা নতুন ভাল কাপড় ও গহনা প'রে থাকত। সে কালে বর-ও গহনা পরত, যথা,—হার, বালা, বাজু, আংটী; ছেলেদের-ও কর্ণবেধ ছিল; সুতবাং মাকড়ী-ও যে কেউ কেউ পরত না, এমন নহে। প্রথম দিন পিতৃভবনে-ই ভোজন, আর সে দিন যজ্ঞ অর্থাৎ ভোজ: ক'নের বাড়ী নিমন্ত্রিতা কুটুম্বিনী প্রতিবেশিনী ইত্যাদি, বরের বাড়ী নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, কুটুম্ব প্রভৃতি। তার পর ৮।১০ দিন ধ'রে আজ মাসীর বাড়ী, পরশু মামার বাড়ী, তার পরদিন বিশেষ কোন পিতৃবন্ধুর বাড়ী গিয়ে বর-ক'নের আর-ও ৫ জনের সংগে ব'সে ভোজন ও উপহার গ্রহণ। এতদ্ভিন্ন নিমন্ত্রিত, পরিচিত ও কুটুম্ব মাত্রে-ই বরকে ও ক'নেকে মিষ্টান্নের সংগে ধুতি-চাদর বা সাড়ী পাঠাতেন।

আজ কয়েক বৎসর হ'ল, কলকেতার দেখাদেখি মফঃস্বলে ও পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে নিমন্ত্রণপত্রের নীচে "উপহার গ্রহণে অক্ষম, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন" লেখার প্রথা চ'লে গেছে। এ প্রথার ভালর দিক্-ও আছে, মন্দর দিক-ও আছে, কেন না, এখন বাড়ীর কাছে ১০ দিনের ভাড়াটে, আফিসের আলাপী, ট্রেনের আলাপী, ট্রামের আলাপী, মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার থানার ইন্-স্পেক্টর, পোষ্ট-মাষ্টার প্রভৃতি বিস্তর অস্থায়ী আত্মীয়কে আনন্দে, আতঙ্কে বা চক্ষুলজ্জায় নিমন্ত্রণ করতে হয় এবং ঐরূপ উপহার গ্রহণে তাঁদের উপর যেন 'টেক্স বসাচ্ছি—টেক্স বসাচ্ছি' ব'লে মনে হয়; কিন্তু আসলে ঐ উপহার আদান-প্রদানের প্রথা একটি বড় উপকারী নিয়ম ছিল। আজ এখন যে 'কো-অপারেশান—কো-অপারেশান' কথা নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি, তখনকার দিনে গ্রাম্য ইকনমিতে ঐ প্রথা ছিল একটি সুন্দর 'কো-অপারেশান।' সমস্ত কুটুম্ব ও গ্রাম নিয়ে যেন একটি পূর্ণ গৃহস্থালীর ব্যবস্থা ছিল। আমার একটি মেয়ের বিবাহ, বাছাকে পরাবার ও তার পেঁটরায় দেবার জন্য কতকগুলি বস্ত্রের প্রয়োজন, একসংগে আমার অতগুলি কাপড় কিনতে গেলে বিবাহের সময় হাত থেকে অনেকগুলি নগদ টাকা বেরিয়ে যায়, কিন্তু সকল আত্মীয় যদি সে সময় আমাকে এক একখানি কাপড় দেন, তা হ'লে বিবাহের সময়কার প্রয়োজন

পূর্ণ করে-ও ভবিষ্যতে দোলের তত্ত্ব, রথের তত্ত্ব, চড়কের তত্ত্বর জন্য-ও দু'-দশখানা কাপড় মজুত থাকে। আজ আমার আত্মীয়-প্রতিবেশীরা প্রত্যেকে কিছু কিছু খরচ ক'রে আমার পক্ষে আমার বিপুল খরচের সাহায্য করলেন, ছ'মাস পরে আমার এক কুটুম্ব বা গ্রামস্থ ব্যক্তির পুত্রের বিবাহের সময় আমি আর সকলে মিলে ধুতি-চাদর দিয়ে তাঁর দায়ে সহায় হলেম, মোটের উপর কার-ও ঘাড়ে বেশী বোঝাই পড়ত না। গহনা-ও এইরূপ মাসী-পিসী, মামা-মামীরা, কেউ বা চৌদানী, কেউ বা তাবিজ, কেউ বা নিদেন মল কি পাঁজব দিয়ে উপকার করতেন এবং তাঁদের সময়-ও প্রত্যুপকার পেতেন। আজকাল এই কলকাতা সহরে মুস্কিল হয়েছে, ময়রাদের কাছে সন্দেশ উপহার পেয়ে পঞ্জিকাকাররা প্রতি মাসে ১৫।১৬ টা ক'রে বিবাহের লগ্ন লিখে দেন, শ্রাবণ মাসের তিথি ধ'রে ভাদ্র মাসে-ও ভট্টাচার্য্য ঠাকুর উপলগ্নের নির্দ্দেশ করেন ; আব এক একটা লগ্নে প্রতি গৃহস্থের বাড়ী ৮।১০ টা ক'রে বিবাহের নিমন্ত্রণ, সুতরাং 'ত্রুটিমার্জ্জনা'র মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তার একটু গর্ব্বের ভ্রূকুটি দেখে-ও আমরা অভিমানটা ঢোক গিলে ফেলি।

গর্ব্বের ভ্রূকুটি বললুম ব'লে কেউ কিছু মনে করবেন না, কেন না, অনেকেই বোধ হয়, স্বচক্ষে দেখেছেন যে, কোথা-ও কোথা-ও কন্যাকর্ত্তা আমাদের মতন গরীবের ন' সিকের শাড়ীর ত্রুটি মার্জ্জনা করলে-ও মাড়োয়ারীর বাড়ীর বেনারসী শাড়ী বা বোম্বাইয়ের প্রেরিত জরীর ঢাকাই "এ বড় অন্যায়—এ বড় অন্যায়" বলে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দেন।

বিবাহের দিন প্রাতে আর একটা উপঢৌকন আছে, তার নাম অধিবাস। এই উপঢৌকনের অর্থ বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা কৌলীন্যাদি জাতিগত পর্য্যায়ে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে মর্য্যাদাপ্রদর্শন। ইহাতে বস্ত্র, মিষ্টান্ন, দধি, মৎস্য এবং নগদ অবস্থানুসারে দু'টাকা থেকে দশ টাকা পর্য্যন্ত প্রেরণের ব্যবস্থা। বিবাহের দিন দিবাভাগে নান্দীমুখ। লোকান্তরগত পিতৃ-পুরুষগণকে পূজা দ্বারা তৃপ্ত না ক'রে হিন্দুজাতির কোন শুভকার্য্যের-ই সূচনা হয় না, সুতরাং কন্যা বা পুত্রের বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ দ্বারা নান্দীমুখ ক'রে তবে আনন্দোৎসবে প্রবৃত্ত হ'তে হয়।

উড়িষ্যার কোথা-ও কোথা-ও রাত্রিতে বরযাত্রা ও উৎসবাদি হলে-ও বিবাহ-কার্য্য পরদিন দিবাভাগে হয় শোনা গেছে ; কিন্তু সাধারণতঃ আর্য্যাবর্ত্তে বা

বঙ্গদেশে দিবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা পরে বরযাত্রী প্রভৃতির সমভিব্যাহারে বর ক'নের বাড়ী যাত্রা করে। যাত্রাকালে গৃহস্থ ঘরের বরের পরিধেয় চেলির জোড়, মাথায় জরির কায-করা শোলার টোপর; টোপরটি মুকুটের বাঙ্গালা পরিভাষা, বর সে দিন রাজা, তাই সে দিন তার মাথায় মুকুট; সত্যই রাজসম্মান সে দিন বরের প্রাপ্য। নবাবী আমলে স্বয়ং নবাব নিজাম-ও শোভাযাত্রা ক'রে রাস্তায় বেরুলে বরকে আগে পথ দিতেন। অনেক ইংরাজ রাস্তায় দেশীয় লোকের-ও শব বাহিত হ'তে দেখলে, টুপি খুলেন দেখেছি, কিন্তু জাঁকের বরের বাজনা শোনা ছাড়া, অন্যরূপ আদর দেখিনি, তবে যেন কোন কোন রেল কোম্পানী বরকে কনসেসন ভাড়ায় উচ্চশ্রেণীতে যেতে দিতেন মনে হয়, এখন এ নিয়ম আছে কিনা জানিনে। ধনী লোকের বাড়ীর বর ঢোল, কাঁসী, জগঝম্প, কাড়া-নাগরা, রোসনচৌকি, নহবৎ, গড়ের বাজনা, ইংরাজী বাজনা, আলো-রোসনাই প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে জাঁকিয়ে বেরুতো, বাঁশের ঠাটে চিত্র-বিচিত্র করা কাগজ মোড়া হাতী, ঘোড়া, পাহাড়, ফুলবাগান নানাবিধ সং, ঐরূপ ময়ূরপঙ্খীর উপর কবি-গান করতে করতে নিশান উড়িয়ে চলত। কিন্তু 'সামাজিক' না বিতরণ ক'রে উক্তরূপ জাঁকজমকে শোভাযাত্রা কোন উচ্চ জাতীয় ভদ্রলোক করতেন না, করলে অত্যন্ত নিন্দনীয় হতেন। সামাজিক অর্থে প্রত্যেক স্ব-সমাজস্থ নিমন্ত্রিতের বাড়ী একটা ভাল পিতলের ঘড়া বা অন্য তৈজস, একখানা নূতন থালা বা বেলি, তাতে মিছরির গুলা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও একখানি সাটী পাঠানর ব্যবস্থা। 'ত্রুটি মার্জ্জনা'র সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পাঠানর ব্যবস্থা কলকেতার ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাড়ী থেকে উঠে গেছে। প্রথম প্রথম মেয়েদের বেনামায় বিনা সামাজিকে বাজনা চলল, এখন সে 'নলচে আড়াল'-ও নেই, ২২ ঘোড়ার গাড়ী আর মাদ্রাজী ইংরাজী ১২ দল ব্যাণ্ড দেখেই আমরা বলি, বা-বা কি বিয়ে-ই দিলে! সে কালের বড় বড় ধনীরা বাঁধা রোসনাই ব'লে একটা ব্যবস্থা করতেন, অর্থাৎ বরের বাড়ী থেকে ক'নের বাড়ী পর্য্যন্ত রোশনাই হাতে মুটে দাঁড়িয়ে থাকতো। তখনকার বিয়ে প্রভৃতির রোশনাই ছিল, "খাস গেলাস," কি না অভ্রের তৈরী এক একটি গেলাসের মতন জিনিষ, তার দাঁড়া বাঁধা ঝাড়, তার ভিতর মোমের বা চর্ব্বির বাতির আলো। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর নিকটস্থ চিৎপুর রোডের মহা ধনী ও সৌখীন শ্যাম মল্লিক মহাশয় তাঁর পুত্র নন্দলালের বিবাহের সময় প্রথম গ্যাসের বাঁধা

রোশনাই করেন। গ্যাস তখন কলকেতার নতুন আশ্চর্য জিনিষ, তাই অসম্ভব ভিড় হয়। বড়মানুষের বাড়ীর বর যেতেন চতুর্দ্দোলা, তাঞ্জাম, লাল্চী বা চার ঘোড়ার গাড়ীতে। ক'নেকে আনা হ'ত মহাপায়ায়, সেটা এখন-ও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। গৃহস্থদের বর যেত ভিতরে চামড়া-মোড়া গদিপার্তা চিত্র-বিচিত্র করা বাহারে কপালীটোলার পাল্কীতে অথবা তাঞ্জামে। তাঁদের রোশনাই ছিল, দশ জন হ'তে ২৫ জন পর্য্যন্ত লাল চাপকান-পাগড়ী-পরা হাত-লণ্ঠনধারীর দ্বারা। উভয় প্রকার বরের সঙ্গে আসা-শোটা, ছাতা, পাখা-বাহক যাবার-ও প্রচলন ছিল। এক্ষণে সকলে দুর্গা দুর্গা ব'লে বরের সঙ্গে শুভযাত্রা করুন, আমি ইত্যবসরে বিয়ের আসর-বাসর সাজাবার বন্দোবস্ত করি, এবং ছাদে পাতা হ'ল কিনা, তা দেখি।

২২

ক'নের বাড়ীর চকে সামিয়ানা খাটান, উঠানে সতরঞ্চি বিছান, তার উপর জাজিম পাতা, সামিয়ানার নীচে ঝাড় টাঙ্গান, তাতে বাতি জ্বলছে, উঠানের চারিদিকে দেয়ালের থামে দু'-ডেলে দেয়ালগিরি, তাতে-ও বাতি; জাজিমের এক ধারে মাঝামাঝি একটু উঁচু বিছানার উপর শল্মা-চুমকীর কায-করা মখমলের মছলন্দ পাতা, ঐ মখমলের একটি তাকিয়া ও দু'পাশে দু'টি বালিস, মছলন্দের সামনে দু' ধারে চার-ডেলে বসা বাতিদান। ঐ মছলন্দ বিবাহের বরের রাজাসন। জাজিমের উপর এক পাশে একখানি গালচে পাতা, তাতে বরের বাড়ীর পুরোহিত এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ ব'সে। পাত্রীর পিতার আর্থিক অবস্থাভেদে আসর সাজানর-ও ইতর-বিশেষ আছে। তখন অধ্যাপকরা বিবাহসভায় ব'সে আপনাআপনি একটু শাস্ত্রবিচার করতেন; বিচারের সঙ্গে তর্ক ত আছে-ই, কখন কখন তর্ক-বিভ্রাট-ও দেখা যেত। তখনকার বিবাহে বর কন্যাযাত্রী ছেলে-ছোকরাদের লুচি-মোণ্ডার আনন্দের সঙ্গে একটু ঝঞ্ঝাট-ও ছিল; পরস্পরের মধ্যে লেখাপড়ার কথা এবং ঐ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরের কাটাকাটি চলতে; এই জন্য যে সব ছেলে বরযাত্র বা কন্যাযাত্রে নিমন্ত্রণে যাবে, তারা আগে হ'তে বাড়ী থেকে বিদ্ঘুটে বিদ্ঘুটে সব ঘোরালো ঠকানো কশ্চেন তৈরি ক'রে যেত; কালে লেখাপড়ার প্রশ্ন জ্যেঠামী-ফক্কুড়িতে পরিণত হয়ে এসেছিল, এখন ছেলে বুড়োয় কিছু-ই তফাৎ দেখা যায় না, দু' দলই গম্ভীর, ছেলেদের জরি-সাটিনের পোষাক প'রে নেমন্তন্নে

যাওয়া ত উঠে-ই গেছে, আর বয়স্কদের মধ্যে পরস্পরে আলাপ দাঁড়িয়েছে, হয় নিজের নিজের বিষয়কর্ম্মের কথা নিয়ে, নয় কার প্রস্রাবে কতটা চিনি দেখা দিয়েছে, আর কে কি আহার্য্য ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার জন্য একেবারে ত্যাগ ক'রে রাত্রে একটু জল-সাবু দু' খানা বাতাসাভেজা খান, তাই নিয়ে। বর চুপটি ক'রে টোপরটি সামনে রেখে ব'সে, বিবাহ-কার্য্যের পুরোহিতের পর-ই যাঁর সম্মানস্থান, সেই নরসুন্দর গোলাপী রং-করা কাপড় প'রে বরের কাছে দাঁড়িয়ে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দী, উড়িয়া এই পঞ্চভাষায় সভাস্থল মুখরিত, এমন সময় আসরের এক প্রান্তে এসে দাঁড়াতেন পল্লীর বা গ্রামের ৮।১০ জন প্রৌঢ় ও যুবা। দাঁড়ানোর ভাবটা এমনি যে, আবশ্যক হ'লে তাদের হস্তস্থিত সৌখীন যষ্টি যে কোন ভদ্র বরযাত্রের পৃষ্ঠস্থ করতে তাঁরা কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না; এঁরা এয়েছেন গ্রামভাটী, বারোয়ারী প্রভৃতি বাব[১২] আদায় করতে। তখন বিবাহে কন্যা 'পার' করা কথাটা ছিল না, কন্যাদান করা ছিল; গয়নাগাঁটি পরা আমাদের গাঁয়ের বা পাড়ার মেয়েটি দান পেলে আর আমাদের পাড়ার লোককে এর বিনিময়ে এক দিন আমোদ ক'রে খাওয়া-দাওয়ার জন্য কি এখানকার বারোয়ারী, টোল, পাঠশালা প্রভৃতি হিতকর কার্য্যের জন্য কিছু দিয়ে যাবেন না? এই হচ্ছে কথা। এখনও গ্রামভাটী, স্কুল, পাঠশালা প্রভৃতির বাব[১২] আছে বটে, কিন্তু সেটা ঐ রাত্রে-ই হোক বা তার পরদিনে অনেকটা শান্ত ভাবে-ই মিটে যায়, সেকালে কিন্তু পল্লীগ্রামে কোথা-ও কোথা-ও এর জন্য মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে য়েত; আর বরযাত্রেরা এর শোধ দিতেন ক'নের বাড়ীর বিছানায় আগুন ফেলে পুড়িয়ে, খেতে ব'সে লুচি, মিঠাই, সন্দেশ, ক্ষীর ছাদ ডিঙ্গিয়ে বা উঠানের ধারের নর্দ্দামায় ফেলে নষ্ট ক'রে। গল্পের রাক্ষস-রাক্ষসীদের প্রাণ যেমন ভোমরা-ভোমরীর ভিতর থাকত, ইংরাজী জুতোর আদর হওয়ার পর থেকে নিমন্ত্রণে গেলে বাবুদের প্রাণ-ও আদ্দেকটা জুতোর ভিতর থাকত, আর আদ্দেকটা লুচির গন্ধে মিশিয়ে যেত; সৌখীন ও পেশাদার উভয় সম্প্রদায়ের জুতাচোর তখন-ও ছিল, এখন-ও দেখা যায়, কলকেতায় আজকাল চেয়ারের মজলিস হয়ে 'জুতাতঙ্ক' রোগটা প্রায় চাপা প'ড়ে আছে।

কলকাতায় আজকাল বিবাহের দিন যে সময়ে-ই নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়, সেই সময়ে আহার্য্য প্রস্তুত; বর এসে পৌঁছবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না, এখন বাবুরা অনেকে-ই কর্ম্মস্থানের ফেরতা চোগা-চাপকান বা হ্যাট-কোট পরে-ই

নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে যান, জুতো ফুতো খুলে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে লুচি-তরকারী খাওয়া অনেকেই পছন্দ করেন না ব'লে এখন আমাদের মত রেয়োদের জন্য কুশাসন কলাপাতার বন্দোবস্ত থাকলেও দরজীর কারিগরী-আঁটা স্যুট-পরা বাবুদের জন্য টেবল-চেয়ার ও শানকের বন্দোবস্ত থাকে। তখন কিন্তু বিবাহের আগে ভোজের প্রথা একেবারে-ই ছিল না; অত্যন্ত অধিক রাত্রিতে লগ্ন ধার্য্য হ'লে কন্যাকর্ত্তা করযোড়ে নিবেদন ক'রে অগ্রে পাতা করবার অনুমতি পেতেন। প্রথমে বরযাত্র ব্রাহ্মণ, পরে বরযাত্র ব্রাহ্মণেতর জাতি, তৎপরে কন্যাযাত্র অন্য জাতি, স্থান সঙ্কুলান হ'লে বরযাত্র বসবার পর কন্যাযাত্র বসতে পেতেন; কলকেতায় এ মানের রান্না একেবারে-ই উঠে গেছে। এখন হয়েছে ছোট ছোট ফুলকো লুচি আর শাকভাজা, বেগুনভাজা, ঋতুর অবস্থা বুঝে বিলিতী কুমড়া, বাঁধাকপির তরকারী থেকে আরম্ভ ক'রে মাছের চপ, কাটলেট কালিয়া পর্য্যন্ত, তার উপর দু' তিন রকম চাটনী ও নানাবিধ মিষ্টান্ন। তখন ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটা লুচি, ভাজি দু' একখানা থাকলে-ও থাকতে পারত, বাঁধাকপি বা বিলিতী কুমড়ার তরকারী। বাঁধাকপি তখন আজকালকার মত সুলভ ছিল না, আর তরকারীতে লবণ দেবার প্রথা-ই ছিল না, ভোক্তাকে পাত্রপার্শ্বস্থিত লবণ মেখে নিতে হ'ত; ক্রমে বুটের ডাল ও একটা চাটনী-ও প্রবেশলাভ করেছিল। সঙ্গে কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকী, পাঁপরভাজা, মিষ্টান্নের জন্য দু'খানি সরা, একখানিতে খাজা, গজা, মতিচুর, জিলাপী, পেরাগী, পানতুয়া প্রভৃতি; আর একখানিতে আতা, মনোরঞ্জন, ক্ষীরপুলি, বাদামতক্তি, ছাপা প্রভৃতি সন্দেশ, বরফি, পেঁড়া, গুজিয়া, গোলাপজাম প্রভৃতি ক্ষীরের জিনিষ। সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বরাবর-ই নানাবিধ ফল ছাড়িয়ে দেওয়ার প্রথা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডালভাজা, ঝুরিভাজা প্রভৃতি দেওয়া হয়। কায়স্থ প্রভৃতি অন্য জাতির মধ্যে অনেকে-ও এ প্রথার অনুসরণ করেছেন; এটা পাকা ফলারের ফর্দ্দ দিলুম, অবস্থাবিশেষে অবশ্য ইতর-বিশেষ আছে। সহরে ভোজনের পর পান হাতে দিলে-ই নিমন্ত্রিতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক শেষ, কিন্তু মফঃস্বলে, বিশেষতঃ জমীদার প্রভৃতি ধনবানের বাড়ীর ব্যবস্থা কিছু গুরুতর; নিমন্ত্রিতদিগকে প্রায়-ই বাসা দিতে হয় ৩।৪ দিন হতে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত। তাঁদের সমস্ত দিনরাত্রির ভোজনাদির পরিচর্য্যা করতে হয়, একটি ভৃত্য সঙ্গে একটিমাত্র ভদ্রলোক এলে-ও তাঁর বাসায় অন্ততঃ ৫।৬ জনের আহারোপযোগী সিধা পাঠাতে হয়, ধনবল, জনবল উভয়েরই অধিক প্রয়োজন,

তার উপর আবার কলকেতা থেকে বাই, খেমটা, ইংরাজী বাজনা, সাজসরঞ্জাম নিয়ে যেতে ও খাওয়াদাওয়া পথ-খরচ প্রভৃতিতে ৭।৮ গুণ বেশী খরচ পড়ে; বোধ হয়, এই জন্য অনেক মফঃস্বলের বড়লোক কলকেতায় এসে পুত্র-কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন, এতে মাসিক ৫০ টাকা ভাড়ার বাড়ীতে সপ্তাহের জন্য ৩ শত টাকা দিলে অথবা আড়াই শ' টাকা মণ দরে সন্দেশ কিনলে-ও তাঁদের গায়ে লাগে না, কিন্তু ঐ আওতায় প'ড়ে আমাদের মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা মারা যান।

বিবাহের পর তৃতীয় দিনে কন্যার বাড়ী হ'তে বরের বাড়ী ফুলশয্যার তত্ত্ব যায়। ফুলশয্যার তত্ত্ব তখন-ও একটা দেখবার জিনিষ ছিল, এখন-ও একটা দেখবার জিনিষ। কাপড়-চোপড়, গামছা-তোয়ালে, পেতল-কাঁসার দানের বাসন-কোসন, আরশি-চিরুণী, মিষ্টান্নাদির থালা-চেঙ্গারী প্রভৃতিতে গায়ে হলুদের তত্ত্বর পাল্টা জবাব ত আছে-ই, তার উপর এখন দেখতে পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে চলে এডমণ্ডের বাড়ীর খাট, সেলুডের বাড়ীর আলমারী, ল্যাজারাসের বাড়ীর চেয়ার-কৌচ, অভাবপক্ষে বৌবাজার ত আছে-ই। এর উপর নগদে যদি না কুলিয়ে থাকে ত রূপোর ঘড়া, গাড়ু, গেলাস, গামলা, Etc. চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি সব-ই বাজারে তৈরী। তখন বাড়ীর মেয়েরা এই ফুলশয্যার তত্ত্বে তাঁদের নিজের হাতের কারিগরী দেখাবার বিশেষ অবসর পেতেন। তাঁরা নিজের হাতে দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীর ক'রে ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের মাছ প্রভৃতি তৈরী করতেন, আর ঐ ক্ষীরের সঙ্গে ঝুনো নারিকেলের কুরো মিশিয়ে গড়তেন নানা আকারের চন্দ্রপুলি, লীচু, জামরুল, গোলাপজাম, আম প্রভৃতি বহুবিধ ফল, নারিকেল থেকে চিঁড়ে তৈরী করতেন, ভিজানো মটরের মালা গেঁথে দিতেন, মাখনের মন্দির তৈরী করতেন, আক. শশা, পেঁপে, আদা প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য ক'রে কেটে সাজিয়ে দিতেন, অতি পাতলা চাকা চাকা ক'রে সুপারী কেটে দিতেন, সুপারিকে ফুলের মত ক'রে গাছ গ'ড়ে দিতেন, আর সবার চেয়ে কারিগরী ছিল খয়েরের কাযে; খয়েরের ছোট ছাঁচ, বড় ছাঁচ, খয়েরের তাবিজ, বাউটী, খয়েরের চিক, ঝুমকো, চন্দ্রহার, খয়েরের বাগান, খয়েরের তাজমহল পর্য্যন্ত। এখন ফুলশয্যা যেতে প্রায় রাত হয়, তখন বেলাবেলি যেত, আর পথিপার্শ্বস্থ ভদ্রলোকেরা মাঝে মাঝে ঐ তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে আপনারা দেখতেন, বাড়ীর মেয়েদের দেখাতেন। এখন-ও যে ফুল-শয্যার তত্ত্বে মেয়েদের কারিগরী দেখা যায় না, তা নয়, তবে প্রায় সেগুলি

সব-ই বার্লিন পশমের কায।

ফুলশয্যার পর বৌ-ভাত। বৌ-ভাত একটি বড় সামাজিক সমস্যা। ঐ দিন মাত্র নিজের কুটুম্ব-স্বজন ও স্বজাতির নিমন্ত্রণ। নব-বধূ প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের সম্মুখস্থ পাত্রে স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করবেন, নিমন্ত্রিতরা সানন্দে সেই অন্ন গ্রহণ করলে তবে বধূ গোত্রগত হলেন সাব্যস্ত হ'ত। দুষ্ট হিংসুক লোক সময় সময় বৌ-ভাতের দিন কখন কখন আপনাদের গায়ের ঝাল মেটাবার বিশেষ অবসর পেতেন। 'দেবী চৌধুরানী'র প্রথমে-ই বঙ্কিমবাবু এই বৌ-ভাত বিভ্রাটের অবতারণা করেছেন, সুতরাং আর বিস্তারিত করলুম না।

'ইন্দিরা'য় বঙ্কিমবাবু একটা বাসরের ছবি দিয়েছেন, বলতে ভয় হয়, তবে আমার চেয়ে তিনি অনেক দেখেছেন-ও বেশী, প্রতিভা-ও তাঁর অতুলনীয়, কিন্তু মোগল সাজাটাজাগুলো যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। তবে বাসরের শালী-শালাজের রসিকতাটা যে বদরসিকতায় ও সময় সময় উৎপাতে-ও গড়িয়ে গেছল, সে কথা সত্য, এখন সেটা বেশ সুধরে গেছে। আর একটা উৎপাত ছিল, নতুন জামাইয়ের শ্বশুরবাড়ী আসার; প্রথমে বোধ হয় যা ছিল, পরিহাসচ্ছলে জামাইয়ের ভোজ্যে চারু-শিল্পকলার প্রদর্শন, সেইটা বীভৎস ও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জামাইয়ের পিঁড়ের তলায় চার কোণে চারটি সুপারী দেওয়া, জামাই বাবাজী যেমন পিঁড়েয় পা-টি দিয়েছেন, অমনি আছাড় খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়েছেন, তখন চূণ-হলুদের ব্যবস্থা; শ্বেত পাথরের গেলাস তুলে জামাই মিছরীর জল খাবেন, মুখে দিয়ে দেখেন খড়-ভিজানো জল, তারপর কচুর কেশুর, পিটুলীর সন্দেশ, বিলিতী কুমড়োর পেঁপে, আর-ও কত কি যে, তা কি মনে আছে! এক এক জন তুলো বা শোলা দিয়ে এমন ভাত তৈরী করতেন, যেমন জামাইবাবু গবাস মাখতে যাবেন, অমনি শালীর হাতের পাখার বাতাস, সঙ্গে সঙ্গে অন্নরাশি উড্ডীয়মান; জলের গ্লাসের ঢাকা খুললেন, অমনি এক রাশ আরশুলো উড়ে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। এগুলো উঠে গিয়েছে, ভাল হয়েছে; তবে হালের শালীরা যদি নাতি-ভায়াদের জন্য মার্জ্জিত রুচিগত ব্যঙ্গ-ব্যঞ্জনাদির রচনা আবিষ্কার করতে পারেন, তা হ'লে বোধ হয়, ঠাকুরদাদাদের-ও আবার ফিরে—যাক্, সে দুঃখের কথায় আর কায নেই!

পরশ্ব আমার একটি নিমন্ত্রণ আছে, কর্ম্মকর্ত্তা আমার স্বজাতীয় নহেন,

কার্য্যতঃ সেটি বৌ-ভাত হ'লে-ও নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা "প্রীতি-ভোজন"; সুতরাং তাঁর-ও খাওয়াতে আপত্তি নেই, আমার-ও গিয়ে লুচি খেতে আপত্তি নেই। আচ্ছা, প্রীতি-ভোজনের যায়গায় বৌ-ভাতের পরিবর্ত্তে "বৌ-লুচি" লিখলে হয় না? কথাটায় একটু কবিত্ব আছে যেন।

২৩

ছেলেবেলার বিয়ের কথা বলতে বলতে তার চেয়ে আরও ছেলেবেলার কথা কেন মনে আসছে? যে ছেলেবেলাটা ঠেলে ফেলে দিয়ে ঝাঁ ক'রে বড় হয়ে উঠবার জন্য মনে মনে একদিন ঠাকুরদের পুজো মেনেছি, আজকালকার যুবতীরা এক ঢাল কালো চুলের জন্য যত না লালায়িত হন, তার চেয়ে-ও লালায়িত হয়েছি উপর ঠোঁটে গোটা কয়েক রোমোদ্গমের জন্য, রাতারাতি কেশবৃদ্ধির তৈল তখন বাজারে না পাওয়া যাওয়ায় ১৬।১৭ বৎসর বয়স থেকেই লুকিয়ে নাপিতের দ্বারা মসৃণ পাতলা চামড়ার উপর কতই না ক্ষুর বুলিয়ে নিয়েছি, সেই ছেলে-বেলাটাকে আজ এক দিনের জন্য ফিরিয়ে পাবার তরে প্রাণটার ভিতর মাঝে মাঝে কেন হাহাকার ক'রে উঠে? মা! এক দিনের জন্য একবার কি তুমি ফিরে আসতে পার না, আবার আমায় ৫ বছরের শিশুটি ক'রে কোলে বসিয়ে কাঁচ কানে শোনাতে পার না যে, "সেপাই ক্ষেপেছে, রাস্তার ধারে যাস্নি বাবা, রাঙামুখো গোরা ধ'রে নিয়ে যাবে!" বছর তিনেক পরে বাবার কাছে একখানা নতুন বই পড়েছিলুম, তার মলাটের উপরের হরপগুলো বানান ক'রে ক'রে পড়েছিলুম বটে—INDIAN MUTINY," কিন্তু মিউটিনির সময় মিউ-টিনিকে জানতুম 'সেপাই ক্ষেপা' ব'লেই। পশ্চিমের সেপাইরা সব ক্ষেপে উঠেছে, সাহেবদের সব ধ'রে ধ'রে মেরে ফেলছে, মেমরা ছেলে কোলে ক'রে পালাচ্ছে, এই সবই শুনতুম, কিন্তু সেপাই কাকে বলে, তা কলকেতায় তখন দেখিনি, রাস্তায় বেড়াতে নিয়ে বেরোবার বন্দোবস্ত ছিল না, তাই স' বাজারের রাজাদের দরোজায় বন্দুক ঘাড়ে ক'রে যারা পাহারা দেয়, তা-ও দেখিনি। মিউটিনি কলকাতার সাধারণ লোককে বিশেষ কিছু ব্যতিব্যস্ত করে নি; এখানকার গৃহস্থ লোকের—বড়লোকের-ও মনে একটা আতঙ্ক উঠেছিল মিউটিনির পর। সেপাই ঠাণ্ডা ক'রে গোরারা যখন কলকেতায় এসে পদার্পণ করলেন, তখন অনেক বাড়ীর লোকের-ই আর সদর দরোজা খুলে রাখবার সাহস হ'ল না। কেল্লায়, দমদমায়, চাণকে, চুঁচুড়ার বারিকে বারিকে গোরা

রেখে-ও সব গোরার স্থান সংকুলান হয় না, তাই অনেক বড় বড় স্কুল-কলেজ বন্ধ ক'রে সেই সব যায়গায় গোরার আড্ডা হয়ে গেল। শাসনকর্ত্তাদের মাথার ঠিক তখন একেবারে-ই ছিল না, সেপাই ঠাণ্ডাকরা গোরাদের ঠাণ্ডা করে কে ?. বুকের শ্লেষ্মা নেমে গেছে বটে, কিন্তু বেলেস্তারার জ্বালায় অস্থির। রাস্তার ত কথা-ই নেই, ভদ্র লোকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ঢুকে গোরারা উৎপাত করত ; দোকানদারের দোকান সামলান ভার, মোড়ের শুঁড়ীরা ঘুসি, লাথির দায় এড়ালে বাঁচে, তা আবার মদের দাম চাইবে কি ! হাইলান্ডার বা ন্যাংটা গোরার সেই প্রথম আমদানী, আর এক নতুন আমদানী সেই সময় কলকেতায় হয়েছিল পাঞ্জাবী শিখ পল্টন ; যে পাঞ্জাবীরা এখন আমাদের ভ্রাতা, তখন কলকেতাবাসীর কাছে এক প্রকার গোরার মত-ই তারা অপরিচিত, তবে তাদের দ্বারা কোন উৎপাতের কথা গল্প হ'তে শুনি নি।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর কলকেতায় এক নতুন কাণ্ড হয়ে গেল। যে স্যার সিসিল বীডনের ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধীয় সুখ্যাতি যমালয় পর্য্যন্ত ঢি-ঢি হয়ে গিয়েছিল, যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের ব্রহ্মক্ষর নাম অক্ষয়-অমর করবার জন্য তখনকার মিউনিসিপ্যাল বাহাদুররা সদ্যঃ প্রস্তুত একটি নতুন রাস্তাকে "বীডন ষ্ট্রীট" আখ্যা দিয়ে গিয়েছেন, সেই বীডন সাহেব ঐ ৫৮র ১লা নবেম্বর গবর্মেণ্ট হাউসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি রাজঘোষণা পাঠ করেন, যাতে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রজা জানতে পারে যে, আজ থেকে এই ভারত সাম্রাজ্যে আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য থাকবে না, স্বয়ং ভারতেশ্বরী মহামহিমান্বিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই রাজ্যের ভার স্বীয় রাজহস্তে গ্রহণ করলেন।

শিক্ষিত ভারতবাসী আজ পর্য্যন্ত এই প্রোক্লামেশনের গর্ব্বে গর্ব্বিত ; বলেন, এই প্রোক্লামেশন তাঁদের ম্যাগনাকার্টা, এই প্রোক্লামেশনের বলেই রাজচক্ষুতে ইংরাজ ও আমরা সমভাবে প্রজা।

যদি কথা পড়লো ত প্রোক্লামেশনটা নিয়ে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক না। ঘোষণাটি ইংলণ্ডের রাজ-রাজেশ্বরীর মুখোচ্চারিত এবং ভারতবর্ষের রাজা-প্রজার নিকট প্রচারিত, ইংলণ্ডের রাজা ক্রিয়াতীত গুণাতীত সাংখ্যের পুরুষস্বরূপ, ইংলণ্ডের প্রজা শক্তিসম্পন্না প্রকৃতি। এই প্রকৃতির ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত একটি মন্ত্রিসঙ্ঘে ; এঁরা রেকর্ড প্রস্তুত ক'রে ডিস্কখানি গ্রামোফোনের ভিতর দেন, আর

লোক সেই গ্রামোফোনের হর্ণ-নিঃসৃত ধ্বনি শুনে পুলকিত হন। ভারতবর্ষের রাজা-প্রজার মধ্যে এক জন-ও ইংরাজ নেই। নদের লোক ময়মনসিংহে গিয়ে দোকান খুললে যখন ময়মনসিংহবাসী তাঁকে ময়মনসিংহের লোক বলে না বা বীরভূম থেকে বদলী-হওয়া ডেপুটী বাবুকে-ও ময়মনসিংহের লোক ব'লে স্বীকার করে না তখন কোন্ ন্যায়শাস্ত্রমতে আমরা ইংরাজ বণিক্ বা কর্ম্মচারীকে ভারতবর্ষের প্রজা অর্থাৎ পিপল অফ ইণ্ডিয়া মধ্যে গণ্য করতে পারি? সুতরাং ধ'রে নিতে হবে যে, প্রোক্লামেশনটি শোনাচ্চেন ইংলণ্ডের সমস্ত অধিবাসী আর শুনছি আমরা হিমালয় থেকে কুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের অচলা অবলা দেশী প্রজা।

তার পর প্রোক্লামেশন প্রথমেই বলছেন—"আমরা তোমাদের ধর্ম্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করবো না," অথচ যিনি বলছেন, তিনি ইংলণ্ডে "Queen, Defender of the Faith" অর্থাৎ মহারাণী, ধর্ম্মরক্ষাকারিণী; কিন্তু তাঁকে দিয়ে বলানো হ'ল না যে, তিনি ভারতবর্ষের-ও ধর্ম্মরক্ষাকারিণী; রাজশক্তি প্রকাশ করলে যে, আমরা তোমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করবো না, অমনই আমরা আহ্লাদে গ'লে গেলাম; ঠিক লালবাজারের ছোট হাজতঘর থেকে প্রেসিডেন্সী জেলের প্রকাণ্ড উঠানে দাঁড়িয়ে বল্লুম, 'দুর্গা-দুর্গা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম"। আহ্লাদের যে একটু কারণ ছিল না, তা নয়; বৃটিশাধিকারের পূর্ব্বে মুসলমান আধিপত্যের সময় উক্ত জাতীয় কোন কোন শাসনকর্ত্তা হিন্দুদিগের ধর্ম্মকার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করতেন, মন্দির-দেবালয়াদি ভাংগতেন, জোর ক'রে-ও যে মুসলমান করেন নি, এমন নয়; কিন্তু ঐ অপকারের ভিতর-ও একটু উপকার লুকানো ছিল, আগুনে কাঠ ঢালতে হবে, তা হ'লে বেশী জ্বলবে, আর না হয় মাঝে মাঝে খোঁচা দিতে হবে, তাতে-ও আগুনটা কতক জেগে থাকবে, কিন্তু কাঠ-ও নেই খোঁচা-ও নেই যে আগুনে, সে আগুন ছাই প'ড়ে যায়, মুসলমানদের খোঁচায় অসাড় হিন্দুদের মনে-ও একটু সাড়া পড়তো; তা ছাড়া তাঁরা মন্দিরাদি ভাংগলে হয় সেইখানে-ই বা অন্যত্র সেই মাল-মসলা পাতর পেতল্ ইট-কাঠ দিয়ে তাঁদের দেবালয় বা মসজিদ নির্ম্মাণ করতেন; প্রকৃত হিন্দুর মনে তাতে-ও কতকটা শান্তি আনত; কেন না, যে নামে-ই হোক, পরমেশ্বরকে ডাকা নিয়ে-ই হিন্দুর প্রাণের প্রয়োজন। বাদশাজাদীর সমাধি ভেংগে কাছারীঘর বা শিবমন্দিরের সদ্‌গতি ক'রে পাটের গাড়ী যাবার জন্য বীডন ষ্ট্রীট তৈরী করার বিদ্যা মুসলমানদের ছিল না; আর তাঁদের বুদ্ধিটা-ও অনেক কম ছিল; মন্দির ভাংগার জন্য মজুরী বাবদ তাঁরা

গাঁটের পয়সা অনেক খরচ করেছেন ; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ইংরাজ আমাদের এমন বিদ্যা দিয়েছেন যে, আমরা দুর্গোৎসবের দালান ভেঙে বিলিয়ার্ড-রুম তৈরী কচ্ছি আর শালগ্রাম নিয়ে হয় 'পেপার ওয়েটে'র কায চালাচ্ছি, নয় বাগবাজারের খালে ডুবিয়ে দিয়ে আসছি।

তার পর প্রোক্লামেশনে এক সর্ব্বানন্দদায়ী সূত্র রাজমুখোচ্চারিত হয়ে ইংরাজ জাতির দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে যে, "আমরা তোমাদের জাতি, ধর্ম্ম-ও বর্ণভেদের দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে কেবল গুণপরিমাণের তারতম্যে তোমাদিগকে চাকরী দিব।" বঙ্গীয় টীকাকার এই সূত্রের ভাষ্য ক'রে ফেল্লেন যে, "কুচ পরোয়া নেই, এখন থেকে কালো চামড়ায় শাদা চামড়ায়, হিন্দু-মুসলমান-খিষ্টানে ভেদ উঠে গেল, এখন সাহেবরা-ও যা, আমরা-ও তা ; লেগে যা গুরো গুণ-গুদাম বোঝাই করতে!"

প্রথমেই ত ভুল করেছি যে, প্রোক্লামেশনে সাহেব বক্তা, আর আমরা শ্রোতা, তার উপর সাদা কালোর মধ্যে বর্ণভেদের কথা শুনে শুনে আমাদের নিজেদের ভিতর যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আছে, এ কথা ভুলে মেরে দিয়েছিলুম, তাই পেছনকার পাতা আর উল্টে না দেখে ঠিক ক'রে ফেললুম যে, সাহেব ও আমাদের ভিতর আজ থেকে আর কোন ভেদ নাই। গুণ সর্ব্বদাই সত্ব, রজঃ, তম ত্রিশাখাবিশিষ্ট। ইংরাজী সত্বগুণ হচ্ছে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বনে রাজভক্তিবশে Your most obedient & humble servant, ভবদীয় অতি বশম্বদ ও বিনীত ভৃত্য লেখার শক্তি। এই সত্বগুণটা ব্যাখ্যা আলেখ্য দ্বারা আর-ও পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করি। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ পঞ্চশ্রী রাধাকিশোর মাণিক্য মহাশয়ের সিংহাসনে অভিষেকোৎসবের সময় আমরা একবার আগরতলায় গিয়েছিলুম; আমাদের পক্ষে এক নতুন আশ্চর্য্য দৃশ্য সেখানে চক্ষুতে দেখেছিলুম। এক দিন অপরাহ্নে দেখি যে, জন ৫।৬ কনেষ্টবলকে জন ২০।২৫ বামুন ধ'রে রাস্তা দিয়ে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানলেম, রাজবাড়ীতে অধ্যাপকাদি সুব্রাহ্মণের বিদায় হচ্ছিল, আর নিষেধ সত্বেও পৈতাধারী ভিখারী বামুনরা-ও প্রাসাদমধ্যে প্রবেশের জন্য উৎপাত কচ্ছিল, কনেষ্টবলরা বাধা দিতে গিয়ে কারুর গায়ে বোধ হয় হাত তুলেছে, সেই মহা-অপরাধের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে নালিশ করবার জন্য বামুনমারা কনেষ্টবলদের তারা ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরাজ্যে সত্বগুণের বশে পৈতার এই প্রভাব। ঐরূপ সত্বগুণের প্রভাব

ইংরাজ রাজত্বে সবাই অনুভব করেছেন, তবু একটা নিজের ভোগ করা ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখবার লোভ ত্যাগ করতে পারছিনে।

বাংগালা নাটকের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হচ্ছেন পুলিস। নাট্যশালার কলা ছাড়াতে পুলিস-ই পুরোহিত। নাট্যকলাকে কলাতলায়-ও দাঁড় করাতে পারেন বা কলা দেখিয়ে বিদেয়-ও করতে পারেন একমাত্র বড় পাহারাওয়ালারা। আমরা যেমন মনে করি, উড়ে মাত্রেই মালী, বাগান সাজাতে, গাছ বসাতে, কলম বাঁধতে উড়ে মাত্রেই মজবুত, তেমন-ই নিজেদের বাংগালা না জানা থাকায় ইংরাজ-রাজকর্ম্ম-চারীরা মনে করেন যে, বাংগালীমাত্রেই বিদ্যাসাগর। সুতরাং মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় কবিগণের কাব্যের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে হেডকনেষ্টবল বা সাব-ইনস্পেক্টারদের হাতে। এঁদের মধ্যে যে কেউ বাংগালা লেখাপড়া জানেন না, এ কথা আমি বলি না, ইংরাজী, বাংগালা বা সংস্কৃততে এম, এ পাশ করলেই যে বিদ্বান্‌পুরুষ নাটকের রস গ্রহণ করতে, নাট্যকাব্যান্তর্গত শ্লেষ-বিদ্রূপাদির মর্ম্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হন, এ কথা স্বীকার করিনে। যাক্, বংগ-ভংগ আন্দোলনের জের যখন মেটেনি, সেই সময় রাজপুরুষরা ভারি ভারি জোয়ান পুরুষের বড় কিছু না করতে পেরে পঞ্চা-নন্দ ঠাকুরের দোহাই দিয়ে আঁতুড়ে কচিছেলে বাংগালা নাটকের ঘাড় ভাংগতে সুরু করেন। অনেক জনপ্রিয় ভাল ভাল নাটকের অভিনয়-ই সে সময় পুলিস বন্ধ ক'রে দেন। 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় বন্ধেব নোটীশ পেয়ে আমি তখনকার পুলিস কমিশনারের হুজুরে হাজির হয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালুম। বললুম, ধর্ম্মাবতার! আমি বঙ্কিমবাবুর বই থেকে নাটকখানি লিখেছি, আর 'ষ্টার থিয়েটারে'র ম্যানেজারও আমি; একবার এই চন্দ্রশেখরের কথা উঠায় আপনি-ই ত বলেছিলেন, 'চন্দ্রশেখরে কোন দোষ নেই, ও চলতে পারে'; তবে কার আর্জ্জিতে আজ আপনার এই মর্জ্জি বদল হ'ল?" কমিশনার দণ্ডাস সাহেব একেবারে মণ্ডার মত মিষ্টি না হ'লে-ও নেহাৎ গুণ্ডার জাতি ষণ্ডা ষাঁড় ছিলেন না, আধ অভিবাদন আধ আদেশভাবে একটু ঘাড়টা নেড়ে আমাকে বসতে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, "এ যে আমাকে বসতে দিলে গো, তবে তামাক-টামাক-ও খাওয়াবে না কি?" তাই সাহস পেয়ে বলে ফেললুম, "হে কলিকাতাধিপ! শুনেছি, আপনি বাংগালা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী, পরীক্ষায় দিগ্-বিজয়ী হয়ে রজতরাশি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেছিলেন—তা—এই—আম-

তা — আমতা-।” সাহেবের চোখ দুটো একটু মুচকে হাসলে বটে, কিন্তু মুখে বল্লেন, Oh the examination day is long past! অর্থাৎ একজামীন দিয়েছি, প্রাইজ পেয়েছি, সে চুকেবুকে গেছে, ভুলে মেরে দিয়েছি। আমি তবু বল্লুম, “প'ড়ে বা পাড়িয়ে দেখুন, এই চন্দ্রশেখরখানিতে কোন যায়গায় কোনরূপ ইংরাজ-নিন্দা নেই; বরং এই বইয়ে বঙ্কিমবাবু ন্যায্য বিচার যে ইংরাজের মজ্জাগত সংস্কার, তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বঙ্কিমবাবুর মূল বইয়ে আছে, আমি-ও নাটকখানিতে মাঝে মাঝে ইংরাজী কথা দিয়ে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেছি যে, ফষ্টার শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হ'লেও তার প্রতি কোন অত্যাচার করেনি, শৈবলিনী গোপনে পত্র লিখে তাকে ফষ্টারের দ্বারা হরণ করায়। এই সত্য সাক্ষ্যের উপর-ও কি শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর, কি তার আত্মীয় প্রতাপ, এমন কি, নিজে নবাব মীরকাশিম পর্য্যন্ত ফষ্টারের বিরুদ্ধে ইংরাজ কুঠীয়ালদের নিকটে কেউ কোন অভিযোগ উপস্থিত করেন নি, তবু আঘাতজনিত পীড়া হ'তে মুক্তি-লাভের পর তার উপরওয়ালারা একতরফা বিচার ক'রে তাকে আপনাদের কুঠী হ'তে বিতাড়িত ক'রে দেন। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বঙ্গদেশে এক জন ইংরাজের এক জন নিঃসহায় নিঃসম্বল ইংরাজের প্রতি এ বড় সোজা শাস্তি নয়। শেষ দৃশ্যে ফষ্টার নবাবের সমক্ষে ইংরাজের সত্যপ্রিয়তা, চরিত্রবল, নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন ক'রে আপনার অপরাধ স্বীকার করে, তবে সাহেব, এ নাটকে দোষ কোথায়, আমায় বলুন ?”

সাহেব বল্লেন, “দেখ বোস, আমি কি করব ? এক জন সামান্য ইংরাজ-ও যে নিন্দার কায করতে পারে, এ কথাটা তোমার দর্শকদের কাছে প্রচার কল্লে সাধারণের মনে রাজভক্তির হ্রাস হ'তে পারে।” আমি মনে মনে বল্লুম যে, “সাহেব, তোমাদের কি বিশ্বাস যে, আমরা মনে করি, ইংলণ্ডের জেলখানায় যে হাজার হাজার কয়েদী আছে, তারা কি হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী বা পঞ্জাবী ? আর সাহেব, তোমরা বাঙ্গালা পড় না পড়, আমরা রকম রকম ইংরাজী বই কাগজ যে ঢের প'ড়ে থাকি, মায় নিউগেট ক্যালেণ্ডার পর্য্যন্ত।”

দুঃখের বিষয়, চন্দ্রশেখর বন্ধের পর লর্ড কারমাইকেল বাঙ্গালা শিখেছিলেন, আর এ দেশ থেকে বিদায় হবার পূর্ব্বদিনের অপরাহ্নে মাত্র তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি যা বুঝেছিলুম, ঐ পরিচয়টা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হ'লে আমি তাঁকে নাটকখানি বুঝিয়ে দেবার সময় পেতুম,

তাতে তিনি কি উত্তর দিতেন, তা-ও বুঝতে পারতুম।

এই গল্পটি বিদ্যাপক্ষে ; অস্যার্থ কালীপক্ষে :—এই ব্যাপারটি আমার নিজের ভোগা নহে, নাট্যকবিযশঃপ্রয়াসী কোন নবীন লেখকের কাছে শোনা। তিনি একখানি নাটক লিখে পুলিস আফিসে পাঠান, তাতে এক যায়গায় একটি কথা ছিল, "বাঙ্গালী এত মহান্, এত উদার !" একটি বাঙ্গালী পুলিস কর্ম্মচারী ঐ কথা-কয়টি কেটে দিয়ে নাটকখানিকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ করেন। করুন, তাতে দোষ নেই, কিন্তু দীনভাব সাধনা করতে করতে বাঙ্গালী জাতির ভক্তিরসের পাকটা কেমন দাঁড়িয়েছে, তা এ থেকে বোঝা যায় ;—যেমন দীনভাবের অধিকতর প্রাবল্যে কোন কোন সাত্ত্বিক বৈষ্ণব নিজের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" পর্য্যন্ত লেখা পাতক মনে ক'রে শ্রীহীন গৌরদাস বাবাজী লেখেন, তেমন-ই এই ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর ন্যায় অনেক বাবু সাহেবের সম্মুখে আপনাকে মানুষ ব'লে পরিচয় দিলে প্রভুর অমর্য্যাদা করা হয় মনে করে।

প্রোক্লামেশনের সত্ত্বগুণ কার্য্যে প্রয়োগ সম্বন্ধে নমুনা দেওয়া গেল ; এইবার রজোগুণ দেখা যাক্। রজের অধিষ্ঠান রজতে ; কিন্তু হস্তস্থিত ধাতুজ রজত কাগজে যিনি পরিণত করতে পারেন, তিনি-ই মনুষ্যপদবাচ্য, নচেৎ যারা ঐ রজত কাঞ্চনে পরিণত ক'রে সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখে বা মাতার নথে, স্ত্রীর সাতনরে বা কন্যার নেক্‌লেসে পরিণত ক'বে অপব্যয় করে, তারা বোকা, অসভ্য, মনুষ্যত্বহীন।

এইবার তম। প্রোক্লামেশন বলেছে যে, তোমাদের মধ্যে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্মভেদ আমাদের চক্ষুতে গ্রাহ্য নহে ; তোমরা প্রজার জাতি, আমাদের চক্ষুতে তোমরা সকলে-ই শূদ্র ; শূদ্রের অধিকার, শূদ্রের গৌরব দাসত্বে। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তাঁহার ভাণ্ডার, তাঁহার পাকশালা রক্ষা কর্‌বার জন্য অবশ্য ব্রাহ্মণ-ই নিযুক্ত থাক্‌বেন, কিন্তু গুণানুসারে অর্থাৎ ইংরাজী বুলি বল্‌তে যে যতটা লায়েক, তার তারতম্য বুঝে কলতলায় কাপড় কাচা থেকে বৈঠকখানার বারান্দায় ব সে প্রভুর অঙ্গস্পর্শ ক'রে পায়ে তেল মাখান পর্য্যন্ত যে সব সম্মানের চাকরী আছে, তাই তোমাদের ভিতর ভাগ ক'রে দেব ; যেমন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব গৌরীনাথ বেদান্তবাগীশ বা ত্রিলোচন ন্যায়রত্ন যদি A B C D না জানেন, তা হ'লে তিনি চাকরী চাইলে বড় জোর পাখাটানার ভার পেতে পারেন আর কলুকুলোজ্জ্বল স্বরূপ সাধু খাঁর সেজ ছেলে যদি CAT=cat. DOG=dog. খুব জবরদস্ত

জোরে বলতে পারেন, তা হ'লে তিনি মুন্সেফের আসনে ব'সে ধর্ম্মাবতার হ'তে পারবেন। আমি কোন জাতের-ই একচেটিয়া অধিকার মানিনে, গুণের দ্বারা-ই জাতিবিভাগের পক্ষপাতী, সদ্‌গোপবংশোদ্ভব পূজনীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের চরণের ধূলি লয়ে প্রণাম করতাম; আমার নালিশ এই যে, কি রাজদ্বারে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি বিদ্যা-পীঠে আমার নিজের ভাষা, নিজের বিদ্যা, নিজের শাস্ত্রকে কোণঠাসা ক'রে ইংরাজী তার সম্পদের গুণে নয়, কেবল প্রভুর ভাষা ব'লে—একাধিপত্য করবে, এইটি-ই যেন প্রোক্লামেশনের ভাব। পরছি গায়ে একটা প্রসাদী মাগনা কোর্ত্তা, বলছি মুখে ম্যাগনাকার্টা।

যা হোক্, বেশ মনে পড়ে, প্রোক্লামেশনের দিন সন্ধ্যার পর কলকেতায় খুব আমোদ হয়েছিল। এই সহরে সেই প্রথম পাবলিক ইলুমিনেশন অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান, জৈন প্রভৃতি সকল অধিবাসীর একদিনে দেওয়ালী। তখন কলকেতা গ্যাস দেখেনি, কেরোসিন দেখেনি, ইলেক্‌ট্রিকের টিকীটি পর্য্যন্ত তখন য়ুরোপের-ও নজরে পড়েনি; সরষের তেল তখন কলকেতাতে-ও টাকায় বোধ হয় ৫ সেরের উপর, দেদার জ্বালাও, তার উপর রেড়ি আছে, নারকেল-ও আছে। এক টাকা পাঁচ সিকে শ' কাচের লম্প, সেইটি ত তখন আলো দেবার বড়মানষি, কিন্তু মাটীর প্রদীপ বাড়ীর কার্ণিসে বা বারান্দায় পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে যা বাহার হয়, তা আর কিছুতেই হয় না, এ কথা সাহেবরা-ও স্বীকার করেন। লাটের প্রাসাদ, বড় মানুষের বারান্দা, দুঃখীর কুটীরের চালা সব-ই আলোক-মালায় শোভিত হয়েছিল। মনে আছে, আমাদের বাড়ীব সামনে ছাদের আলসেতে কাকা কোথা থেকে একখানা টানাপাখার মত জিনিষ এনে বসিয়ে দেন, তার নাম ট্রান্সপেরেন্সি, মাঝখানে তার কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি আঁকা, এক ধারে বন্দুক ঘাড়ে দেশী সিপাইয়ের ছবি আঁকা, আর এক ধারে ঐ রকম বন্দুক ঘাড়ে গোরা সিপাইয়ের ছবি আঁকা। প্রথমে এক সারি তেল-পোরা শরার উপর এক একটি কাপড়ের সরষের পুঁটুলি ক'রে জ্বালান, সামনের দিক্ থেকে দেখলে ভারি বাহার। সিপাই ব'লে বল্লুম বটে, কিন্তু মিউটিনির অবসানের পর সেই দিন থেকে সিপাই কথাটি সরকারী দপ্তর থেকে অন্তর্হিত হ'ল। আমরা প্রোক্লামেশনের ভেল্কি দেখলাম বটে, কিন্তু গবর্মেণ্টের বাজার সরকারকে বিলিতী বাজীওয়ালারা-ও ঐ দিন একটা বেড়ে মজার ভেল্কি দেখিয়েছিল; রাত্রে গড়ের মাঠে বাজী পোড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু বাজীওয়ালাদের হাতে পড়েছিল টকা, আর

যাঁরা বাজী দেখাবেন, তাঁদের হাতে পড়েছিল ফক্কা! কেন না, কোন বাজীতে আগুন ধরল-ই না, আর কোন বাজী এমনি জ্ব'লে উঠল, লোক দেখলে, কাপড় কি ন্যাকড়া জ্ব'লে উঠল মাত্র।

লর্ড ক্যানিং ছিলেন গবর্ণর জেনারেল, সেই দিন থেকে তার সঙ্গে হলেন ভাইসরয়। এই ক্যানিং ছিলেন বড় মহাশয় লোক। ইংরাজের অধীন আমরা কোম্পানীর আমলে-ও ছিলুম, কুইনের আমলে-ও হলুম, তাঁর পৌত্রের আমলে-ও আছি, আর-ও ক'পুরুষ দেখবার সৌভাগ্য আছে জানিনি, কিন্তু ক্যানিং এর মত লাট এ দেশে আর দু' দশ জন এলে আমাদের ললাটে কণ্টকমুকুটের গায়ে গায়ে দু' চারটে গোলাপের কুঁড়ি যে দেখা দিত, তাতে আর সন্দেহ নেই। তখনকার অনেক সাহেব ক্যানিং এর উপর বড় চ'টে গিয়েছিলেন, বাতশ্লেষ্মা বিকারে শ্লেষের ছলে তাঁর নাম দিয়েছিলেন "ক্লেমেন্সি ক্যানিং"; ক্যানিং-এর অনেক অপরাধ; প্রধান অপরাধ কলকেতায় তিনি মার্শাল আইন জারি করেননি; অথচ বাঙ্গালীর সঙ্গে মিউটিনির কোন রকম সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল না বলুলুম কেন, বরং অনেক বিপদগ্রস্ত ইংরাজ পরিবারকে পশ্চিম প্রবাসী বাঙ্গালীরা বিস্তর সাহায্য করেছিলেন, আপনাদের অন্দরে পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন; কাশীর প্যারী বাঁড়ুয্যে মহাশয় ঘোড়ার চ'ড়ে তলোয়ার ধ'রে 'ফাইটিং মুন্সেফ' নাম পেয়েছিলেন। সিপাহীরা পরাস্ত হবার পর প্রতিহিংসাপরায়ণ গোরারা অন্ধ হয়ে অত্যাচার আরম্ভ করে। তখন-ও এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে যে সব বাড়ীর বাইরের দেয়ালে কয়লা দিয়ে 'ক্যালকাটা বাবুজ' লেখা ছিল, সে সব বাড়ী তাদের চক্ষুতে-ও পবিত্র-বোধে উৎপাত হ'তে রক্ষা পেয়েছিল। এখনকার সাহেবরা যদি তাঁদের পিতামহকে জিজ্ঞাসা করতেন, তা হ'লে বুঝতে পারতেন যে, যে-কলকেতায় মার্শাল আইন জারি হয়নি ব'লে তাঁরা চটেছিলেন, সেই কলকেতা বা বাঙ্গালা যদি মিউটিনিতে যোগ দিত, তা হ'লে বলু, ম্যালিসন, কে প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণের লোহিতাভ মসী আর-ও কত রক্তসিক্ত হ'ত।

কত লাট-বেলাট কমাণ্ডারের স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিমূর্ত্তি ত ইটে পাতরে পেতলে ভারত আলো ক'রে রয়েছে, কিন্তু একজন কলিকাতাবাসী নিরক্ষর সরল সহজ বাঙ্গালী ক্যানিং এর যে স্মৃতিচিহ্ন রচনা ক'রে রেখে গেছে, তাই প্রায় ৬২।৬৩ বৎসর ধ'রে বাঙ্গালীর মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে তাঁদের রসনায় রসনায় মধুর

রসসঞ্চার করছে। আমাদের কম্বুলেটোলানিবাসী পরাণে ময়রা চাঁদা তুলে নয়, নিজের কল্পনাবলে ক্ষীর ছানা চিনির সহযোগে ক্যানিং-এর পতিব্রতা সহধর্ম্মিনীর নামে 'লেডী ক্যানিং' বলে যে মিষ্টান্ন তৈরী ক'রে গেছেন, তার মাহাত্ম্য বোঝেন প্রত্যেক বাঙ্গালী বেহাই, বাঙ্গালী জামাই, বাঙ্গালী বৌ, বাঙ্গালী ছেলে, বাঙ্গালী বন্ধু, বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী, বরযাত্রী। এই সুমিষ্ট স্মৃতিচিহ্নের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আছে শ্বেত-শিশু-মুখপ্রিয় বিলাতের 'কুইন্স কেক'।

কোম্পানীর আমলে টাকা, আধুলি, সিকি, দু' আনিতে এক দিকে ধানের হারের পাশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নাম, আর এক দিকে মুকুট-বিহীন ভিক্টোরিয়ার কবরীবন্ধ মুখখানি মুদ্রিত থাকত। পয়সার এক দিকে সসিংহ ইউনিকরুণ মুদ্রিত, অন্য দিকে 'ওয়ান পাইস', রাণীর মুখের ছাপ আদতেই ছিল না, এ ছাড়া পাশী লেখা গুটকে পয়সা, বড় পয়সা, ত্রিশূল চিহ্নিত পয়সা, দাঁড়ী-পাল্লা অঙ্কিত পয়সা, আর-ও দু'চার রকম পয়সার চলন ছিল ; এ সব পয়সা কোন্ কোন্ আমলের, তার খবর নিউমিসম্যাটিক মহাশয়রা দিতে পারবেন। কুইনের আমল প্রবর্ত্তনের বছর ৩।৪ মধ্যে কোম্পানীর নামবর্জ্জিত মুকুটধারিণী ভিক্টোরিয়ার মুখচ্ছবি-বিশিষ্ট মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হ'ল।

এ দেশে কড়ি একটি বাজারচলন মুদ্রা ব'লে বহুকাল হ'তে পরিগণিত হয়ে আসছিল ; আজ-ও শাস্ত্রসম্মত দানাদিতে বরাটকের সংখ্যানুসারে-ই দ্রব্যদক্ষিণাদির মূল্য প্রদত্ত হয়। ১৮৭০ এর কোটার-ও প্রায় শেষভাগ পর্য্যন্ত কলকেতার বাজারে কড়ি চলেছে, পল্লীগ্রামে কড়ির আয়ু বোধ হয় ৩০ বচ্ছরের পূর্ব্বেও শেষ হয় নি ; এক এক পয়সায় ৩টে উচ্ছে, তা কড়ি চলবে কি। চাকর-দাসীরা পয়সা ভাঙ্গিয়ে কড়ি কিনে বাজার ক'রে আনলে মনিবের চুরি না করে-ও তারা কিছু কিছু সঞ্চয় করত ; কেন না, পয়সা দিয়ে কড়ি কেনা আর কড়ি দিয়ে হিঞ্চে কল্মি কেনা, এই দু'য়ের ভেতর একটু গুণ্তির ইতরবিশেষ ছিল। এই গুণ্তির ইতরবিশেষকে-ই ইংরাজী পলিটিক্যাল ইকনমিতে এক্সচেঞ্জ বলে। বাঙ্গালী চাকর-দাসীদের এক্সচেঞ্জের লাভ উঠে গেছে, কিন্তু রূপী-পাউণ্ডের এক্স-চেঞ্জের কল্যাণে বিলিতী সওদাগররা যে উপরিপাওনাটা পান, তাতে আমরা একটু মাথায় হাত বুলোনোর আরাম অনুভব করি।*

* রচনাটি অসম্পূর্ণ। তেইশ পরিচ্ছেদের পর আর প্রকাশিত হয় নি। স০

১. অমৃতলালের পিতামহের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। ইনি অমৃতলালকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অমিতব্যয়ে তিনি এক রকম সর্বস্বান্ত হন। নিজের জন্মদিন উপলক্ষে ১৩১০ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ অমৃতলাল যে কবিতাটি লেখেন, তা থেকে জানা যায়, অমৃতলালের জন্মের পর—"পৌত্র পেয়ে পিতামহ অর্থশোক ভুলে দেছেন ঢুলিরে দান গাত্রবস্ত্র খুলে।" অমৃতলাল তাঁর 'অমৃত-মদিরা' কাব্যগ্রন্থ পিতামহের উদ্দেশেই নিবেদন করেন।

২. পিতামহকে অমৃতলাল 'দাদা' বলেই সম্বোধন করতেন। দ্বিপ্রহরে গঙ্গা-স্নানের অভ্যেস কালীকৃষ্ণের ছিল। কৌতুক-যৌতুকের 'গো-গোলযোগ' প্রবন্ধে (পৃ ১৭৩) অমৃতলাল পিতামহের প্রসঙ্গে শৈশবের একটি ঘটনা স্মরণ করেছেন। পিতামহের সামনে এক ক্রীড়াসঙ্গীর সঙ্গে কলহের সময় 'আমার গোরক্তের ব্রহ্মরক্তের দিব্যি' বলে ফেলেছিলেন,—'ঠাকুরদাদা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, দুই কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন, তিনি সবে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছিলেন, আবার স্নান করিবার জন্য সেই দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে আর্দ্রবস্ত্রে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত দিবারাত্রি নিরম্বু উপবাসী রহিলেন,···দাদার মুখপানে চাহিয়াই আমি লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে যেন মরিয়া গিয়াছিলাম।

৩. 'তিলতর্পণ'—অমৃতলালের দ্বিতীয় প্রহসন। ১৮৮১ সনে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

৪. কলকাতা শহরে সেলারদের 'বিদঘুটে উৎপাত ও বিচিত্র দৃশ্য' অমৃতলাল একটি প্রহসনে কাজে লাগিয়েছিলেন। 'বাবু' (১৮৯৪) প্রহসনের শেষ দৃশ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতাকামী দেশসেবক ষষ্ঠীকৃষ্ণের স্ত্রী নীরদাকে এক মাতাল সেলারের (ছদ্মবেশী) সামনে তিনি ফেলেছিলেন। স্ত্রীকে উদ্ধার ও রক্ষা করবার পরিবর্তে দেশসেবক ও তাঁর সঙ্গী সংস্কারক বাবুরা আত্মরক্ষার জন্য পলায়নে তৎপর হওয়ায় তাঁদের আন্দোলনের ভণ্ডামি ও চারিত্রিক ভীরুতা সুপ্রকট হয়ে উঠেছিল।

৫. 'পাড়ার কাঠওয়ালা সোনাউল্লার' বাস্তব অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়। অমৃত-লালের 'হামিদের হিম্মৎ' (১৩৩৩) উপন্যাসের প্রধানচরিত্র হামিদ ছিল 'দর্জিপাড়ার চেলাকাঠওয়ালা সোনাউল্লার নাতি'।

৬. বৃদ্ধবয়সে গড়গড়া ছিল অমৃতলালের নিত্যসঙ্গী। সাধারণ রঙ্গালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে ১৯২২ সনের ৭ই ডিসেম্বর 'নাট্যজুবিলি'তে অমৃতলালকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়, তাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে তাঁকে উপহার দেওয়া হয়

একটি রৌপ্যনির্মিত গড়গড়া। এই উপলক্ষে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২২ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকা থেকে তাঁকে লিখেন—'আপনার নটজীবনের পুরস্কার ঐ গুড়‑গুড়ি আর সাহিত্যজীবনের পুরস্কার ফুল'। অমৃতলাল কিন্তু এখানে স্বীকার করেছেন যে, 'গড়ুকখোর হিসেবে' পিতামহ তাঁর 'বাবার বাবা ঠাকুর‑দাদা ছিলেন।'

৭. বালক বয়সের এই প্রচণ্ড ঝড়ের স্মৃতি অমৃতলালের মন থেকে কখনও মুছে যায় নি। বাষট্টি বছর পরে বৃদ্ধ বয়সে শৈশবের এই 'দানব‑সঙ্গীতে'র জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন এইভাবে—"The crashing of uprooted trees, the rattling of tiles, the swishing of bamboo roof swept swiftly over towering waves in the ocean of air, the thundering sound of falling masonry mingled with terrified cries, wails, growls and howls of man and beast voiced a vicious concert, the burden of which was 'Horror' !"
(The Puja in the Retrospective', Forward : Puja Number, 1926)

৮. অভচরণ মিত্রের বাড়ির ভোগ্যসামগ্রীর সুখ্যাতি ছিল। অমৃতলাল তাঁর 'ঘরের কথা' নামক নক্‌শায় (ভারতী, ১৩১২) সঞ্চয়শীলা রায়গৃহিণীর সংগৃহীত খাদ্যসামগ্রীর যে তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে 'অভয়চরণ মিত্রের বাড়ির মেঠাই'‑এরও উল্লেখ আছে।

৯. স্বনামধন্য কবিরাজ। বালক বয়সে অমৃতলাল অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে যে সব পরিচিত ব্যক্তিদের ভাবভঙ্গী নকল করতেন, তাঁদের মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদও একজন ছিলেন।

১০. তয়ফা—পশ্চিম দেশীয় নাচওয়ালীর দল।

১১. 'আয়েষার রূপবর্ণনাচ্ছলে বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান করে…'—আয়েষার নয়, আশমানির—'হে বটতলা‑বিদ্যাপ্রদীপ‑তৈলপ্রদায়িনি ! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও।…আমি আশমানির রূপ বর্ণনা করি।' (দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, ১২শ পরিঃ)

১২. বাব—বিশেষ হিসাব ; রাজস্ব ; কর।

ভুবনমোহন নিয়োগী

ভুবন আমার চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের ছোট ছিল; তা হ'লেও যখন গত ২৫শে বৈশাখ রাত্রিতে সে মহানিদ্রার কোলে চেতনাহারা হয়ে পড়ে, তখন তার বয়স (৬৯) উনসত্তরের সীমা অতিক্রম করে নাই।

যে দেড় শতাধিক লোকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা ন্যাশান্যাল ও বেঙ্গল নাম দিয়ে বঙ্গের আদি দুটি নাট্যশালা গ'ড়ে তুলেছিল, তাঁদের মধ্যে জীবিত ছিলেন চার জন; এই চার জনের ভিতর গত চৈত্রের মাঝামাঝি গেছেন এক জন;—নাম যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সেই সেকালের প্রথম 'লীলাবতী' অভিনয়ে ইনি নদেরচাঁদ,—এমন নদেরচাঁদ আজ পর্য্যন্ত হয় নি, তবে অভিনেতারূপে তাঁর বিশেষ নাম নাই; মঞ্চসম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্য্যে তিনি ধর্ম্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায় ছিলেন; আর ষ্টার থিয়েটারের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বর্ত্তমান বাটীই তাঁর স্থপতি-বিদ্যার সাক্ষ্য দিতেছে; মন্দিরোপম সুচিত্র কারুকার্য্যভূষিত উক্ত নাট্যশালার গোপুরটি যোগীবাবুর কল্পিত আদর্শে গঠিত। মিত্তিরের জন্য হাতের চেটো দিয়ে একবার চোখটা মুছে নিতে তখনকার একজন রাজমিস্ত্রীও বেঁচে নাই।

এইবার গেছেন ভুবন নিয়োগী; বাকী আছি দু'জন; আমি আর ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী। ক্ষেতুও আমার চেয়ে বছর দুই আড়াইয়ের ছোট হবে, কিন্তু অবস্থা গতিকে যেন জবু-থবু হয়ে পড়েছে, বাড়ী থেকে আর বা'র হ'তে পারে না। অভিনেত্রী-যুগ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গের প্রকাশ্য নাট্যশালার আদি নায়িকা (Heroine) এই ক্ষেতু একদিন সহস্র সহস্র দর্শককে মোহিত করেছিল। পরলোকগতা বা জীবিতা বহু রূপবতী অভিনেত্রীকে আমি দেখেছি, এক এক জনের অভিনয়-কলার ভাব ও ভাষা অক্ষয় অক্ষরে আমার স্মৃতি ও প্রাণে মুদ্রিত আছে, কিন্তু তবু বলছি যে, কৃষ্ণকুমারী, নবীন-তপস্বিনী, কপালকুণ্ডলা এবং আরও দু একটা স্ত্রী-চরিত্রে আজ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গমঞ্চ-চঞ্চরী-ই অভিনয়ের কথা কি বলছি—সেই অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালককে রূপের ছটাতেও পরাজিত করতে পারে নি।

আমি নাট্যশালার ইতিহাস লিখতে বসি নাই, লেখবার শক্তিও নাই, আর সে কাযে হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না, সে বিষয়ে মনে একটা সন্দেহও আছে।

তবে নিজের এই ক্ষুদ্র জীবনটা ৫৫ বৎসর ধ'রে ষ্টেজ ও প্লের সঙ্গে এত জড়িয়ে গেছে যে, পুরোনো কৌটা থেকে এক খেই সুতো টেনে বের করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও দু চার খেই তার গায়ে গায়ে মিশে সামনে এসে পড়ে; তাই ভুবনের মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে আরও দু-চারটে ভোলা কথার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আজ ১৯ দিন হ'য়ে গেল ভুবন ইহলোক ছেড়ে চ'লে গেছে, কিন্তু তার মৃত্যু-সংবাদ এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। এটা কিছু বিচিত্র নয়; কারণ, তখনকার অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী-পরিচালিত সংবাদপত্রের মধ্যে যেগুলি ভুবন নিয়োগীর বড় বাড়ী দেখেছে, গাড়ী দেখেছে, জুড়ি দেখেছে, ফেটিং দেখেছে, দালানে দোল নন্দোৎসবের ধুমধাম দেখেছে, কালে তাদের প্রায় সকলগুলিরই অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। তাঁর বাড়ীর অনতিদূরেই যে প্রাচীন প্রসিদ্ধ পত্রিকাখানি আজ-ও সুস্থ শরীরে জীবিত আছে, তার বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের স্বর্গগত পিতৃ-পিতৃব্যগণ অবশ্য ভুবনকে আদরে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজেদের ঘরে বসিয়েছেন, তাঁর বাটীতে ও থিয়েটারে পদার্পণ ক'রে নিয়োগী কুলকে সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তখন ছিল আঙ্গুলে হীরের আংটিপরা ভুবন, আর এখনকার এঁরা যদি দেখে থাকেন তো দেখেছেন নেংটিপরা ভুবনকে।

ভুবনের পিতামহ স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র নিয়োগীর নামে বাগবাজারের একটি ঘাট এখনও পরিচিত; কিন্তু সমগ্র কলিকাতা সহরের যে ঘাটটি এক দিন তখনকার শোভাময় গঙ্গাতীরের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট আরামপ্রদ সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রাসাদ ব'লে গণিত হ'ত, তার ঘাটে নামবার পৈঠা কয়টি মাত্র এখন পূর্ব্ব-গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

জননী জাহ্নবী হুগলী নাম গ্রহণের পর ক্রমে যখন পতিতপাবনী কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে ইংরাজের বাণিজ্যবাহিনী চাকরী গ্রহণ করলেন, তখন বর্ব্বর-প্রথার প্রশ্রয়দায়ী গঙ্গাযাত্রী রাখার ঘরগুলি ও চাঁদনীর উপরিতলস্থ প্রকাণ্ড হল, সৌন্দর্য্যের শত্রু পোর্টকমিশনার মহাশয়দিগের দ্বারা উৎসারিত ক'রে পাটবাহী রেল ও মহিষ বয়েলের গাড়ী চলবার রাস্তা বানিয়ে দেছেন।

তার পর যে কালে থিয়েটারের পালায় ভুবন নিয়োগীর গলায় নামডাকের মালা দুলেছিল, সে সময়ে বাঙ্গালা নাট্যশালার ব্রজের ভাব; অর্থাৎ বঙ্গের নব নট-কুল গোকুলে গোচারণ ক'রে, কদম ডালের দোলায় দুলে, চাঁদের আলোয় রাসলীলা[১]

ক'রেই আনন্দ উপভোগ কত্ত। একটা মনের মত দাঁও পেলেই তাদের হার্ট লাফিয়ে উঠত ; আর্ট কাকে বলে তা তারা একেবারে জানত না, তা কি হাত ফেরাবার, চোখ ঘোরাবার, কি মাইনে নেবার, কি মাইনে বাড়াবার, এগ্রিমেণ্ট দেবার কি এগ্রিমেণ্ট ভাঙ্গবার। এখনকার অভিনেতৃদের মত তারা চুড়ো ছেড়ে পাক বাঁধে নি ; তাদের গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী বড় জোর রাখালরাজা হয়েছিল ; ভাড়াটে বাড়ীর উঠোনে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে কুঞ্জ রচনা ক'রে তারা লীলায় বিভোর হয়ে থাকত। এমন কি রিহারসল দেবার জন্য কারুর বাড়ীর বাইরে একটা ছোট খাট ঘর, একটা তেলের লণ্ঠন যোগাড় কত্তে পাল্লে এই আমরাই ভয়ানক একটা লাভ করেছি মনে কত্তেম।

এই সময় ভুবনের কাছে উপস্থিত হওয়াতে সে তার উপরি-উক্ত গঙ্গাতীরের দ্বিতলের হল ও একটি কুঠুরী আমাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেয়। আর দিলে একটি টেবল হারমোনিয়াম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুরাতন খানসামা নবীন এসে একটা সেজ জেবলে দিয়ে যেত গোটা ৫।৬ হুঁকো কেনা ছিল, নবীন খানিক-টা তামাক ও আগুনের বন্দোবস্ত ক'রে রেখে যেত ; সেজে আগুন দিয়ে টানবার ভার আমাদেব নিজেব নিজের উপর।

জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তর ; সেইরূপ আমাদের ব্রজরাজ যখন প্রথম প্রথম দিন কতক জটিলা-লীলা-রস অনুভব করবার জন্য আমাদের নামে কলঙ্কের গান বেঁধেছিলেন "লুপ্ত বেণী বইছে তেরো ধার। তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা মতির হার॥" তখন আমরা এই ঘাটের বৈঠকখানায় বসেই হাসতে হাসতে কবির অপূর্ব্ব রচনা সুর ক'রে নিজেরা গেয়েই কলঙ্কের কালিমাটুকু জ্যোছনায় উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছিলেম! আর কি রাখালরাজ রাখালদের ছেড়ে থাকতে পারে—বাঁশরী বাজল, আবার গোপাল গোঠে ফিরে এল। গিরিশের প্রত্যাগমনে অভিনেতাদের বিষাদ হরিষে পরিণত হ'ল।

রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্নের সৃষ্টি করেছিলেন, তাই কালিদাসের কবিতা-ভাগীরথী-তীর্থে স্নান ক'রে আজও জগৎ পুলকিত ও পবিত্র হচ্ছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সমাদরে রসিক-সমাগম হ'ত, তাই ভারতচন্দ্রের ছন্দাবলী আজও বাঙ্গালী কবির আদর্শ হয়ে আছে ; কবিরঞ্জনের পদাবলী, গোপাল ভাঁড়ের রসের টুকরা এখনও অনেক রসিকের প্রাণে প্রেরণা পেঁছে দেয়। বড় মানুষ ভুবন নিয়োগী একটু আশ্রয় দিয়েছিল, তাই গিরিশের মত অসাধারণ নাট্যকবি

কেবাণীগিরিতে জীবন পর্য্যবসিত করে নাই ;' স্কুল মাষ্টারের কেদারাই অর্দ্ধেন্দু ও ধর্ম্মদাস সুরের ন্যায় কলাবিদের প্রতিভার রঙ্গমঞ্চ হয় নাই ; তাই নগেন্দ্র. মহেন্দ্র, কিরণ, মতি, বেলবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদিগের নাম বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাসে অমর অক্ষরে লিখিত না হ'লে লেখককে অপরাধগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে।

রিহারসেল দিয়ে প্রথম প্রকাশ্য থিয়েটার খুলবার ব্যবস্থা করেই ভুবনের কার্য্য শেষ হয় নি। আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না ১৮৬৮ বা ৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিলাতী ব্যবসায়ী থিয়েটারের আমদানী কলিকাতায় হয় নি। ইংরাজী সওদাগরী অফিসের কেরাণী, এটর্ণি কৌন্সুলী প্রভৃতি সাহেবরা সখের দল বেঁধে থিয়েটার করতেন ; ছোকরা সাহেবরাই মেয়ে সাজতেন ; ২ জনকে আমি দেখেছি ও চিনতেম ; একজন ছিলেন এটর্ণি সি. এফ. পিটার ; আমাদের নগেন বাঁড়ুয্যের বড় ভাই দেব বাঁড়ুয্যে তাঁর আর্টিকেলড্ ক্লার্ক ছিলেন, আর এক জন এটর্ণি হিউম সাহেব ; তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত কলিকাতা পুলিসে পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। এঁদের টিকিট বিক্রিটা খরচা চলবার চাঁদার মধ্যে পরিগণিত হ'ত। আমরাও অভিনয়ে প্রথম টিকিট বিক্রি আরম্ভ করি ঐ চাঁদা হিসাবে খরচ চালাবার জন্য—আপন আপন উদরপূর্ত্তির জন্য নয়।

ব্যবসায়ী থিয়েটার আসার পর থেকে ইংরাজদের ২টি রঙ্গশালা নির্ম্মিত হয়। একটি লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে, একহারা ইটের দেওয়ালের উপর করগেট ছাওয়া ছোটো-খাটো ঘর ; সেখানে বক্স্ ও ষ্টল ভিন্ন অন্য সিট ছিল না। ঠিক জন্ কোম্পানীর গোড়ার আমলের নবাব না হলেও ৫০।৬০ বছরের আগেকার সাহেবরা এখনকার মত পাকা বেণে হন্‌নি, তাঁদের অনেকটা আমিরী মেজাজ ছিল ; প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি চাঁদা তুলে তাঁরা বোধ হয় উপরি উপরি ৫।৬ বছর গ্যারাণ্টি দিয়ে ইটালিয়ান অপেরা সম্প্রদায়কে কল্‌কাতায় আনাতেন ও এই লিণ্ডসে ষ্ট্রীটস্থ অপেরা হাউসে অভিনয় করাতেন। সেখানে টিকিটের দাম ১৬ টাকা থেকে ৫ টাকার কম নয় ; বারে, ফাষ্টক্লাশে এক পেগ সোডা ব্রাণ্ডি ৪ টাকা, সেকেণ্ড ক্লাসে ২ টাকা।

ইংরাজী নাটক অভিনয় আমাদের বাঙ্গালীকে ভাল ক'রে দেখিয়ে যান প্রথমে জি· ডাবলিউ. লুইস ব'লে একজন। যখন সেলার হোম ছিল লালবাজারের মোড়ে, তখম বৌবাজার ও বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের অনেকটা রাস্তার ধারে য়ুরোপীয়ান ও

আমেরিকান শুঁড়ীদের কতকগুলি মদের দোকান ছিল ; বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে এইরূপ এক শুঁড়ী, তাঁর কানে সোনার মাকড়ী—নাম ছিল সুলতানা, ভাড়া পাবার আশায় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের কাছে একখানি থিয়েটারের ঘর তৈয়ারী ক'রে দেন। করগেটের চাল, করগেটেরই বেড়া; এখনকার মতন ছ্যা ছ্যা হয়ে করগেট তখন ভবীর মা'র গোয়ালের চালায় আশ্রয় পায়নি। ঐ থিয়েটারে লুইসের দল প্রতি শীত কালে এসে মাস ৫।৬ অভিনয় দেখিয়ে চ'লে যেত। এখনকার চৌরঙ্গী অঞ্চলের দর্শকদের মতন তখনকার সাহেবদের নাট্য-প্রীতি নর্ত্তকী-শ্রীচরণোত্তোলন-ভঙ্গীতেই পরিতৃপ্ত হ'ত না, তাঁহারা যথার্থ নাটক এবং উৎকৃষ্ট নট-নটীর অভিনয় দেখতে ভালবাসতেন, তাই লুইসের দল প্রতি বৎসরই সেক্সপিয়ার এবং অন্যান্য খ্যাতনামা নাট্যকারের নাট্যলীলা অভিনয় ক'রে দেখাতেন। স্বামী লুইসের বিশেষ কোন কার্য্য সাধারণ চক্ষুতে পতিত হ'ত না, কিন্তু স্ত্রী লুইস অনন্যসাধারণ শক্তিসম্পন্না ছিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রুসিয়া, আমেরিকা এ সব আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু এই কলকাতায় এক নারীতে অমন স্বরূপা, সচ্চরিত্রা শ্রমশীলা অধ্যবসায়সম্পন্না অভিনেত্রী ও কার্য্যকর্ত্রী আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। তার প্রৌঢ় বয়সেও আমি যেন তাকে একটি ১৮ বৎসরের সুন্দর ছোকরা সাজতে দেখেছি।

বাঙ্গালা অভিনয়ে গিরিশবাবু যে নূতন ধরণের শক্তি ও ভাব সঞ্চার করেছিলেন, তার প্রথম প্রেরণা এই লুইস থিয়েটারের অভিনয় দেখাতেই তাঁর মস্তিস্কে প্রবেশ করে। এই থিয়েটারের প্রদর্শিত পানটোমাইমের উজ্জ্বল দৃশ্য-পটাদি দেখেই ধর্ম্মদাস সুরের দৈবীশক্তি প্রস্ফুটিত হয় ; আমি আর কিছু শিখি না শিখি, লুইস থিয়েটারে অনেকবার অনেক এক্‌টার এক্‌ট্রেসের অভিনয় দেখে এইটে বুঝে নিয়েছিলুম যে, মনুষ্যকণ্ঠে বজ্রগর্জ্জন তত শ্রুতিমধুর নয় আর affectation ও mannerism, acting নয়।

আমরা কভেণ্ট গার্ডেন, ড্রুরী লেন, হে মার্কেট, লাইসিয়ম প্রভৃতি দু-পাঁচটা লণ্ডন থিয়েটারের নাম শুনেছিলুম মাত্র ; মনে মনে ভাবতেম, গড়ের মাঠের ঐ টিনের বাক্সটি বোধ হয় দেশী কভেণ্ট গার্ডেন। হঠাৎ কোন আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে আমরা যদি বাঙ্গালীটোলায় ঐ রকম একটা বাড়ী গ'ড়ে তুলতে পারি, এইটি শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতুম আর জোড়াসাঁকোর স্যাণ্ডেল বাড়ীর (বর্ত্তমান মল্লিকদের ঘড়িওলা বাড়ীর) উঠানের ওপর বাঁধা ষ্টেজে অভিনয়ের অবসরে

স্যাঁতসেতে আঁধার ঘরে ব'সে পরস্পরে পরস্পরের কাছে বলাবলি করতুম যে, তা হ'লেই আমাদের থিয়েটার করার সোনার স্বপ্ন সফল হয়।

গ্রীষ্ম দেখা দিলে। সে বছর যেন আমাদের পথে বসাবার জন্যই কিছু সকাল সকাল আকাশের মেঘ ঝড়-বাদলের ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে, ঘরের ভেতর ভায়ে ভায়ের ভিতরও একটু একটু মুখ বাঁকা-বাঁকি সুরু হলো,—কারণ, আত্মীয়তা যেন প্রত্যক্ষফল প্রদর্শন করাবার জন্য নিষ্কর্মা জ্ঞাতি ও গাধাবোট-বোড়ানো গোঁড়ার গতায়াতটা বেশ নিয়মিতরূপেই চলতো ; সুতরাং গিরিশচন্দ্র রচিত :—

"কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুল না আমায়॥"

ইত্যাদি বিদায়-গীত গেয়ে নিজেরা কেঁদে সমগ্র দর্শককে কাঁদিয়ে পাদ-প্রদীপের আলোক নিবিয়ে দিলুম।

দু'দল হ'লুম ;—(ন্যাশান্যাল, হিন্দু ন্যাশান্যাল) হাবড়া, চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান, ঢাকা কত যায়গায় ষ্টেজ ঘাড়ে ক'রে ঘুরলুম ; নাম যশ বেশ ছড়িয়েই পড়লো, কিন্তু কল্কেতায় অভিনয় করবার একটা ঘর আর জোটে না।

অনিশ্চিত আশায় ভর ক'রে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বাড়ীর একটা হলে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের বাসনায় প্লাটফরম পর্য্যন্ত বাঁধা হ'ল :—বাস ঐ পর্য্যন্ত।

স্যাণ্ডেল-বাড়ীর উঠানে আমাদের ৩।৪ রাত্রি অভিনয়ের পরেই ঠনঠনের কালীতলার নিকট ৺কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের বাড়ির উঠানে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নাম দিয়ে ঝামাপুকুর অঞ্চলের কয়েক জন ভদ্রলোক একটি প্রকাশ্য রঙ্গালয় খোলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুই বা তিন রাত্রি ব্যতীত সেখানে আর অভিনয় হয়নি, সে সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গেই আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ চলছে, আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি, এমন সময় আগষ্ট মাসে বিডন ষ্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল। এখন যেখানে অনাথ বাবুর বাজার ও বিডন ষ্ট্রীট পোষ্টাফিস, ঐখানে সপুকুর একটি খোলা প্রশস্ত জমী ছিল— যার নাম ছাতুবাবুর মাঠ। বৈকালে বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাবুরা ঐখানে বসতেন, আর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন খুব ধুমধামে চড়ক হ'ত, আর প্রকাণ্ড মেলা বসত ; থিয়েটার ঘর হবার পরেও অনেক দিন চড়ক ও মেলার অস্তিত্ব ছিল, এখনও বোধ হয় ঐ দিনে ধুচুনীটা, কুলোটা, পুতুলটা প্রভৃতি বিক্রয় চলে। শোনা গেছে,

সেই অনেক দিন আগে গোড়ায় গোড়ায় যখন জয়রাম বসাকের বাড়ী 'কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব,' কালী সিংহী মশায়ের বাড়ী 'বিক্রমোর্ব্বশী' প্রভৃতি অভিনয় হয়, সেই সময় ছাতুবাবুর বাড়ীতেও ষ্টেজ বেঁধে 'শকুন্তলা' অভিনয় হয় ; ছাতু বাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সেই অভিনয়ে দুষ্মন্ত-পুত্র ভরতের ভূমিকা পেয়েছিলেন। শরৎবাবু নানা কলাদি বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর মতন ঘোড়-সওয়ার আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীতে জন্মেছে কি না সন্দেহ। ইংরাজদের অনুকরণে তাঁরই বিশেষ উদ্যোগে কাশীপুর অঞ্চলে বাঙ্গালীর একটি নিজস্ব রেশকোর্শ খোলা হয় ; পাখোয়াজ বাজানয় তিনি এক জন বড় ওস্তাদ ছিলেন, তাঁর রচিত পাখোয়াজের অনেক বোল এখনও গুণিমহলে প্রচলিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে সবন্ধু শরৎবাবুর উদ্যোগে ঐ মাঠে বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়ে মাটির দেওয়াল সমেত একখানি বড় খোলার চালা প্রস্তুত হয় ; ষ্টেজের প্লাটফরমটি পর্য্যন্ত সিমেণ্টের পলস্তারাযুক্ত মাটির বেদী— (ভারি ভুল)। এই দলের অনেক অভিনেতাই সখের যুগে প্রশংসিত ও আমাদের সিনিয়র ; যথা :—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (হাস্যরসরসিক ন্যাদারু) প্রভৃতি মহাশয়গণ। শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন ; তাঁর মাতুল লাটুবাবুর জ্যেষ্ঠ বংশধর মন্মথনাথ দেব বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন ; তাঁর শিষ্য ও ভ্রাতৃসম্পর্কীয় প্রিয়নাথ বসু মহাশয়ও চিত্রবিদ্যায় নিপুণ ; ইঁহারা দুই জনেই প্রথম ড্রপসিনখানি আঁকেন। যাক, বলিছি আমি নাট্যশালার ইতিহাস লিখছি না, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের জন্য একটু একটু বাঁশগাড়ি ক'রে অর্থাৎ (land mark) রেখে যাচ্ছি মাত্র।

যেখানে এখন মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত, ঐখানে একটা খালি জমী অনেক দিন থেকে পড়ে ছিল ; কেউ কেউ বলে, ঐখানে নন্দকুমারের বংশধর রাজা গুরুদাসের বাড়ী ছিল ; ঐ জমীটের উপর একটা থিয়েটার বাড়ী করতে পারলে বড় মজা হয়, এটা আমাদের মনে মনে বরাবর আঁচ ছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় চলছে, কিন্তু জমছে না ; শেষে বাবা তারকনাথ মুখ তুলে চাইলেন ; মোহান্ত মহারাজ এক ষোড়শী এলোকেশী যাত্রীর রূপে মোহিত হলেন, এলোকেশীর স্বামী পত্নীবধ করলেন ; কে এক জন বাঙ্গালী (কৃশ্চান বোধ হয়) 'মোহান্তের এই কি কাজ' ব'লে নাটক লিখলেন, সেই নাটকের

অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের নাম সারা বেংগলে ছড়িয়ে পড়ল, আমি আর নগেন উপরি-উপরি দু'রাত্রি টিকিট কিনতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। মাইকেলের পরামর্শে নারী এক্‌ট্রেস নিয়েও যে বেঙ্গল থিয়েটার খালি বেঞ্চির সামনে প্লে কচ্ছিল, মোহান্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে সেই বেঙ্গলের দরজা থেকে রাত্রির পর রাত্রি শত শত লোক ফিরে যেতে লাগল।

আমরা দম ফেটে মারা যেতে লাগলুম; টাকার ঝন্‌ঝনানি শুনে নয়, সত্য বলছি—টাকা তখন ডোণ্ট কেয়ার; খালি বাড়ী নেই,—ষ্টেজ নেই, এ্যাক্ট করতে পারছি না ব'লে, হাততালির শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করতে পারছি না ব'লে।

এই সময়ে সুমতিই হোক আর কুমতিই হোক, ভুবনকে ভগবান্ যা হোক ঐ রকম একটা কিছু দিলেন; "নাও জমীর লিজ, তৈরী কর থিয়েটার, আমি টাকা দেব।" আর আমাদের দেখে কে! তোমার জয় জয়কার হোক ভুবন, ব'লে আমরা লেগে গেলুম।

মানুষের ভিতরে অনেক শক্তি ঘুমিয়ে থাকে, ঘটনার যোগাযোগে অথবা অতি প্রয়োজনে সেই শক্তি জেগে দেখা দেয়।

ধর্ম্মদাস সুর ছিল মামুলী গৃহস্থ ছোকরা; স্কুলে পড়া এনট্রেন্স অবধি; কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার আঙ্গুলগুলির ব্যবহারে একটা পারিপাট্য দৃষ্ট হ'ত, হাতের লেখা অতি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানত সুন্দর, ম্যাপ আঁকত চমৎকার, আর সরস্বতী পূজার সময় কুমারটুলী থেকে ঠাকুর কিনে এনে নিজের হাতে সাজিয়ে চৌকীর উপর বাগান রচনা ক'রে, যখন প্রতিমাখানি তার উপর বসাত, তখন বড় বড় কারিগরও তার তারিফ না ক'রে থাকতে পারত না।

আমি পেছন দিকে ফিরে দেখে যত বার-ই ভেবেছি, তত বারই আমার মনে হয়েছে যে, সে সময়ে ৪টি লোক না থাকলে এ দেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হ'তে পারত না। সেই ৪টি লোক হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বতঃসিদ্ধ যোগাড়ে অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী এবং এক জন বিশিষ্ট নট। ধর্ম্মদাস সুর—যোগাড়ে নগেনের সহায় এবং হাতের কাজে বিশেষ পটু। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—বিধাতার হাতে গড়া একটার ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক; অর্দ্ধেন্দু ছিল সেই রকম মাষ্টার, যিনি কখন কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না; একটা দু'কথার পার্টের ভিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি ফুটিয়ে দিতে সমর্থ। আর ভুবনমোহন নিয়োগী—যার সাহায্যে প্রথম একটা

দল বসাবার জায়গা পাই ও পরে যার টাকায় বিডন ষ্ট্রীটে একটি সুদৃশ্য নাট্যশালা স্থাপিত হয়।

বলেছি নাট্যশালার আদর্শ ছিল, আমাদের সেই গড়ের মাঠের করগেটের ঘরখানি ; তাও টিকিট কিনে আসনে ব'সে যতটুকু মাত্র দেখা ; কারণ, আমাদের এই ক'টি বাঙ্গালী ছোকরার মনে এমন সাহস ছিল না, যে, সাহেব ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বলি, আমাদের একবার ভাল ক'রে থিয়েটার বাড়ীটে দেখিয়ে দিন। ধর্ম্মদাসের একটা বুদ্ধির কথা বলি : অবশ্য ব'লে ফেললে সেটা কলম্বসের হাঁসের ডিমের আগা ফেটে খাড়া ক'রে দাঁড় করানর মত অতি সহজ বোধ হবে ; ষ্টেজের সামনেটা কত বড় হবে, তার মাপ ঠিক করবার জন্য ধর্ম্মদাস পিটের একটা সিটে আমার পাশেই ব'সে বেজ্‌কার্টেনের পার্টগুলো সেলাইয়ে সেলাইয়ে গুণে নেয়, পরে বাজারে গিয়ে সেই কাপড়ের বহর মেপে প্রোসিনিয়মের ব্যবস্থা করে।

একটা সুযোগ ঘটে গেল ; ৭৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি চৌরঙ্গীর রাস্তার উপর লুইস সাহেব লুইস থিয়েটার নাম দিয়ে একখানি বাড়ী তৈরী করেন ; ৭৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস রূপে ঐ থিয়েটারে প্রবেশ করবার পর ঐ থিয়েটারের নাম হয় লুইসেস থিয়েটার রয়েল। তারপর শুধু থিয়েটার রয়েল। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের একটা গলির ভিতর সুলতানার বাসাবাড়ী। মাঠের ঘরখানি ভেঙ্গে মালমসলাগুলি ঐ বাসার সংলগ্ন একটা জমীতে রাখে। সস্তায় সুবিধা হবে মনে ক'রে নগেন, ধর্ম্মদাস আর আমি কাঠকোট পুরানো করগেট আদি কেনবার ইচ্ছায় সুলতানার কাছে যাই, সে একটা অসম্ভব লম্বা-চৌড়া দর হেঁকে বসে ; তা ছাড়া অভিজ্ঞ লোকে আমাদের পরামর্শ দিলেন যে, ঐ রিবিট মেরে ছেঁদা করা করগেটে কোন কায হবে না, তাই ওগুলো কিনে লওয়ার মতলব ত্যাগ করলেম ; কিন্তু সুবিধা হ'ল এই যে, বাড়ীখানির একটি ছোট কাঠের মডেল সেই বাসায় ছিল, ধর্ম্মদাস সেটি নিরীক্ষণ ক'রে নিতে পারলে।

হাজার তিনেক টাকার সেগুনের চকোর গিলেণ্ডার কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা হ'ল, সে রকম নিরেট সারবান্ সুন্দর চকোর এখন আর কলকাতায় দেখা যায় না। আজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ, এখনও সেই কাঠের গঠন বিনা ক্ষয়ে ষ্টারের বর্ত্তমান বাটীতে ব্যবহৃত হয়ে মজুত আছে।

নগেনের ছিল তখন একটা আফিসে চাকরী, দল একরকম ছিন্ন-ভিন্ন, আমি আর ধর্ম্মদাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, শেষাশেষি মশাল জ্বালিয়ে কায ক'রে, কি খাটনটা খেটেই যে ঐ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খুলতে পেরেছিলুম, তা এখনও মনে হ'লে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। লুইসের ছিল, দেল ও ছাত দুই-ই করগেটের, আমাদের হ'ল তক্তার বেড়া, করগেটের ছাত ; কেন না, তখন করগেটের চেয়ে তক্তা সস্তা ছিল, আর তখন পুরানো রেল বাজারে বিক্রী হ'ত না, তাই পোষ্টগুলিও চকোর কেটে তৈরী হয়েছিল।

ডেভিড গ্যারিক ব'লে একজন চিত্রকর কলকাতায় ছিলেন ; আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপল হয়ে তিনি এ দেশে আসেন, পরে ঐ কায ছেড়ে স্বাধীনভাবে চিত্রকর ও ফটোগ্রাফারের কায আরম্ভ করেন। তিনি ৮০ টাকা ক'রে প্রত্যেকখানির মজুরী নিয়ে চারখানি ফ্লাটসিন আমাদের এঁকে দেন, কাঠ, কাপড় বং সব আমাদের ; একখানি গৃহাভ্যন্তর. একখানি বাজসভা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্ব্বত ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি ড্রপসিন এঁকে দেন, এর জন্য তাঁকে মজুরী দিতে হয় সাড়ে ছ'শ টাকার কিছু উপর। সিনে ছাপবার জন্য সোণার পাতই লাগে প্রায় ৭০, ৭৫ টাকা ; সেটি গুটাবার জন্য নিরেট কাঠের মোটা রোলার তৈরী করলে ড্রপসিনখানি গুটুতে নাবাতে এঞ্জিন চালাতে হ'ত ; ঘুড়ির লাটাই ধর্ম্মদাসের মাথায় অপেক্ষাকৃত হালকা রোলারের প্ল্যান ঢুকিয়ে দিলে। গ্যাসফিটারের অনবধানতায় প্রথম রাত্রিতেই বাটীর সম্মুখের দেওয়ালে আগুন লাগার সূত্রপাত হয় ; দুর্গার ইচ্ছায় সব রক্ষা পায়। কিন্তু দর্শকের আতঙ্ক ও বাজে ভদ্রলোকের অনধিকার প্রবেশে এত গোলমাল হয় যে, অভিনয় আর সে রাত্রিতে শেষ হয় নাই।

যতগুলি অভিনেতা মিলে সাণ্ডেল-বাড়ীতে আমরা প্রথম অভিনয় আরম্ভ করি, তার সবগুলি ভুবন নিয়োগীর থিয়েটার খোলবার সময় একসঙ্গে ছিলাম না। সাণ্ডেল-বাড়ীর পালা শেষ হবার কিছু দিন আগে থেকেই দলের মধ্যে একটু মনান্তরের সূত্রপাত হয় ; তারপর দলটি রীতিমত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নগেন, অর্দ্ধেন্দু, বেলবাবু, ক্ষেতু গাঙ্গুলি, আমি প্রভৃতি এক দলে, আর গিরিজাবাবু,[৩] মহেন্দ্র বসু, মতি সুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিনেতারা আর এক দলে। ন্যাশানাল নামটা আমাদের বড় সাধের, আইনজ্ঞ বন্ধুদের পরামর্শে শেষোক্ত

দলটি বিনা মূলধনে একটি ন্যাশানাল থিয়েটার লিমিটেড নাম দিয়ে দলটি রেজেস্টারী ক'রে নেন, তাই আমরা যখন প্রথমে ঢাকায় যাই, তখন হিন্দু-ন্যাশনাল নাম নিতে বাধ্য হই, পরে ভুবনের থিয়েটারকে গ্রেট ন্যাশনাল নামে অভিহিত করি। এই দলাদলির মূলে অর্থ নিয়ে বিবাদ কিছুমাত্র ছিল না ; কারণ, এই ৭৫ বৎসরের প্রবেশদ্বার পার হয়ে, চিতার চিত্র অদূরে প্রধূমিত দেখে আমি স্পষ্টাক্ষরে সত্য কথা বলে যাচ্ছি যে, নিজেদের জীবিকার উপায় মনে ক'রে আমাদের মধ্যে এক জনও তখন টিকিট বিক্রয় ক'রে থিয়েটারের অভিনয় করবার কল্পনা মাথায় নেন নি। এখন একটা সখের থিয়েটার বসালে ষ্টেজ, সিন, সাজ-গোজ, পোষাক হয় চেয়ে, নয় ভাড়ায় সহজেই পাওয়া যায়। তখন আর্শি, বুরুষ, চিরুণীখানি পর্য্যন্ত কিনতে হ'ত—নয় নিজেদের বাড়ী থেকে ভুলিয়ে, নয় আব্দার ক'রে চেয়ে নিতে হ'ত, মেয়ে সাজবার শাড়ী ও গয়না ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গেছে। পাড়ার লোকের কাছে বার বার চাঁদা চাইতে গেলে তাঁরা সব বিরক্ত হতেন, এটা একেবারে দোষের কথা নয়। নগেনের মাথাতেই প্রথন মতলব আসে যে, সাহেবরা যেমন টিকিট বেচে সব খরচ চালায়, আমাদের মাইনে পত্তর দেওয়া-টেওয়া নেই, শুধু সিন, পোষাক পরচুল প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে আলো জ্বালিয়ে ৫।৭ রাত্রি একখানা বইয়ের অভিনয় চালাবার খরচ কেন আমরা ঐ রকম টিকিট বিক্রী ক'রে চালাতে পারব না। আর একটা কারণেও টিকিট বিক্রীর কল্পনা হয়, সখের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষবা অভিনয় দেখাবার জন্য নিজেদের পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরই টিকিট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করতেন, অপর ভদ্রলোক টিকিটের জন্য প্রার্থনা ক'রে কখনও বা সফল, কখনও বা বিফলমনোরথ হতেন, আবার অনেকে দরজা পর্য্যন্ত এসে ফিরে যেতে বাধ্য হতেন, সময়ে সময়ে কেউ কেউ যে অপমানিত হতেন না, এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি নে ; প্রবেশের মূল্য ধার্য্য হ'লে অনেকে অন্ততঃ একটা আধুলি দিয়েও সম্মানের সঙ্গে বসতে পাবেন। সাধারণ থিয়েটার খোলার এও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

গিরিশ বাবুর পরলোকগমনের পর কেউ কেউ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি টিকিট বিক্রী করা হবে ব'লে প্রথমে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন নি। সে কথাটা একেবারে সত্য নয়। আমাদের নাট্যপরিবারের মধ্যে বয়স ও বিদ্যা হিসাবে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁর চরণে আমরা চিরকাল প্রণাম ক'রে এসেছি এবং এখনও উদ্দেশে করছি। কিন্তু বংশ বা সামাজিক মর্য্যাদার

আমাদের মধ্যে কেহই তাঁর কাছে সামান্য ভগ্নাংশের হিসাবেও হীন ছিল না ; আর যদি বেঁচে থাকি এবং শক্তি একেবারে লোপ না হয়, তবে হয় ত সময়ান্তরে ন্যাশান্যাল ও বেংগলের অভিনেতাদের বংশাদির পরিচয় দেব।

গিরিশবাবু আমাদের সংগে যোগ দিয়ে প্রথম অভিনয় করবার সময় বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম ছাপিয়ে পাশে "এমেচার" কথাটা লেখা হয়, তার কারণ আমি এখানে উল্লেখ করছি। ইংরাজী থিয়েটার চালাবার অনেক প্রথারই অনুকরণ আমরা আরম্ভ করেছিলাম বটে, তবে বাদ দিয়েছিলাম দুটি, এক—থিয়েটারের সংগে মদ বিক্রীর বার খোলা, সে মর্য্যাদাটুকু দেশীয় নাট্যশালাগুলি আজও পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রে আসছেন ; দুই—ইংরাজরা অভিনেতৃদের নাম বিজ্ঞাপিত করতেন, আমরা সেটি করিনি। ষ্টারেও কদাচ কখন বিশেষ কারণ ভিন্ন আমাদের সময় আমরা নট-নটীদের নাম বিজ্ঞাপিত করতাম না। গোড়ায় গিরিশবাবু আমাদের দলে নাই, এ ক্ষোভটা আমাদের মনে বড়ই আঘাত করত, পুনর্ম্মিলনের পর আমরা বড় আহ্লাদে তাঁর নামটি ছাপাবার অনুমতি প্রার্থনা করলুম, তাতে তিনি বলেন যে, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে অফিসে একটা ভাল কর্ম্ম করি, টিকিটবিক্রী-থিয়েটারে এক্ট কচ্ছি, এই ব'লে আমার নাম প্রচার হ'লে তাঁরা হয়ত কিছু মনে করতে পারেন ; তাতেই আমরা বলি যে, এমেচার কথাটা তাঁর নামের পাশে দিলে আর লজ্জার কোন কথা থাকবে না ; নইলে পর্দ্দার আড়ালে সকল এক্টারই এমেচার।

এই দলাদলির মূল কারণ এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অভিনেতার একত্র সমাবেশ। বর্ত্তমান কালে ম্যানেজারদের মধ্যে যিনি প্রতিযোগী থিয়েটারকে হীনবল করবার জন্য বেতন ও বোনাশের পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে নিজের দলে নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা পান, তিনি রোকের মাথায় এই কথাটা ভুলে যান যে, সাপ অন্য জীবকে দংশন ক'রে, তাকে কালের কবলে পাঠাবার সংগে সংগে নিজেও জর্জ্জরিত হয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়। খুব কম নাটকই কোন ভাষায় আছে, যাতে ৪টা বা ৫টার বেশী বড় এক্টর বা একট্রেস তাঁদের মনের মতন পার্ট পেতে পারেন। 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়েই ন্যাশানাল থিয়েটার সর্ব্বসাধারণকে প্রথম অভিবাদন করে। নাটকের রচনার গুণে এবং তার চেয়েও বেশী অর্দ্ধেন্দুর শিক্ষা-কৌশলে ঐ নাটকে অতি বড় থেকে অতি ছোট পর্য্যন্ত প্রতি পার্টে অভিনেতারা আপনাদের কৃতিত্বে একটা

একটা বিশিষ্ট ছবি ফুটিয়ে দেখাবার সুবিধা পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর যত নাটক অভিনয় হয়েছে, তাতে গিরিশচন্দ্র বেরুলে হয়ত নগেন্দ্র রইল ব'সে ;- নগেন বেরুল ত' মহেন্দ্রের ভাগ্যে একটা ছোট পার্ট, আর একখানায় হিরোটা মহেন্দ্রকে দেওয়া যায় কি মতিকে দেওয়া যায় ; তারপর আমার মতন ইতরে জনার মিষ্টান্ন লাভের ত' কথাই নাই ; অথচ এক্ট ক'রে বাহাদুরী দেখিয়ে ক্লাপ নেওয়া মাত্র এই পেশাদারী কলঙ্কের পশরা মাথায় নেবার একমাত্র বাসনা ও উদ্দেশ্য।

এই দলাদলির দ্বিতীয় কারণ ছিল প্রভুত্ব নিয়ে মতভেদ। 'লীলাবতী' রিহার্শলের সময়েই টিকিট বিক্রী ক'রে থিয়েটার করবার কল্পনাটা প্রথমে সকলের মাথায় প্রবেশ করে ; কিন্তু নানা কারণে সেটা কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় নি ; 'লীলাবতী'র অভিনয় সখের ভাবেই প্রদর্শিত হয় শ্যামবাজারে বৃন্দাবন বসাকের লেনে উক্ত বসাক মহাশয়ের অন্যতম উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্রনাথ পালের প্রাঙ্গণে। কলাফলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও স্বার্থশূন্য হয়ে বাটীর উঠান ছেড়ে দেওয়া ছাড়া রাজেন্দ্র বাবু ঐ সময়ে বহুবিধ বিষয়ে সম্প্রদায়কে সাহায্য করেন ; বিষয়বুদ্ধি ও যোগাড় করবার ক্ষমতা তাঁর একটা ভাল রকমই ছিল। ভুবনের আশ্রয়ে তার ঘাটের বৈঠকখানায় রিহার্শাল দিতে আরম্ভ ক'রে নগেন প্রভৃতি রাজেন্দ্র পালের খাতিরটা বলতে গেলে একেবারেই রাখে নি, যে কারণেই হ'ক এটা ভাল কাজ হয় নি ; রাজেন বাবু এবং তাঁর অনুগত লোকেরা এজন্য বড়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এদিকে টিকিট বিক্রী ক'রে 'নীলদর্পণ' খোলবার সম্বন্ধে গিরিশবাবুর প্রকাশ্য আপত্তি যে, তিনি একটা ভাল রকম বাড়ীটাড়ী তৈরী না ক'রে সাধারণ নাট্যশালায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে নারাজ।

প্রকাশ্য থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরাই জানেন যে, আর এক জন ষ্টেজে দাঁড়িয়ে ক্লাপ নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি সাজঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছি, সে জ্বালা কিজ্বালা ! নগেন বাঁড়ুজ্যে অবশ্য বড় রকম একটা এক্টার, আর বুদ্ধিকুশল, পরিশ্রমী, যোগাড়ে, অমন আর দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তা'র বড় ভাই দেব বাঁড়ুজ্যে কোথাকার কে যে, সে এসে কর্ত্তা হ'য়ে বসবে, এটা যদি গিরিশ ঘোষের অসহ্য হয়, তা'তে কিছু নিন্দা করা যায় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে আমি শুদ্ধ এক জন এ কথাটা ঠিক ও ভাবে তখন দেখি নি। মনে করতাম যে, এই থিয়েটা-রের জন্য বাঁড়ুজ্যে পরিবাররা স্ত্রী পুরুষ যতটা অত্যাচর সহ্য করে, ততটা আর

কে করে? নেহাৎ দরকারে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা ঘর থেকে বের ক'রে দিতে, শ্যামাচরণ মুস্তাফির পুত্র অর্দ্ধেন্দুকে বাড়ীতে আটকে রাখলে তাঁকে বাগিয়ে জুগিয়ে ছেলের ছাড়পত্র নিতে, মেয়ে সাজাবার জন্য টুকটুকে ছোকরাদের হপ্তার পর হপ্তা ধ'রে বাড়ীতে বসিয়ে খাইয়ে দাইয়ে আটকে রাখতে আর কারও বাড়ীতে ত আমাদের প্রবেশাধিকার নাই, তবে গিরিশবাবুতে দেববাবুতে মিলে-জুলে কায করতে পারবেন না কেন?

দ্বিতীয় কারণের চেয়ে প্রথম কারণটাই বেশী প্রবল; অনেকগুলি বড় এক্টার, যাঁদের যথার্থ অভিনয় করবার সখ আছে, রজতমূল্য অপেক্ষা দর্শককে আনন্দ দিয়ে আনন্দিত হওয়ার লোভটা বেশী, তাঁরা একসংগে এক সম্প্রদায়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন না।

সেকালের বিলাতী পার্লামেণ্টে একবার টোরী, একবার হুইগ দলের আধিপত্য হ'ত; ভুবনের সময়ে আমাদের থিয়েটারে ঠিক সেই রকম একদল ৪।৫ মাস ধ'রে রঙ্গমঞ্চে আধিপত্য ক'রে গেল, তার পর কোন একটা খুঁটিনাটি নিয়ে মনান্তর হওয়ায় তাবা গেলেন চ'লে, অন্য দল এসে কাজ আরম্ভ করলেন, আবার এ দলের দু-পাঁচ জন ও দলে, ও দলের দু'চার জন এ দলে যে মেশামেশি হ'ত না, তা'নয়।

৭৪ খৃীষ্টাব্দের মাঝামাঝি আমরা স্ত্রীলোক অভিনেত্রী নিতে বাধ্য হলাম। প্রথম কারণ, যাঁরা এতদিন মেয়ে সেজে খুব সুখ্যাতি নিয়ে আসছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই বয়স বেড়ে উঠল, সাজলে মানায় না, সাজতেও আর তাঁরা চান না; বাইরের ছোকরা দেখতেও ভাল, অভিনয়ও মন্দ করে না, এমন কয়েক জন জোগাড় করা গেছল বটে, কিন্তু দায়িত্ববোধ ব'লে জিনিষটার কোন ভাবই প্রায় তা'দের মধ্যে দেখা যেত না; অভিনয়ের দিন বিকেল অবধি দেখা নেই, দশটা আড্ডা খুঁজে খবর পাওয়া গেল না, ঘুরতে ঘুরতে দেখা গেল, গড়পাড় ছাড়িয়ে খালধারের এক গাছতলায় মুর্ত্তি চুপ ক'রে বসে আছেন। এর চেয়েও মুস্কিল হ'ল নাটকের অভাব, মাইকেল, দীনবন্ধু, মনোমোহন, রামনারায়ণ প্রভৃতির যে সব নাটক তখন সাধারণের আদরের ছিল তা' সবই আমরা অভিনয় ক'রে ফেলেছি। এক রাত্রিতে জগদ্বিখ্যাত হবার আশায় অনেক বালখিল্য নাট্যকার গম্ভীর গণ্ডস্থলে মুরুব্বিয়ানা মাখিয়ে পাণ্ডুলিপি হস্তে, এমন কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য মধুসূদন জীবনের শেষ লেখা 'মায়াকানন' লিখে

দেহ রক্ষা করেছেন জেনে 'সঙ্কেতকানন' ব'লে একখানি নাটক লিখে আমাদের দিয়েছিলেন এবং আমার একটি ইঙ্গিতের শ্লেষার্থ না বুঝতে পেরে 'কেওড়া-কানন' নাটক পর্য্যন্ত লিখে এনেছিলেন। কিন্তু নাটকের আইন-কানুন রস-কসের সঙ্গে এ সব কাননের একটুও সম্পর্ক ছিল না।

এক সময়ে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, গিরিশ ঘোষ থিয়েটারে কর্ত্তামি হাতে পেয়ে কেবল নিজের লেখা নাটকই সেখানে চালিয়েছে, আর অন্যান্য "জগৎ-বিখ্যাতদের" প্রত্যাখ্যান ক'রে দেবে রেখেছে ; এটা একেবারে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। গিরিশবাবু বা অভিনেতাদের মধ্যে আর কেউ-ই তখন নাট্যকার হবার উচ্চাশা করেন নি। গিরিশবাবু প্রথম থেকেই আবশ্যক মত ভাল ভাল গীত রচনা করেছেন, বঙ্কিমবাবুর 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' নাটকাকারে গঠিত ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে যে আস্ত একখানা নাটক লিখবেন, এ কথা তখন একবারও মনে করেন নি। তিনি নটপ্রধান, অভিনয়-কলার সাধনাই তাঁর ধ্যান, অনুবর্ত্তী নট আমরা ঐ ভাবে অভিনয় করবার পিপাসায় একখানি ভাল নাটকের জন্য হা-হা ক'রে বেড়িইছি ; প্রমাণ, যেই সংবাদ পেলাম যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পুরুবিক্রম' নাম দিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন, অমনি নগেনেতে আমাতে ছুটে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে অভিনয়ের অনুমতি এনেছি। একটা কথা ব'লে রাখি, তখন অভিনয় স্বত্ব কপিরাইট আইনের ভিতরে আসে নি, কিন্তু তখনকার আমাদের মত দুষ্ট নটরাও শিষ্টতা বর্জ্জন করত না।

নাটকের অভাবে গীতপ্রধান অপেরা না চালালে আপাততঃ উপায় নেই মনে ক'রে অভিনেত্রী নিতে আমরা বাধ্য হলেম। আমার নিজের একটা ভয়ানক ভুল ধারণা ছিল যে, যে শ্রেণীর নারীর মধ্য হ'তে অভিনেত্রী নির্ব্বাচন করা হবে, তারা নিতান্ত উচ্ছৃংখল এবং নাচতে গাইতে পারলেও উচ্চাঙ্গের স্ত্রীচরিত্র সকল অভিনয় করতে কখনই সমর্থ হবে না। আমার আবার কেশববাবুর চরণে ভক্তি ছিল, আর সকল কথায় "বোধ হয়" বলা অভ্যাস ক'রে ফেলেছিলাম, তাই দলের অনেকেই আমাকে ঠাট্টা ক'রে 'ব্রেম্মজ্ঞানি' বলত। কিন্তু অভি-নেত্রীরা রিহার্সালে আসতে আরম্ভ করার দু' সপ্তাহের মধ্যেই আমার সে সব ভ্রম দূর হয়ে গিছল। এখনকার হিসাবে তখন বেতন অতি অল্প,[৩] অথচ যে পাঁচটি অভিনেত্রী প্রথমে আমাদের কাছে এল,[৪] তাদের সকল বিষয়েই নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষালাভের পিপাসা ও যত্ন এবং কর্ম্মস্থলে.

শীলতা রক্ষা, সহজভাবে দেখে আমাদের মধ্যে অনেক পুরুষকেও নিজ নিজ চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হয়েছে। স্পষ্টই তারা আমাদের কাছে বলেছে যে, উৎপীড়িতাদের জন্য এই নূতন পথ খুলে আমাদের আশ্রয় দিয়ে যে কত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন, তা বলতে পারি না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক জেরাতেও তাদের মুখ থেকে বের করতে পারি নি যে, তাদের বাহ্য ছটা, সুখের জীবনের ঘটার জ্যোতিঃ। হায়! সমাজের ব্যবস্থায় যদি এদের সংসারী করবার উপায় থাকত, তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, জন্মশাপে পতিতা কতকগুলি অভাগিনীর উদ্ধারসাধন হ'তে পারত। আরও তাদের শুদ্ধির পথে এগুতে দিলে না সমাজ-বিশেষের লৌহসিন্দুক-উদ্গারিত বন্দুকের আওয়াজ।

যা হ'ক, এই রকম ক'রে ভুবনের গ্রেট ন্যাশান্যাল চল্‌ল ৭৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত।

ভুবন সাহস ক'রে প্রথম থিয়েটার-বাটী নির্ম্মাণের জন্য অর্থব্যয় করেছিল বটে, কিন্তু ঐ থিয়েটারও তাকে অনেক অর্থ দিয়েছে। স্ত্রীলোক প্রবেশের পূর্ব্বে যে সব যুবকরা অভিনয় কত্তেন, বেতন তাঁদের মধ্যে কেহই নিতেন না। বেতন শব্দটা উচ্চারণ মাত্রই অনেকে অপমানিত মনে কত্তেন; তবে কখন কদাচ কেউ একটু স্ফূর্ত্তি করবার উদ্দেশে ৫।৭ টাকা নিতেন। তার পর যখন এক্‌ট্রেস এল, তখন দু'চার জন গাইয়ে বাজিয়েকে কিছু দিতে হ'ল, তখনও থিয়েটার চালাবার মাসিক খরচা শ আড়েক টাকার উপর উঠেনি, বিজ্ঞাপনের মধ্যে মোড়ে মোড়ে এক শ খানা পোষ্টার; কখন কোন বিশেষ অভিনয় উপলক্ষ্যে 'ইংলিশ-ম্যানে' ইঞ্চি দুই বিজ্ঞাপন, আর পাঁচশ, হ্যাণ্ডবিল।

দীনের এই পঞ্চান্ন বৎসরব্যাপী নাট্য-জীবনের স্রোত একবার এক বছরের জন্য একটু অন্য পথগামী হয়; সেটা যৌবনস্বপ্নের একটা রোমান্স। ৭৭ অব্দের এপ্রেল মাসে আমি পুলিসে একটা কর্ম্ম নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার যাই। ৭৮-এর মার্চ্চে ফিরে আসি। অবন্দী বাঙ্গালীদের মধ্যে আমিই বোধ হয় দ্বিতীয় অবতার রূপে এণ্ডামানে পদার্পণ করি; আমার ছয় মাস পূর্ব্বে সেথায় যান আমার বন্ধু বিহারীলাল, মিনার্ভার বর্ত্তমান খ্যাত অভিনেতা হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতা। ফিরে এসে দেখি, কলিকাতার নাট্যজগতে এই এক বৎসরের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালকরা প্রায় সবাই প্রবীণ, তাঁরা নির্দ্দিষ্ট পথে মন্থরগতিতে সুস্থ শরীরে খোস মেজাজে চলতেন।

আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন গিরিশবাবু, তাঁরও বয়স তখন ৩৪ পার হয় নি, সুতরাং উদ্দাম উৎসাহ ও রোখারুখির ঝড় যা কিছু, তা আমাদের দলেই দেখা দিত। একদিকে দেখলাম, বেঙ্গল থিয়েটার আগে 'মেঘনাদ' অভিনয় করলেও, গিরিশবাবুর দ্বারা নাট্যাকারে পরিণত হয়ে এবং তাঁর নিজের অভিনয়শক্তি ও শিক্ষাদান-ক্ষমতার বিকাশে তখনকার বিদ্বজ্জনসমাজ মুগ্ধ হয়ে গেছে; তাঁর 'মেঘনাদ', 'পলাসীর যুদ্ধে' ক্লাইভ, 'মৃণালিণী'তে পশুপতি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভূমিকাসকল দেখেই সে যুগের সমালোচকশ্রেষ্ঠ অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর 'সাধারণী'তে লিখেছিলেন, "কোন্ দেশের কোন্ গ্যারিকের কাছে আমাদের বঙ্গের গিরিশ অভিনয়-কলা প্রদর্শনে হীন!" ঐ সময়েই চিরস্মরণীয় অভিনেতা অমৃত মিত্র থিয়েটারে যোগ দেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু আর এক মজাও দেখলাম, ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট্ ন্যাশানাল থিয়েটারের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়েও নিজের থিয়েটারে নিজে ঢুকতে পায় না। যে সকল কৌশলে ভুবনের কাছ থেকে থিয়েটাব লিজ্ নিয়ে তা, হস্তান্তরের পর হস্থান্তর ক'রে ভুবনকে ভূঁইকম্পে দুলিয়ে উল্‌টে ফেলে দেওয়া হয় শোনা গেল, তার বর্ণনায় আমি অনেক বিবেচনা ক'রে ধামা চাপা দিলাম।

এইখানেই ভুবনের কর্ম্মজীবনাভিনয়ের শেষ ;—যবনিকা পতন।

তার পর এই দীর্ঘ আটচল্লিশ বৎসরের উপর তার দেহে প্রাণ ছিল, উদরে ক্ষুধা ছিল, মাথাভরা ভাবনা, বুক ভরা জ্বালা, আশার পিপাসা সবই ছিল, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক ছিল না।

আশ্চর্য্য কি এক অভিসম্পাত ছিল এই প্রাচীন প্রসিদ্ধ নিয়োগী পরিবারের ধনভাণ্ডারের উপর!

ভুবন যখন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তখন উহা চারি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। বিধবা মাতা এক অংশ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহের কিছুদিন পরেই অল্প বয়সে লোকান্তরিত হয়, তার বিধবা এক অংশ, ভুবন এক অংশ; উহার কনিষ্ঠ এক অংশ; আবার ঐ কনিষ্ঠ বিবাহের অনতিকাল বিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তার বালবিধবা এক অংশ।

ভুবন অর্থ কর্জ্জ ক'রে থিয়েটার করায় তার মাতা বিরক্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভাইকে নিয়ে একটি ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন। আমার চক্ষুর উপর অন্ততঃ ছয়

বৎসর কাল ভুবনের সংসার চলেছে স্বচ্ছন্দে, নিত্য দেবসেবা ও পার্ব্বণাদিতে ধুমধাম সব হয়েছে ঘটা ক'রে, পৈতৃক প্রথা অনুযায়ী পূজায় বার্ষিক বিতরণ, ব্রাহ্মণবিদায়, সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম, বাড়ী মেরামত, গাড়ী জুড়ী ইয়ারকি সবই চ'লেছে, কিন্তু কি জমিদারী কি কলিকাতার বিষয়ের আয়ের কোনোদিন কোনো অংশ ভুবনের হাতে আসতে দেখিনি ; এ সব খরচ চলেছে হয় থিয়েটারের আয়ে, নয় কর্জ্জ ক'রে ; বিষয়ের আয় শুনেছি মা'র কাছেই পৌঁছাত।

ভুবন যেন উড়নচুড়ে টাকা উড়িয়েছে ধ'রে নেওয়া যায় ; মা বড়মানুষী ত করেননি, ধর্ম্মকর্ম্মেও যে বেশী কিছু খরচ করেছেন, তাও শোনা যায়নি, অথচ যখন ভুবনের অংশ বিক্রী হয়ে যায়, তাও তিনি কিনে নেন ; রসিক নিয়োগীর বিষয়ের অর্দ্ধাংশ যে কি ক'রে কোথা দিয়ে উড়ে গেল, তা আজও কেউ বুঝতে পারেনি। ছোট ভাই বয়ঃপ্রাপ্তির পর বছর ২।৩ বোধ হয় একটু বাবু হয়ে বেড়িয়েছিল, তার সখের মধ্যে ছিল গাড়ী ঘোড়া ; তার পর তার বকরা বের ক'রে নিয়ে বোয়ের বাপ ভাই তাকে নিয়ে গিয়ে কাশীতে নিজের বাড়ীতে রাখে, শুনতে পাই তিনিও বেশ স্বচ্ছল নেই। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ এখনও জীবিতা এবং হাট-খোলায় পিত্রালয়ে বাস করছেন ; তিনি গত হ'লে সম্ভবতঃ ভুবনের ছেলেরা সে অংশটা পেলেও পেতে পারে। এই পরিবারের আর দুই সরিক ছিল ; এক সরিকের বিধবা ত দীনার ন্যায় দিনপাত ক'রে অনেকদিন গত হয়েছেন, আর এক সরিক ভুবনের খুল্লপিতামহ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী মহাশয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, আর খরচপত্র সম্বন্ধে এত সাবধানী যে পাড়ার লোক প্রাতঃকালে তাঁর নাম মুখে আনতো না। কিন্তু আমি বরাবর তাঁর নাম করেছি ও করি, কেন না, যে মহাপুরুষ কীটের পরিপুষ্টির জন্য লক্ষাধিক মুদ্রার বই কিনে রেখে যেতে পারেন, সখে একটা দশ হাজার টাকার দুরবীণ কিনতে পারেন, তাঁরে যে কৃপণ বলে, সে একান্ত কৃপার পাত্র।

অতি অল্প বয়সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, বিদ্যাশিক্ষা একরকম কিছুই হয়নি, কোনরূপ অভিভাবকের অভাব, আত্মীয় কুটুম্ব যারা মাঝে মাঝে দেখা দিতেন, তাঁরা যা কিছু পেতেন নিয়ে সরে পড়তেন, এই সব অবস্থার সংযোগে যে এক জন তরুণ যুবকের প্রকৃতি কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয় ; কিন্তু ইচ্ছা ক'রে ভুবন কারুর কিছু অনিষ্ট করেছে, এ আমি কখন দেখিনি বা শুনিনি। আর যে নিজের অনিষ্টসাধনে অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত, সে পরের অনিষ্ট

করবার সময় পাবে কখন ?

বুদ্ধিহীনতাবশতঃ তার এক বিষম দোষ ছিল, যে প্রাণপাত ক'রে থিয়েটারের কায করছে, অথচ অভাবজনিত বাড়ীতে অর্থের প্রয়োজন, তাকে হাত তুলে ভুবন কখন কিছু দেবে না ; কাযেই থিয়েটারের সখও ছাড়তে পারে না, সংসার বা নিজের খরচও চলে না, এই অবস্থায় কেউ কেউ পারিশ্রমিকটা "না ব'লে" নিতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু বাইরের ভদ্রলোক, কবি, সাহিত্যিক, কন্যাদায়গ্রস্ত ঋণ-ভারে বিপন্ন, এমন লোক ভুবনের কাছে এসে প্রায় নিরাশ হয়ে যায়নি। শেষ বয়স পর্যান্ত ভুবনের মনে সেই বালকভাব বিদ্যমান ছিল।

কত বুড়ো ম'লে কেউ কাঁদে না, তাতে কর্ম্মহীন ধনহীন বৃদ্ধের উদ্ধর্ব-গতিতে চোখের জল আর কে ফেলবে। অতীতের স্মৃতি আমায় যে কটা কথা লেখালে, তাই উপহার দিয়ে গেলাম বাঙ্গালার নাট্যশালার সেকালের কথা যাঁরা শুনতে চান— তাঁদের।

বঙ্গের বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলির যাঁরা পরিচালক, অভিনেতৃরূপে যাঁরা আজ নাট্যগগনে জ্যোতিষ্কস্বরূপ, নাট্যকলার প্রতি যাঁদের কোনরূপ অনুরাগ আছে, তাঁরা এই প্রবন্ধ হ'তে বুঝতে পারবেন যে এ দেশে নাট্য-সংসারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ভুবনমোহন নিয়োগীর তরুণ জীবনের প্রয়োজন কতটা অপরিহার্য্য ছিল।

প্রসঙ্গকথা

১. রাসলীলা—১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক বসুমতীতে যখন প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মুদ্রণ-প্রমাদহেতু 'বাসলীলা' ছাপা হয়েছিল। পরে ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের শেষে প্রবন্ধটির অনেকাংশ পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে 'রাসলীলা'র জায়গায় 'বাসলীলা'ই রয়ে গেছে, সংশোধিত হয়নি।

২. এখানে অমৃতলালের স্মৃতিতে একটু ভুল আছে। শরৎচন্দ্র ঘোষ 'শকুন্তলা' নাটকে শকুন্তলার ভূমিকাই অভিনয় করেছিলেন, ভরতের ভূমিকা নয়। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়- 'শকুন্তলার অভিনয় হইল। ছাতু-বাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন Stage-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ

দেখাইয়াছিলেন, তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত-সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রথম পর্যায়, পৃ ১৫০-৫১)

৩. গিরিজাবাবু নয়, হবে গিরিশবাবু। ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে গিরিজাবাবু নামে কেউ সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায় না। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশের সময়ে মাসিক বসুমতীতে এই মুদ্রণ-প্রমাদটি ছিল। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে প্রবন্ধটি সংকলনের সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটি সংশোধন করেননি। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থটির বিভিন্ন সংস্করণে এবং পরবর্তী অন্যান্য মুদ্রণে ভুলটি থেকেই গেছে।

৪. যে পাঁচটি অভিনেত্রী সর্বপ্রথম গ্রেট ন্যাশনালে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন—ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী, যাদুমণি ও রাজকুমারী। এঁদের নিয়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ "সতী কি কলঙ্কিনী" নাটকটি গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়েছিল।

নাচঘরের "প্রদর্শক" মহাশয়—

লেখা তো চেয়েছেন; কি লিখি বলুন দেখি? ভাবনার ভিড়ে দোর ঠেলা-ঠেলি ক'রেও একটা নতুন ভাব তো মাথার ভেতর ঢুকতে পাচ্ছে না। পুজোর নৈবেদ্যে তো আনন্দের সুগন্ধ থাকা চাই; কিন্তু শিক্ষা ও সঙ্গের হ্যাট-কোটেড ইসারা ন্যায্যের অপেক্ষা বাহ্যবিকাশের অভিলাষটা এমন অসীম ক'রে তুলেছে যে, মা আনন্দময়ী দশহাতে দশখানা অস্ত্র ধ'রে এসেও নিরানন্দকে মনের ভেতর থেকে তাড়াতে পাচ্ছেন না।

আজ এই পুজোর সময় একটা অনেক দিনের পুরাতন পুজোর রাত্রি মনে পড়ছে—প্রবাসে নিঝুম নিশীথে একটা বিনা পয়সায় বে-ফরমাসী আনন্দ উপভোগ করেছিলুম, যা এখনকার নাচঘরের নবণীয়েরা হাজার টাকা খরচ করেও নটজীবনে আর ফিরে পাবেন না। সে একটা দিন গেছে, যখনকার অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসরা সমস্ত হার্ট-টা থিয়েটার ক'রে আনন্দে ঢেলে দিয়েছিল; অভিনয় করেই আনন্দ পেতো—আনন্দ দিতো, তা টিকিটের রসের সঙ্গে আর্ট ফুটে উঠছে কিনা তা' হাতা ক'রে তুলে দেখতে শেখেনি।

১৮৭৯ খৃঃ আটাশ ঊনত্রিশ বৎসরের বেশী দলের কারুর-ই বয়স ছিল না। ষ্টার থিয়েটার তখনও হয়নি, পুরানো ন্যাশনাল নামটা টানাটানিতে বজায় আছে।[১] গিরিশবাবুর সঙ্গে নাট্যশালার তখন ভাসা-ভাসা সম্পর্ক, তখনও বই লিখতে আরম্ভ করেন নি; যে অতুল নাট্যসম্পদের কল্পনা তাঁর প্রতিভার খনির ভিতর লুক্কায়িত ছিল, সে ঐশ্বর্য্যের সন্ধান সে-সময় পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী-সাধারণ পায় নি এবং সম্ভবতঃ তিনি নিজেও পান নি।

যেখানে স্রোত, সেইখানেই জোয়ার ভাঁটা; কলিকাতার নাট্যশালার স্রোতেও তখন প্রায় সার-ভাঁটা। নীলদর্পণের রোগ সাহেবের পার্ট অবিনাশ কর যেমন অ্যাক্ট ক'রে গেছে, আজ পর্য্যন্ত কেউ তেমন পারেনি, নিজে অর্দ্ধেন্দু পর্য্যন্ত নয়।[২] থিয়েটার খোলার পর অবিনাশ বছর আষ্টেক মাত্র বেঁচে ছিল, কিন্তু আর কোনও পার্ট অ্যাক্ট ক'রে সে আপনার নামকে দর্শকের মরমের ভিতর পৌঁছে

না, হিঁদুয়ানীর সংগে আমাদের আধা-সাহেবী, আধা-বোহিমিয়ান জীবনের এই প্যাক্টটুকু ছিল।

খিচুড়ী রাঁধিয়ে খেয়ে দিনের বেলা পর্বটা পালা গেছে; সন্ধ্যার পর আপন-আপনি গান-বাজনা, গল্প চলছে। নিয়ম ছিল—রাত্রি দশটা পর্যন্ত বাইরের লোকজন এলে দেখা সাক্ষাৎ করবো; পেটা ঘড়ীতে দশটা ঘা দিলেই বেয়ারা বাইরের ফটক বন্ধ ক'রে দিতো: তখন মহামায়ার সঞ্জীবনী শক্তিপূর্ণ দ্রবীভূত আনন্দভরা বোতলের ছিপি আমরা খুলতাম। দলে কনসার্ট নিয়ে জন তিরিশেক ভদ্র সন্তান, পাঁচ ছ'জন জুটে এক একটি মাত্র সংঘ বা ক্লাব। কি ক্লাবের প্রয়োজনীয় জায়েণ্ট স্টক আছে; তা ছাড়া প্রত্যেকের ট্রাঙ্কের ভেতর এক একটা এমারজেন্সী ফ্লাস্ক বা পাইণ্ট রাখা প্রচলিত প্র্যাকটিস।

আনন্দাদি সমাপনের পর সকলে যে-যার ঘরে যে-যার বিছানায় ঘুমিয়েছে। একটা লম্বা পথের ঘরে এক দিককার কোণে মহেন্দ্রের[a] বিছানা আর একদিকে আমার। দু'জনেই বিছানায় প'ড়ে উসখুস কচ্ছি, কারুরই ঘুম আসছে না। অতো বড় বাড়ীটার ভেতর নাকের ডাক ছাড়া জীবনের আর কোনও সাড়াশব্দ নেই; মহেন্দ্র উঠে লম্বা চ'লে এসে আমার পাশ দিয়েই বারান্দার দিকে গেল; মিনিট তিনেক বাদেই ফিরে এসে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"ছেলে, ঘুমুলে নাকি?" সেই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন "নবীন তপস্বিনী" নাটকে মহেন্দ্র সাজে রাণী, আর আমি সাজি বিজয়, তখন থেকেই আমি তাকে ডাকতুম মা বলে, সে আমায় ডাকতো ছেলে বলে; মুখের আলাপে এই মিষ্ট সম্বন্ধটুকু সে জীবনের শেষ সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত রেখে গেছে। 'মা' বোধ হয় আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিল। মা-র এই নিশীথ-সম্ভাষণের উত্তরে আমি বললুম, "কই ঘুম হচ্ছে?" মহেন্দ্র বললে, "তবে উঠে এসো; সপ্তমীর চাঁদ ডুবছে, দাঁড়িয়ে দেখিগে—বড্ড বাড়ী মনে পড়ছে।" ডুবু ডুবু চাঁদ দেখতে দেখতে মন আরও উদাস হয়ে উঠলো। আবার মহেন্দ্র বললে, "ঘুম তো হবেই না, চলো, আমার বিছানায় ব'সে একটা পোইট্রি লিখবে।" জিজ্ঞাসা করলুম—"কি পোইট্রি?" উত্তর—"আজ দেশে পুজো, আর আমরা এই প্রবাসে প'ড়ে, এই সপ্তমীর রাত, চাঁদ ডুবছে, এই-সব ভাব দিয়ে আর কি!" আমি বললুম, "বেতন?" সে বললে, "বেতন আবার কি?" "বিনা বেতনে এক ছত্রও আমার মুখ থেকে বেরুবে না—"ব'লে

আগুনের ভংগীতে একটা অভিনয় দেখিয়ে দিলুম। মহেন্দ্র হেসে বললে, "আমার ফ্লাস্কে আছে, ভয় নেই।"

লাইনচেরেক বোধ হয় আজও মনে আছে; কিন্তু সে-রাত্রে যখন লাইন পঁচিশ ছাব্বিশ লেখা হয়েছে, দুটোও বোধ হয় বেজে গেছে, এমন সময় অরি একটা ঘর থেকে বামাকণ্ঠনিঃসৃত একখানি মধুর আগমনী-গান কানে এসে প্রাণ জাগিয়ে দিলে বোঝা গেল, আরও একজনের ঘুম ভেঙেছে, ভুনি[৬] শুয়ে শুয়ে গান ধরেছে! ভুনি এখনও বেঁচে আছে, অনেক দিন কাশীবাসিনী। যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি শিক্ষার সংযত; তার ওপর রাত্রিতে বাঙালী প্রবাসীর কানে আগমনীর গান, জানিনা এখনকার বাঙালী আমার আর মহেন্দ্রর সে-রাত্রির বিষাদস্পর্শকোমল আনন্দের ভাব হৃদয়ংগম করতে পারবেন কিনা।

একটু পরেই আর একখানা গলা খাদস্বরে ভুনির কণ্ঠের সংগে মিলে যাচ্ছে শোনা গেল, মনে হ'ল, সে গলাটি ভাবির; সে ভুনির সংগে এক বিছানায় শুয়ে থাকতো।

গান তো আমাদের দুজনের প্রাণ জাগিয়েছিল, কিন্তু এবার আর একজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জঞ্জাল বাধালো। মতি সুরের[৭] শোবার জায়গা ছিল ঠিক আমাদের পাশের একটি আলাদা ঘরে; দরজাগুলো বন্ধ থাকা সত্ত্বেও দু'খানা গলার আওয়াজে মতির গেছে ঘুম ভেঙে। মতি ছিল খুব পুরোনো, খুব বড় অ্যাক্টর, অনেক ভালো ভালো পার্ট অ্যাক্ট ক'রে নাম নিয়েছে; তার 'তোরাপ' অতুলনীয়।

সে-কালে অ্যাক্টরে অ্যাক্টরে যে-সম্বন্ধ ছিল, তাকে বন্ধুত্ব বললেও চলে না, আত্মীয়-কুটুম্বিতা ব'ললেও চলে না। তারা মা বাপ, ভাই বোন, সোমত্ত বউদের অসুখ হলে তাঁদের ঘরে একটা উঁকি মেরে মাত্র অপরাধী হয়ে অ্যাক্টরদের কারুর যদি কিছু অসুখ হ'ত, তার তদ্বিরে গিয়ে দিনরাত প'ড়ে থাকতো; কারুর বাড়ীতে কিছু নতুন খাবার জিনিষ তৈরী হ'লে লুকিয়ে এনে দু'চারজনে মিলে বেঁটে খেতো। অভিনয়-কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ ছিল। কিন্তু আর একজনের অভিনয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখলে প্রম্পটারের কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে নিজে পার্ট বলে দিতো; আবার কারুর সংগে ঝগড়া হ'লে দাঁতে দাঁত দিয়ে বলতো—"তোর চোখ দুটো উপড়ে নোবো।" মতি ওরি মধ্যে একটু বেশী তিরিক্ষি, আর মাঝে মাঝে ভারি এক বগ্‌গা হয়ে আমাদের চক্রের বাইরে গিয়ে

পড়তো। অতো রাত্রে কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে একেবারে চটে লাল। —"ভদ্দর লোককে কি ঘুমুতে দেবেনা, এতো রাত্রে কার আবার গানের সখ পুভেছে"—আর তার সঙ্গে দুটো একটা গালাগাল জুড়ে দিয়ে গর্জ্জন আরম্ভ করে দিলে। আমরা চেঁচিয়ে বল্লুম, "ওগো, তোমরা ও-ঘরে থামো, মতিবাবুর ঘুম হচ্ছেনা।" মতিবাবু চ'টেছেন শুনে এবং আমাদের মনের কথা বুঝে আগমনী ছেড়ে দিয়ে ওরা একখানা থিয়েটারের জানা গান ধরলে; সে ঘরে আর জন-তিনচার অ্যাকট্রেস যারা শুতো, তারাও মতিবাবুকে প্রবোধ দেবার জন্যে কোবাসে গলা ছেড়ে দিলে। বোঝা গেল, তখন মতি বিছানায় উঠে বসেছে, আর "যাচ্ছি, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস কচ্চি, এ সব কি ?" বলে তার তোরাপী গলায় চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। বাসার অনেকেই তখন জেগে পড়চে। ম্যানেজারের ঘুম ভাঙিয়ে সেখানে নালিশ পেঁছুবে শোনবামাত্র কনসার্টের ঘর থেকে কানাই, পাঁচু আর ত্রৈলোক্য বেরিয়ে পড়লো, একজনের হাতে ক্লারিওনেট আর একজন নিয়েছে কর্ণেট, আর ত্রৈলোক্য তার বাঁয়া তবলা। দেখতে দেখতে বড় হলে মজলিস জমে গেল ; অপেরা মাষ্টার রামতারণের[৮] গলা আর বাজনার আওয়াজ কানে যেতেই দশ-বারোজন পুরুষ আর প্রায় সব অ্যাকট্রেস-ই হলঘরে এসে গান ধরলে। রকম রকম গান, রকম রকম নকল আরম্ভ হলো ; নকল-নেত্রী ক্ষেত্রমণি[৯]। বঙ্গের অভিনেত্রীকুলে ক্ষেতু ছিল নারীদেহে অর্দ্ধেন্দু ; এ ছাড়া আর কোনো নামে এখনকার লোকের কাছে ক্ষেতুকে পরিচিত কত্তে পারি না।

মতি তুলেচে ম্যানেজার অবিনাশ করকে, তার ঘর থেকে হাত ধরে টেনে এনে আমাদের এই বাঁদরামি কাণ্ড দেখাচ্ছে। অবিনাশ একবার ম্যানেজারী গোছ একটু অভিনয় দেখাবার চেষ্টা করতেই ক্ষেতু গোবিন্দ অধিকারীর দূতী-গিরির ধরণে একটি গান ধরে হাত জোড করে এমন ভাবে তার দিকে এগুলো যে, সে দেখলে নীলকুঠীর ম্যানেজারও জল হয়ে যেতো, তা' থিয়েটারের ম্যানেজার যে খল্ খল্ করে হেসে উঠবে তার আর আশ্চর্য্য কি।

"কাল সকালে ফার্ষ্ট থিং—আমার রেলভাড়া চাই—"বলে মতিভায়া মুখখানা গোঁ করে হুঁকোটি হাতে বাগানের ধারে গিয়ে বসে রইলো।

রাত্তির তিনটের পর থেকে আরম্ভ করে যতক্ষণ না বেন্দা ঘড়িতে ছ'টা বাজিয়ে ঘুম ভাঙার সময় জানিয়ে দিলে, ততক্ষণ আমরা 'সতী [কি] কলঙ্কিনী'র গান,

'আদর্শ সতী'র গান. 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ জ্বল' গান, আরও থিয়েটারী গান অনেক গাইলুম। কে একজন গোপালে উড়ের গান ধরতে বেলবাবু[10] উঠে ভিস্তির নাচ নাচলে, আর কাশী[11] নাচলে মালিনীর নাচ। কীর্তনগান-ও বাদ গেল না। শেষে ভোর হ'তে বাজবল্লভ পাড়ায় যে প্রসিদ্ধ সখের পাঁচালীর দল ছিল, তা থেকে "সকলি করিতে পারো শ্রীহরি, সকলি করিতে পারো শ্রীহরি"—এই গানটি গেয়ে মজলিস বরখাস্ত হ'ল। এ গানে ম্যানেজার সাহেবও যোগ দিয়েছিলেন।

এক ষষ্ঠীর রাত্রি আনন্দের উৎকণ্ঠায় জেগে কাটিয়েছি দশ বৎসর বয়সের সময়, মাথার শিয়রে শান্তিপুরের কোঁচানো ধুতি-চাদরখানি আর চীনের বাড়ীর চকচকে নতুন জুতোজোড়াটি রেখে, কলাবউ নাওয়ানোর ঢোল প্রথম গিজুদা-গিজোড় শোনবার অপেক্ষায়। আর এক সপ্তমীর রাত্রি বড় আনন্দে কাটিয়েছিলুম আমার থিয়েটারী জাত-ভাইবোনদের সঙ্গে গান গেয়ে বাঁকিপুরে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পৌঁছে।

এই নিন মশাই, সে-কালের থিয়েট্রিক্যাল অ্যালবাম থেকে খুলে নেওয়া একখানি ম্লানপ্রায় চিত্রপট, যখন বঙ্গের অভিনেতৃবর্গের নতুন রং-করা জীবনপূজার মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এক একটি আনন্দপূর্ণ মঙ্গলঘট, আর আজ তখনকার কাহিনী স্মরণ ক'রে শোনাতে শমনের গ্রাস হ'তে অবশিষ্ট রয়েছি আমি একমাত্র

ভবদীয় নাট—

১. মতভেদ ও মনোমালিন্যে ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গেলে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে দু'দল হলেন। প্রথম কিছুদিন দু'দলই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামটি আঁকড়ে রইলেন। তার পর অর্ধেন্দু-অমৃতলালের দল 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে নানাস্থানে অভিনয় করতে লাগলেন। শেষে নিজেদের রঙ্গালয় তৈরী হলে নাম হল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৮৭৫ এর আগস্টে এ থিয়েটারের লিজ গেল কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। থিয়েটারের নাম বদলে হ'ল 'দি ইন্ডিয়ান (লেট গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার'। অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু হলেন ম্যানেজার। নভেম্বরের গোড়ায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনালের জীবনদীপ নিবে গেল। ভুবনমোহন নিয়োগী আবার নিজের থিয়েটারের ভার নিজে নিলেন। পূর্বনাম ফিরে হ'ল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। ১৮৭৬-এর শেষে অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হলে নাট্যজগতে অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে এলো। ভুবনমোহন অনেক চেষ্টা করেও থিয়েটার চালাতে না পেরে ১৮৭৭-এর জুলাই মাসে গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনাল লিজ দিলেন। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের নাম আবার দিলেন ন্যাশনাল থিয়েটার। কয়েকমাসের মধ্যেই এ থিয়েটার ভাড়া নিলেন গিরিশচন্দ্রের শ্যালক দ্বারকানাথ দেব। তার মাস দুয়েক পরে থিয়েটার গেল কেদারনাথ চৌধুরীর হাতে। এইভাবে, অমৃতলালের ভাষায়, "পুরোনো ন্যাশনাল নামটা টানাটানিতে বজায়" ছিল। তার পর যে সময়কার স্মৃতিচিত্র তিনি এঁকেছেন, সেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথমে গেল এক মাড়োয়ারীর হাতে—নাম গোপীচাঁদ শেঠী। তাঁর হাতেও থিয়েটার চলেনি। ন্যাশনাল থিয়েটারের লিজ হস্তান্তরিত হয়েছে বার বার। অমৃতলাল ঠিকই লিখেছেন, "গিরিশবাবুর সঙ্গে নাট্যশালার তখন ভাসা ভাসা সম্পর্ক।" এ সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছিল ১৮৮১-র জানুয়ারী থেকে। প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে আর এক ধনী মাড়োয়াড়ী গিরিশচন্দ্রকে পার্কার কোম্পানীর চাকরি ছাড়িয়ে তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ করে নিলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এর পর থেকে রঙ্গমঞ্চের আর ভাসা ভাসা সম্পর্ক রইল না।

২. অনেক দিন আগে পুরাতন প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ও অমৃতলাল বলেছিলেন "এই একটি পার্ট সে প্লে করিত, তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ সাহেবের পার্ট প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।" (পৃ. ৫১)

৩. ১৮৭৮-এর গোড়ার দিকে কিছুদিনের জন্যে অবিনাশ কর ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার হয়েছিলেন। তিনি বেশ দক্ষ ম্যানেজার ছিলেন এবং তাঁর সময়ে

ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব উন্নতি দেখা যায়। ১৮৭৮-এর ২৬এ জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ তাঁর সম্পর্কে লেখেন—"During his tenure of office many improvements have been added to this theatre.' সুতরাং অমৃতলাল যে লিখেছিলেন—"একটা শক্তি তার ভিতর বেশী রকম ছিল—সেটা শাসন-শক্তি"— তা খুবই ঠিক। ঐ তারিখে রাত্রে অবিনাশ করের সুদক্ষ অধ্যক্ষতায় কুঞ্জবিহারী বসুর 'আনন্দমিলন' নাটকটি অভিনীত হয়।

৪. 'অমৃত-মদিরা'র পরিশিষ্টে এঁর সম্পর্কে অমৃতলাল লিখেছেন, "কলিকাতার ভূতপূর্ব কালেক্টর পরম আতিথেয় মিষ্টভাষী স্বর্গীয় দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. মহেন্দ্রলাল বসু। বাংলা মঞ্চের আদিপর্বে স্ত্রী-ভূমিকায় এঁর তুল্য অভিনেতা বিরল ছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণে' এঁর ছিল পদী ময়রানীর ভূমিকা।

৬. এঁর সঙ্গিনী বনবিহারিণী। ইনি সুগায়িকা ছিলেন। ১৮৭৯-র ১লা জানুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটারে 'কামিনীকুঞ্জ' নামে যে গীতিনাট্য অভিনীত হয়, তাতে ইনিই ছিলেন নায়িকা।

৭ সুঅভিনেতা মতিলাল সুর। 'নীলদর্পণে' তাঁর ছিল রাইচরণ ও তোরাপের ভূমিকা। অমৃতলালের মতে, "মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।" (পৃ ৫১)

৮. 'অমৃত-মদিরায়' অমৃতলাল এঁর পরিচয় দিয়েছেন, "স্বনামধন্য অপেরা মাষ্টার রামতারণ সান্যাল। ইনি ফরিদপুরের অন্তর্গত খালকুলার জমিদার বংশজ—গ্রন্থকারের অনুজপ্রতিম।" প্রথম জীবনে রামতারণ অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'আগমনী'তে গিরিরাজ, 'আলাদিনে' আলাদিন, 'কামিনী কুঞ্জ' গীতিনাট্যে নায়ক প্রভৃতি। পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটারে সংগীত-শিক্ষকরূপে অত্যন্ত খ্যাতির অধিকারী হন।

৯. অত্যন্ত নিপুণা অভিনেত্রী ছিলেন। অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি'তে 'গিন্নী' ও 'বিবাহ-বিভ্রাটে' 'ঝি' তাঁর স্মরণীয় ভূমিকা। এই 'নকলনেত্রী'কে একই নাটকে বিভিন্ন ভূমিকা দেওয়া হত অনেক সময়। যেমন 'মেঘনাদ-বধে' নৃমুণ্ড-মালিনী ও প্রভাসা; 'সীতাহরণে' উগ্রচণ্ডা, সূর্পনখা ও চেড়ী।

১০. বেলবাবু: অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের অন্যতম উদযোগী ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ দু'রকম ভূমিকাই অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারতেন। নাট্যজগতে ইনি 'বেলবাবু' বা 'কাপ্তেন বেল' নামে পরিচিত ছিলেন। অমৃতলালের মতে 'Low comic ও Clown part-এর অভিনয়ে ইনি সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।' 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের অমৃতলাল-

প্রদত্ত নাট্যরূপ 'সরলা'য় বেলবাবুর গদাধরচন্দ্র ভূমিকা মঞ্চের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৯০-এর মার্চে এঁর অকালমৃত্যুতে (আত্মহত্যায়) স্টারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

১১. কাশী ঃ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। নাচগানে পারদর্শী এই গুণবান অভিনেতা রঙ্গালয়ের আদিকাল থেকে দীর্ঘকাল মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অমৃতলাল এঁকে "আদরের নাম' দিয়েছিলেন "চারুচন্দ্র"। অমৃতলালের মতে, "শ্রীমান্ কাশীনাথ···বেলবাবুর মন্ত্রশিষ্য।" বেলবাবুর মৃত্যুব পর ইনিই ছিলেন "স্টারের নৃত্যগীতবাদ্যবিশারদ সুদক্ষ অভিনেতা।"

নির্দেশিকা